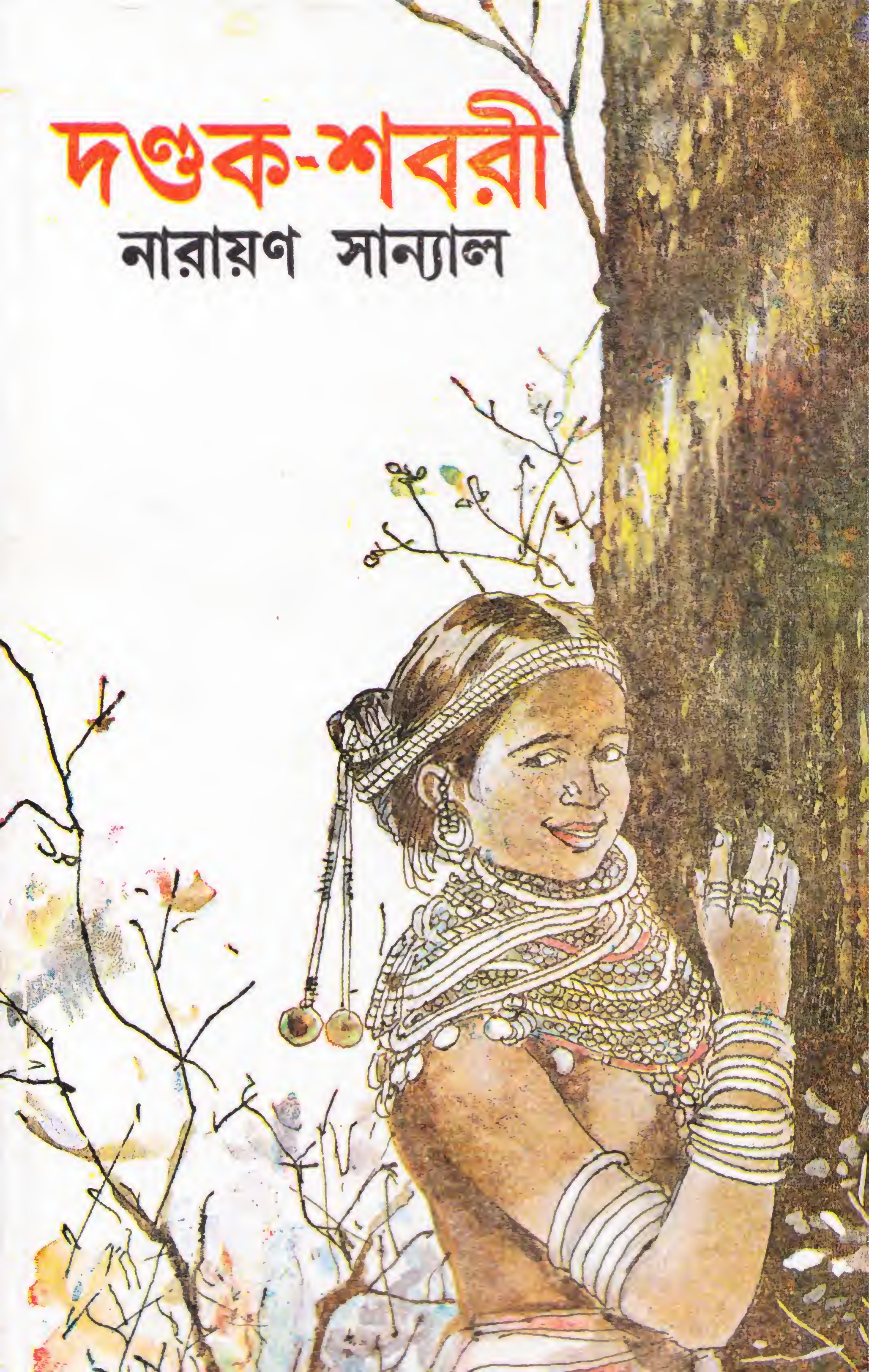
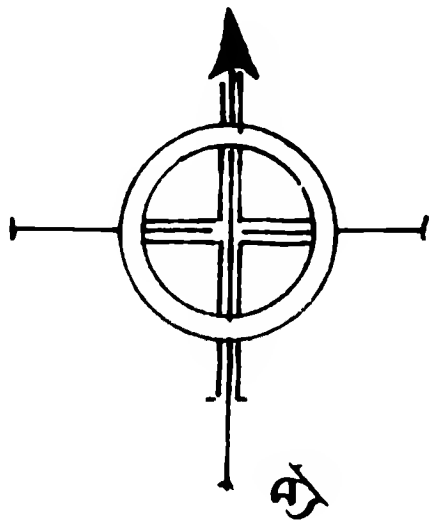


দণ্ডক-শবরী

নারায়ণ সান্যাল





রায়পুর
কলকাতা
615 মাইল
নাগপুর 188 মাইল

N.H. 43

ধামতারি

ভানুপ্রতাপপুর

পারালকোট

কাঁকের

অন্তাগড়

গায়ত্রীসরস্বতী

ফরাসগাঁও

নারায়ণপুর

কোন্ডাগাঁও

N.H. 43

অমরাবতী

ছোট ডোঙ্গার

নদী

ব্রাবতী

লোহাভিওড়া

গীদম

দন্তেওয়াড়া

বিজাপুর

বাইলাডিলা

পর্বত

নদী

পোড়ের

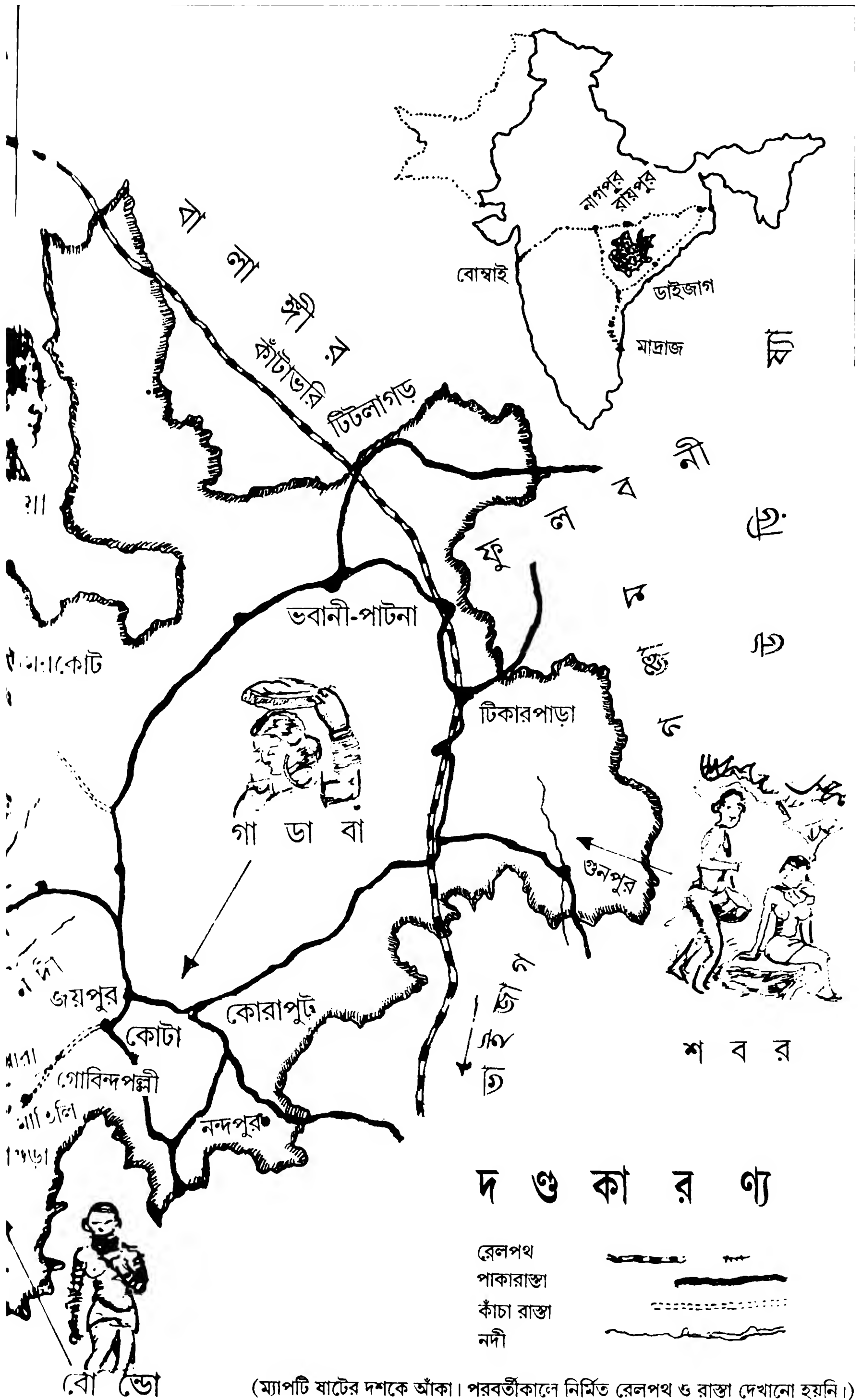
বালিমেলা



আবুজ
মাড়িয়া



বাইসনহর্ন
মাড়িয়া



(ম্যাপটি ষাটের দশকে আঁকা। পরবর্তীকালে নির্মিত রেলপথ ও রাস্তা দেখানো হয়নি।)

ଦଂଡ଼-ଶବ୍ଦୀ

କାବୁସ୍‌ସାବୁସ୍



ଦେ'ଜ ପାବଲିଶିଂ ॥ କଲକାତା 700 073

DANDAKSHABARI

A Bengali Research-oriented Travelogue by NARAYAN SANYAL

Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing

13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041

email : deyspublishing@hotmail.com

₹ 130.00

ISBN 81-7079-488-9

প্রথম প্রকাশ : 1962

প্রথম দে'জ সংস্করণ : মাঘ ১৪০১, জানুয়ারি 1995

দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০৫, অক্টোবর 1998

তৃতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪১৩, ফেব্রুয়ারি 2007

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

প্রফ নিরীক্ষা : মালবিকা ভট্টাচার্য, সুচিত্রা সান্যাল, সুবাস মৈত্র

১৩০ টাকা

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩



দণ্ডক

শবরী

বাবুজি

নারায়ণ সান্যালের প্রকাশিত গ্রন্থ (July, 1994)

[বিষয়ভিত্তিক]

[প্রথম সংখ্যাটি গ্রন্থরচনার কালানুক্রমিক, শেষ সংখ্যা দুটি প্রথম প্রকাশকালের সাল-নির্দেশক। প্রথম-সংখ্যার পূর্বে তারকাচিহ্নের সঙ্কেত : আমাদের প্রকাশনা।

ψ চিহ্নের সঙ্কেত : লেখকের নির্দেশে পুনর্মুদ্রণ হবে না।]

1. শিশু ও কিশোর সাহিত্য

[পাঠকের বয়স অনুসারে সাজানো]

86 গাছ-মা '91
79 হাতি আর হাতি '89

- * 66 নাকউঁচু '85
- * 25 কালোকালো '71
- * 67 ডিজনেল্যান্ড '85
- 55 অরিগামি '82
- 51 কিশোর অমনিবাস '80
- 26 শার্লক হেবো '71

2. সদ্যসাক্ষর সাহিত্য

ψ 4 গ্রাম্যবাস্তু '56
ψ 5 পরিকল্পিত পরিবার' 57
ψ 8 দশেমিলি '59

3. না-মানুষ আশ্রয়ী

- * 30 গজমুক্তা '73
- 50 তিমি-তিমিঙ্গিল '79
- * 57 না-মানুষের পাঁচালী '83
- * 60 রাঙ্কেল '84
- * 74 না-মানুষী বিশ্বকোষ (এক) '88
- * 76 না-মানুষের কাহিনী '88
- * 83 না-মানুষী বিশ্বকোষ (দুই) '90

4. বিজ্ঞান-আশ্রয়ী

- * 32 বিশ্বাসঘাতক '74
- 33 হে হংসবলাকা '74
- * 38 আজি হতে শতবর্ষ পরে '76
- 39 অবাক পৃথিবী '76
- 40 নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা '76

5. চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য

- 19 অজন্তা অপরাধ '68
- 29 কারুতীর্থ কলিঙ্গ '72
- 52 ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন '80
- 56 লা-জবাব দেহী অপরাধ আত্মা '82
- 61 Immortal Ajanta '84
- 62 Erotica in Indian Temples '84
- * 63 রোদ্যা '84
- * 71 প্রবঞ্চক '87

6. ভ্রমণ-সাহিত্য

- * 11 দণ্ডকশবরী '62
- * 16 পথের মহাপ্রস্থান '65
- * 27 জাপান থেকে ফিরে '71

7. স্মৃতিচারণধর্মী

- * 41 পঞ্চাশোর্ধ্ব '76
- * 64 ষাট একষটি '84
- * 80 আবার সে এসেছে ফিরিয়া '89

8. মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী

- * 9 মনামী '60
- * 18 অন্তর্লীনা '66
- * 20 তাজের স্বপ্ন '69

9. গোয়েন্দা কাহিনী

- * 34 সোনার কাঁটা '75
- * 35 মাছের কাঁটা '75
- * 42 পথের কাঁটা '76
- * 46 ঘড়ির কাঁটা '78

- * 47 কুলের কাঁটা '78
 - * 68 উলের কাঁটা '86
 - * 77 সারমেয় গেম্বুকের কাঁটা '89
 - * 72 অ-আ-ক-খুনের কাঁটা '87
 - * 84 কাঁটায় কাঁটায় (এক) '90
 - * 85 কাঁটায় কাঁটায় (দুই) '90
 - 92 রিস্তেদারের কাঁটা '92
 - 93 কৌতূহলী কনের কাঁটা '93
 - * 94 যাদু এ তো বড় রঙ্গের কাঁটা '93
 - * 95 অভিনী অয়ের কাঁটা '93
 - * 96 ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা '93
- 10. প্রয়োগবিজ্ঞান**
- 6 বাস্তববিজ্ঞান '59
 - 12 Handbook of Estimating '63
 - 54 গ্রামের বাড়ি '80
 - 53 গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা '80
- 11. গবেষণাধর্মী**
- * 22 নেতাজী রহস্য সন্ধান '70
 - 43 চীন-ভারত লঙ মার্চ '77
 - 73 পয়োমুখম্ '87
- 12. উদ্বাস্তু-সমস্যা সংক্রান্ত**
- 2 বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প '55
 - 3 বন্দী '55
 - * 10 অরণ্যদণ্ডক '61
- 13. ইতিহাস-আশ্রয়ী/ঐতিহাসিক**
- 14 মহাকালের মন্দির '64
 - 44 হংসেশ্বরী '77
 - 48 আনন্দস্বরূপিণী '78
 - * 69 লাডলিবেগম '86
 - * 82 রূপমঞ্জরী (এক) '90
- 14. জীবনী-আশ্রয়ী**
- * 23 আমি নেতাজীকে দেখেছি '70
 - 31 আমি রাসবিহারীকে দেখেছি '73
 - * 49 লিগুবার্গ '78
- 15. দেবদাসী-সম্পৃক্ত**
- 58 সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম '83
 - 59 সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় '84
- 16. নাটক**
- ψ 1 মুশকিল আসান '54
- 17. সামাজিক উপন্যাস**
- 7 ব্রাত্য '59
 - 13 অলকন্দা '63
 - * 15 নীলিমায় নীল '64
 - 17 সত্যকাম '65
 - * 21 নাগচম্পা '69
 - * 24 পাষণ্ডপণ্ডিত '70
 - 28 আবার যদি ইচ্ছা কর '72
 - 36 অশ্লীলতার দায়ে '75
 - * 37 লালত্রিকোণ '75
 - * 45 প্যারাবোলা স্যর '77
 - 65 মিলনান্তক '85
 - 70 পূরবৈয়া '86
 - 75 অচ্ছেদ্যবন্ধন '88
 - 78 ছয়তানের ছাওয়াল '89
 - 81 ছোঁবল '89
 - * 87 মান মানে কচু '92
 - * 88 আশ্রপালী '92
 - * 91 এমনটা তো হয়েই থাকে '91
- 18. প্রবন্ধ-সংকলন**
- * 89 লেঅনার্দোর নোটবই এবং... '92
 - 90 স্বর্গীয় নরকের দ্বার এবং... '92

কৈফিয়ৎ

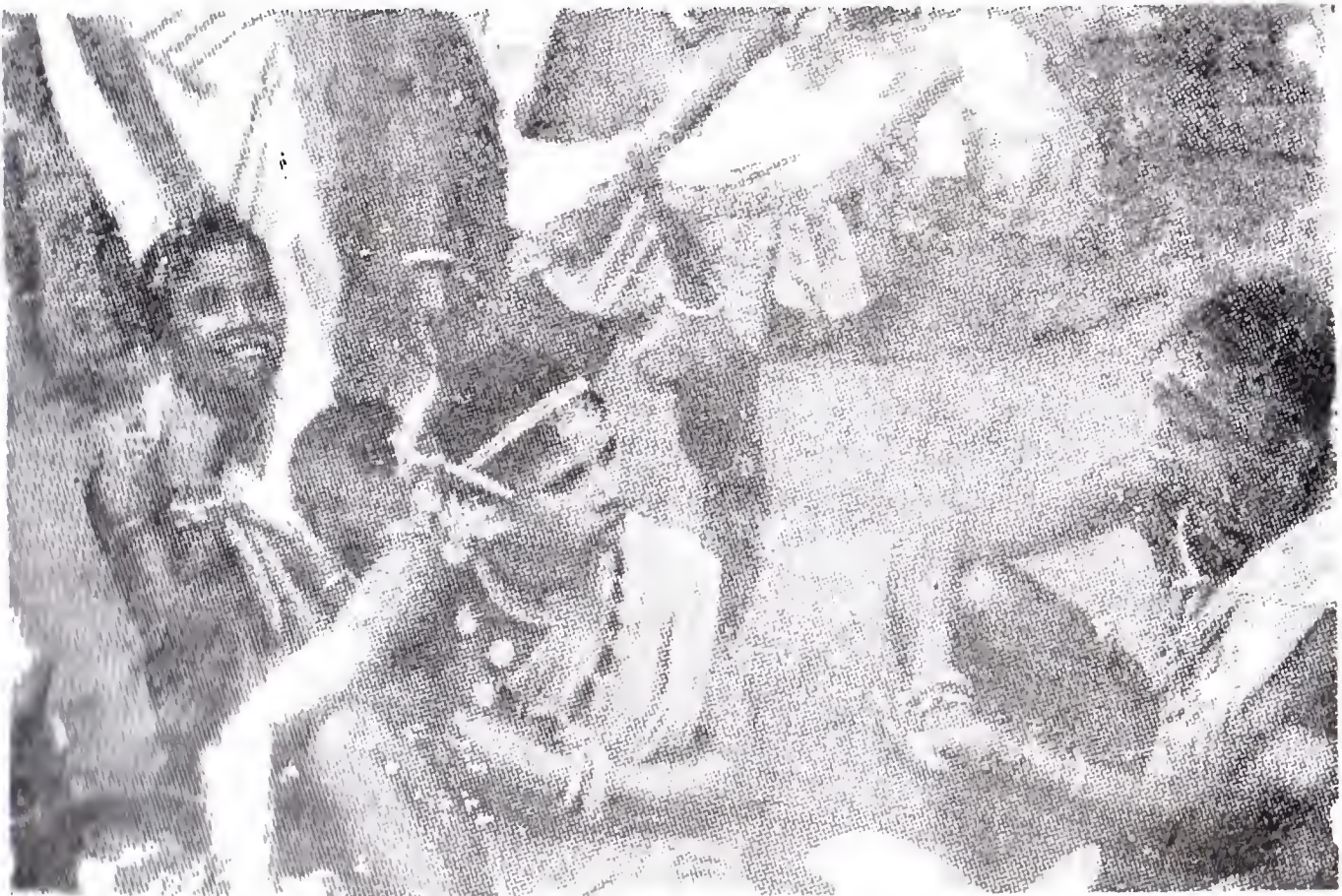
গত দশকে রচিত এই গ্রন্থটির নতুন সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করেছি। দণ্ডক-শবরীর অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তব। এ কাহিনীতে যা কিছু লিখেছি, তার সবই যে আমার স্বচক্ষে দেখা তা নয়। ওদের জীবনযাত্রার কথা নানা জনের কাছে শুনেছি, নানা জনের লেখায় পড়েছি। গ্রীগ্‌সন-এর প্রামাণিক গ্রন্থ ‘Maria Gonds of Baster’ এবং ভেরিয়ার এলুইনের একাধিক গ্রন্থ, বিশেষ করে ‘Muria and their Ghotul’ থেকে বহু সাহায্য গ্রহণ করেছি। স্বচক্ষে না দেখলেও স্বজ্ঞানে ওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অবাস্তব আজগুবি কিছু লিখিনি গল্পের খাতিরে। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এজন্য যে, ভবিষ্যতে কোনও সমাজ-বিজ্ঞানী বা নৃতত্ত্ববিদ এই আদিবাসী জীবনের উপর কোনও গবেষণা করলে আমার পরিবেশিত তথ্যকে যেন ঔপন্যাসিক সত্য বলে বাতিল না করেন।

সরকারের নির্দেশে প্রায় দুই বৎসরকাল আরণ্যক-জীবনের ভাগিদার হবার সুযোগ হয়েছিল। দণ্ডকারণ্যে থাকা কালে দুটি গ্রন্থ আমি রচনা করি। আদিবাসী জীবনের উপর ‘দণ্ডক-শবরী’ এবং উদ্‌বাস্ত-সমস্যা নিয়ে ‘নৈমিষারণ্য’। দুটি গ্রন্থই দীর্ঘদিন আউট-অফ প্রিন্ট হয়ে আছে। শ্রীমান ময়ূখ বসু প্রথমটির নতুন সংস্করণ প্রকাশকালে আমার সে-আমলে তোলা কিছু আলোকচিত্র সংযোজন করতে চাইলেন। দণ্ডকারণ্য থেকে বদলি হয়ে আসার পর আর আমি সেখানে যাইনি। তবে কয়েকজন বন্ধুর কাছে জেনেছি, আমি গত দশকে যা দেখে এসেছি তা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে আমার তোলা সে-আমলের ছবিগুলি আজ প্রায় ঐতিহাসিক দলিলের পর্যায়ে। তাই এবার কয়েকটি আলোকচিত্র সংযোজন করা গেল। চয়ন সরদারের ছবিও আমি তুলেছিলাম—খুব ভালো হয়নি। মাল্কো-রঙিলা-কিরিংগো প্রভৃতি চরিত্রগুলো যাদের দেখে গড়েছিলাম এবার তাদের কিছু ছবি দেওয়া গেল। কোকামেটার মাড়াই, নারায়ণপুরের হাটের ছবি প্রভৃতিও।

নবাব সত্যেন্দ্র
২৮
26.4.1978



আধুনিকতার স্পর্শ পাওয়া আদিবাসী কিশোরী
দৈনিক মজুরি নিয়ে রাস্তায় খোয়া ভাঙছে।



সুসজ্জিতা মুরিয়া যুবতী এসেছে কোণারগাঁওয়ের হাটে।



অহিরাগত ক্যামেরাধারীর প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি —
ক্যামেরা বস্তুটা চেনে না।



ক্যামেরা চিনেছে। ‘পোজ’ দিতেও শিখেছে।
অনায়াসে সেজনা ‘প্রফেশনাল ফীজ’ দাবী করে।



আধুনিক কুর্তা অথচ সাবেক পুথির মালায় সজ্জিত
দুটি চেলিক (মুরিয়া)।



নারায়ণপুরের হাটে চেলিক-মোটিয়ারির গ্রুপ ফটো।



মাড়িয়া মেয়েরা সমতলের হাটে এসেছে। বক্ষাবরণের
সচেতনতাজনিত বিবর্তন লক্ষণীয়।



মুরিয়া-মোটিয়ারিরা এসেছে কোটামেটার হাটে।

শবরীকে দেখে মহাকবি যে বিচলিত হয়েছিলেন এ কথা অনস্বীকার্য। না হলে রামায়ণের আদিকবি শবরীকে এড়িয়ে চলে যেতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বাল্মীকি অসময়ে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটী থেকে অতর্কিতে কাব্যের নায়িকা অপহৃতাহলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণস্বর্ণমৃগের শিকার শেষ করে এসে দেখলেন কুটির শূন্য। প্রথমে নাম ধরে ডাকলেন, খোঁজাখুঁজি করলেন, শেষে বিলাপ। দুই ভাই পাগলের মতো জনকনন্দিনীর সন্ধানে বন থেকে বনান্তরে ছোট্টাছুটি করতে থাকেন। যাকে সামনে দেখেন তাকেই প্রশ্ন করেন, স্বর্ণচম্পকের মতো গৌরবর্ণা বঙ্কলধারিণী এক রমণীকে তোমরা কেউ দেখেছ? দণ্ডক বনের পশুপাখি-বৃক্ষলতা স্তব্ধ নিরুত্তর। কাব্য চলেছে অনিবার্য পরিণতির দিকে — সীতার সন্ধান চাই। এমন নাটকীয় মুহূর্তে বাল্মীকি কাব্যের নায়ককে এনে ফেললেন এক বিশাল হ্রদের তীরে। কঙ্কর-শৈবাল-শূন্য সৌগন্ধ্য-কমল-শোভিত স্বচ্ছতোয়া এ সরোবরের নাম পম্পা। পম্পা হ্রদের পশ্চিম তীরে মহীয়সী বৃদ্ধা রমণী শবরীর আশ্রম।

রইল পড়ে কাব্যের মূল চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখের কথা — মহাকবি খণ্ড-কাহিনীর জাল বুনেতে শুরু করলেন শবরীকে ঘিরে। মহাকাব্যের অবশ্য মেজাজই ঐ রকম। কোথাও কোন ছিদ্র পেলেই খণ্ডকাহিনী ছড়মুড় করে ঢুকে পড়ে মূল গল্পে। আদিকবি না লিখলেও পরবর্তী কবির প্রক্ষেপে এমন অনেক ছোটগল্প মহাকাব্যে স্থান পায়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু শবরীর উপাখ্যান রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হয়নি। বাল্মীকির মূল রচনাতেই দেখি শবরীর কাহিনীর বিস্তার। মাতঙ্গ ঋষির শিষ্যদের নিরলস সেবা করেন আশ্রম-বালিকা শবরী। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। জানলাম উদ্ভিন্ন-যৌবনা একটি আদিবাসী কিশোরীকে মহামুনি মাতঙ্গ বলে গিয়েছিলেন যে, এ আশ্রমে একদিন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি পড়বে। মহান অতিথির প্রকৃষ্ট পরিচয়ার জন্য সেই বনচারিণী তাপসকন্যাকে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন মাতঙ্গ। সেইদিন থেকে শুরু হল শবরীর প্রতীক্ষা। স্বয়ং ভগবানকে অতিথিরূপে সেবা করতে হলে উপযুক্ত প্রস্তুতি চাই। সবার আগে চাই চিত্তশুদ্ধি। তপশ্চর্যা শুরু করলেন শবরী। সারাদিন আশ্রমের সহস্র কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন, আর একটা চোখ খুলে রাখেন আশ্রমের প্রবেশদ্বারের দিকে। অলক্ষিতে তিনি এসে যেন ফিরে না যান। বাল্মীকি স্পষ্ট করে না বললেও কিশোরী শবরী, যুবতী শবরীর সেদিনকার সেই প্রতীক্ষার মধ্যে আমরা অনুমান করে নিই সেই ঐকান্তিক আগ্রহ যা দেখেছি শ্রীরাধার প্রতীক্ষায়, মীরাবাইয়ের মুমুক্ষায়। ক্রমে যৌবন বিদায় নিল বনচারিণী মেয়েটির দেহমন থেকে, প্রৌঢ়ত্বের হল অবসান — লোলচর্মা শুভ্রকেশা শবরীর প্রতীক্ষার তবু শেষ নেই! নব-দুর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চিত এসে পদধূলি দেবেন তাঁর আশ্রমে — এই বিশ্বাসটুকু সম্বল করে অনন্যাচিন্তে রামনাম জপ করে চলেছেন অরণ্য-চারিণী শবরী।

অবশেষে মহা-তপস্বিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল একদিন। বার্ষিকের শেষপ্রান্তে এসে তিনি দেখা পেলেন রঘুপতি রাঘবের। অতিথির পদপ্রান্তে আজন্ম-ভূষিত একটি দীর্ঘ-প্রণতি নিবেদন করে শবরী বললেন : আজ তোমাকে পরিচর্যা করে আমার তপস্যার সিদ্ধিলাভ হল, আজ আমার জন্ম সফল। নরশ্রেষ্ঠ রাম, তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, আজ তোমাকে পূজা করে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার ফলস্বরূপ আমি স্বর্গারোহণ করব। মানদ, তোমার সৌম্য দৃষ্টিতে আমি পূত হয়েছি। অরিন্দম, তোমার প্রসাদে আমি অক্ষয়লোক লাভ করব।

শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দণ্ডকারণ্যের সুমিষ্ট ফলমূলাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করে, রাঘবের অনুমতি নিয়ে তৃপ্তকাম জটাবতী চীরবাসধারিণী শবরী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে স্বর্গারোহণ করলেন।

শবরীর উপাখ্যান শেষ না হওয়া পর্যন্তবাল্মীকি মূল কাহিনীতে ফিরে যেতে পারেননি। শবরীর পূর্ণ মর্যাদা মিটিয়ে দিয়ে বাল্মীকি আবার রওনা হয়েছেন দু-ভাইয়ের হাত ধরে ঋষ্যমুক পর্বতের দিকে।

পাহাড়ে পাগলা-ঝোড়া উপলখণ্ডে লঘুচরণ ছুঁইয়ে নাচতে নাচতে নেমে আসে মালভূমির দিকে — সেখানে হঠাৎ কোন হৃদের সাক্ষাৎ পেলে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তখন সে বিশ্বাস নেয় হৃদের জলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। তারপর আবার কোন পাথরের ফাটল দিয়ে হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলপ্রপাতের রূপ ধরে। পঞ্চবটীর আশ্রমে স্বর্ণমৃগের আবির্ভাবে কাব্য-নির্ব্বার রওনা হয়েছিল পাহাড়চূড়া থেকে। অতি দ্রুত ঘটনার আবর্তে ঘুরে ঘুরে ফুলে ফুলে ছুটে চলেছিল সে কাব্যশ্রোত। সীতার অভিলাষ, রামচন্দ্রের স্বর্ণমৃগ-সন্ধান যাত্রা, সীতা কর্তৃক লক্ষ্মণকে ভৎসনা, লক্ষ্মণের অনুগমন, রাবণের আবির্ভাব, সীতা হরণ! হঠাৎ মালভূমির উপরে পম্পা হৃদের তীরে ঋষ্যমুক পর্বতের পশ্চিমপ্রান্তে এসে কাহিনীর যেন হাঁপ ধরল। একটু জিরিয়ে নিতে বসল শবরী-উপাখ্যান গাছের ছায়ায়।

কিন্তু কেন এ অসময়ে এ উপাখ্যানের অবতারণা করলেন মহাকবি ?

ভেরিয়ার এলুইন বলেছেন :

Valmiki introduced the character of Sabari for no other reason than to give us a clue as to what tribes were then inhabiting the forest of Dandak, for she had no real bearing on the story and the incident does not advance the plot in any way.

অর্থাৎ : বাল্মীকি শবরী চরিত্রটির অবতারণা করছিলেন একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে — সে যুগের দণ্ডকবনের আদিবাসীদের সম্বন্ধে পাঠককে একটা সন্ধানসূত্র দিতে। কারণ শবরীচরিত্র রামায়ণের মূল উপজীব্যের কাছে প্রক্ষিপ্তমাত্র এবং মূল কাহিনী শবরীর উপাখ্যানের মাধ্যমে এক পদও অগ্রসর হয়নি।

বোধ করি বাল্মীকির কবিমানস সম্বন্ধে এইটিই শেষ কথা নয়। মহাকবির নায়ক-নায়িকা রাজপ্রাসাদের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা থেকে নিবাসিত হলেন। ভাগ্যতাড়িত এই উদ্বাস্তু পরিবারটিকে অনুসরণ করতে করতে আদিকবি এসে পৌঁছালেন দণ্ডকারণ্যে।

পঞ্চবটির মনোরম পরিবেশে এই বাস্তুচ্যুত পরিবারটির জন্য একটি কুটির নির্মাণ করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু এ অরণ্যে এসে তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন আর একটি সৌন্দর্যের আকর। সরলবিশ্বাসী একটি আদিবাসী রমণীর একনিষ্ঠ প্রেমের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মহাকবি। পারলেন না তাকে উপেক্ষা করে যেতে। শবরী-চরিত্রের পূর্ণ মর্যাদা মিটিয়ে না দিয়ে মূল কাহিনীর একটি শ্লোকও আর রচনা করতে পারলেন না তিনি।

ত্রৈতা থেকে দ্বাপর, দ্বাপর থেকে কলি। পুরো দু'যুগ পরের কথা। গিয়েছিলাম ঐ একই পরিবেশে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। বাস্তুহারা কয়েকটি ভাগ্যতাড়িত পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনে সাহায্য করব বলে। ভেবেছিলাম, বাস্তুচ্যুত মানুষগুলির জীবনসংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যাব। কিন্তু চ্যুত হলাম সে সঙ্কল্প থেকে। দেখলাম অরণ্যচারীদলকে — মাড়িয়া-মুরিয়া-ভাত্রা-কয়া-বোঙো-শবরদের। মনে হল এদের উপেক্ষা করতে পারি এমন শক্তি নেই। মনে পড়ল 'তেঁতুলের ফুল' কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন : শহরের বাড়িতে আছে অনেক কালের তেঁতুলগাছ, দিকপালের মতো দাঁড়িয়ে, পরিবারের যেন পুরানো কালের সেবক, প্রপিতামহের বয়সী। কবি তাকে লক্ষ্য করে দেখেননি কোনদিন। তার সৌন্দর্য আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বাগানের খানদানী ফুলের সব গাছ — নেবু, গোলকচাঁপা, কাঞ্চন আর কুড়চি। তারপর হঠাৎ একদিন কবির দৃষ্টি পড়ল ঐ বিশালকায় তেঁতুলগাছটির দিকে — হঠাৎ দেখলেন,

'পথের ধারে তেঁতুলশাখার কোণে লাজুক একটি মঞ্জরী, মৃদু বাসন্তী রঙ, মৃদু একটি গন্ধ — চিকণ লিখন তার পাপড়ির গায়ে।' ঐ তেঁতুলগাছের মধ্যে কবি দেখলেন কঠোর ও কোমলের বিচিত্র মিলন। কালবৈশাখীর অত্যাচারে গলির দুইধারে কোঠা বাড়িগুলো যখন হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে — প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে মেনে নিচ্ছে আকাশের দৌরাভ্যা, তখন কবি দেখেছেন 'একমাত্র ঐ গাছটার পত্রপুঞ্জের আন্দোলনে আছে বিদ্রোহের বাণী, আছে স্পর্ধিত অভিসম্পাত।' কবি সেদিন দেখতে পেয়েছেন 'তার বিক্ষুব্ধ মহিমা বৃষ্টিপাতুর দিগন্তে।'

তারপর বসন্তের আগমনে কবির কানে হঠাৎ এল কোন ঘোমটার নিচে থেকে চুপিচুপি কথা — লাজুক একটি মঞ্জরীর ফিসফিসানি। সেদিন কবি উপলব্ধি করেছিলেন বসন্তের সভায় ঐ তেঁতুলগাছের কৌলীন্য ফুলের পরিচয়ে তেঁতুলগাছের আত্মাকে স্পর্শ করলেন কবি, ওঁর মনে হল মানবভাগ্যের ওঠা-নামার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে এই যে দাঁড়িয়ে আছে আত্মসমাহিত তেঁতুলগাছ — সে 'যেন গন্ধর্ব চিত্ররথ, যে ছিল অর্জুনবিজয়ী মহারথী, গানের সাধন করছে সে আপন মনে একা, নন্দনবনের ছায়ার আড়ালে গুনগুন সুরে।'

অরণ্য-দণ্ডকের পথে-প্রান্তরে যখনই গিয়েছি আদিবাসী গ্রামে, আমার মনে পড়েছে শ্যামলীর ঐ কবিতাটি। 'তেঁতুলের ফুল'। মানবভাগ্যের ওঠা-নামার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে আত্মসমাহিত আদিবাসী সমাজ — এর দিকে আমরা এতদিন নজর দিইনি। জানতে পারিনি, আমাদেরই দেশে, আমাদেরই কালে বাস

করছে এমন একদল অদ্ভুত মানুষ। ওদের আমরা দেখেছি হাটে-বাজারে, পথ-চলতি সড়কে। খেয়াল করিনি। তেঁতুলকাঠ ছলে ভালো—তাই মালা গাঁথার দিনে তাকে মনে পড়েনি, ডালপালা সমেত বড় বড় গাছ উপড়ে নিয়ে গিয়েছি। দিয়েছি গুঁজে উনানে, ইট-ভাটার চুল্লীতে। আসামের চা-বাগানে ওদের চালান দেবার জন্যে এ অরণ্যে গড়ে উঠেছিল লেবার-রিক্রুটিং সেন্টার। আমরা খেয়াল করে দেখিনি, বসন্ত সমাগমে দণ্ডক-শবরীর মনেও মুঞ্জরিত হয়ে উঠতে পারে লাজুক একটি মঞ্জরী। চৈত-দাণ্ডার উৎসবে যখন দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ছেলেমেয়ের মিছিল, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নেচে নেচে ফেরে — তখন মনে হয় গন্ধর্ব চিত্ররথের এরাই কি ছিল সগোত্র? শুধু তাই নয়, আবার সেদিন দেখলাম ওদের আর এক রূপ। বাস্তবের মহারাজাকে কারারুদ্ধ করায় হঠাৎ দেখলাম ওদের পত্রপুঞ্জের আন্দোলনে আছে মুক বিদ্রোহের বাণী, আছে স্পর্ধিত অভিসম্পাত।

কিন্তু দণ্ডক-শবরীর কথা যে লিখব রসদ পাব কোথা থেকে? ওদের ভাষা বুঝি না, ওদের আচার-আচরণ জানি না। সরকারী চাকুরে — দশটা-পাঁচটার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষ আমি। হেড-কোয়ার্টার্স ত্যাগ করতে হলে লিখিত অনুমতি নিতে হয় পূর্বে। অথচ ওদের দেখতে হলে শহরাঞ্চল ছেড়ে যেতে হবে দূর গাঁয়ে। তবু যে দু'বছর ছিলাম ও অরণ্যে, বারে বারে ছুটে গিয়েছি ওদের গাঁয়ে — যখনই সুযোগ পেয়েছি। স্থানীয় লোক, স্থানীয় অফিসারেরা অযাচিত সাহায্য করেছেন। নানান উপাখ্যান শুনেছি তাঁদের মুখে। কিন্তু সেসব গল্প পরিবেশন করবার আগে দেশ-কাল-সমাজের একটা পরিচয় দিতে হয়। না হলে ফুটনোটে আর ব্র্যাকেটে কণ্টকায়িত হয়ে উঠবে সেসব কাহিনী।

দণ্ডকারণ্যের ভৌগোলিক পরিচয়টাই সর্বাগ্রে দেওয়া যাক।

রামায়ণ-বর্ণিত দণ্ডকারণ্য আর উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত বর্তমান দণ্ডকারণ্য আয়তনে সমান নয়। ত্রেতাযুগে যে ভূখণ্ডকে দণ্ডকবন বলা হত তার অংশমাত্র আজকের ডি. ডি. এ. নির্দেশিত ম্যাপের এলাকা। দণ্ডকারণ্য নামের ইতিহাস জানতে হলে আপনাদের খুলে বসতে হবে রামায়ণ মহাকাব্যের উত্তরকাণ্ড। কৌতূহলী শ্রীরামচন্দ্র জানতে চেয়েছিলেন দণ্ডকারণ্য নামকরণের ইতিকথা। তাঁর সে কৌতূহল নিবৃত্ত করেছিলেন মহামুনি অগস্ত্য। বিদ্যাপর্বতের কাছাকাছি গিয়েও আমি কিন্তু অগস্ত্যমুনির সাক্ষাৎ পাইনি। খেদ নেই আমার। দেখা পেয়েছিলাম পারলকোটের নবনির্মিত উদবাস্ত উপনিবেশে তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থের। অগস্ত্যমুনির মতই চেহারা তাঁর। আমার কৌতূহল চরিতার্থ করেছিলেন তিনি। মূল বাল্মীকি রামায়ণ থেকে শ্লোক আউড়ে গিয়েছিলেন মুখে মুখে। সে কথা যথাস্থানে বলব। আপাতত জানিয়ে রাখি, সত্যযুগে মনু দণ্ডধর ছিলেন একজন প্রতাপশালী মহীপতি। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষাকুকে রাজ্য দিয়ে বললেন, তুমি পৃথিবীতে রাজবংশ স্থাপন ও প্রজাপালন কর; কিন্তু অকারণে কাউকে দণ্ড দিও না! ইক্ষাকুর একশত পুত্র হল, তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ছিলেন মৃঢ় এবং অকৃতবিদ্য। এর ভাগ্যে নিশ্চয় দণ্ডলাভ আছে, এ কথা মনে করে রাজা ইক্ষাকু কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দিলেন দণ্ড; তারপর তিনি বিদ্যা ও শৈবাল পর্বতের ঘোর দেশে

মধুমন্ত নামে এক নগর নির্মাণ করে দণ্ডকে করলেন সেখানকার রাজপদে অভিষিক্ত। নিজের জঘন্যতম কোন পাপের দণ্ড ভোগ করতে কেমন করে রাজা তাঁর রাজ্য-জনপদ সব খোয়ালেন সেকথা তারাপ্রসন্নের ভাষায় শোনাব। মহর্ষি শুক্রাচার্যের অভিশাপে তাঁর রাজ্য বিধ্বস্ত হল। যেখানে ছিল আনন্দ-কলরব মুখরিত জনপদ সেখানে গড়ে উঠল স্থাপদসঙ্কুল ভয়াবহ অরণ্য! সেই অবধি এই আরণ্যক প্রদেশের নাম হল দণ্ডকবন।

কিন্তু ইক্ষাকু-পুত্রের পাপাচরণই দণ্ডকারণ্যের একমাত্র ঐতিহ্য নয়। এই অরণ্যের নির্জনতায় যুগে যুগে মুনিঋষিরা তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। মহাতেজা অগস্ত্য, সুদেবপুত্র শ্বেত, মাতঙ্গ, শবরী, মহাযশা অত্রি, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, মহামুনি ভরদ্বাজ এই অরণ্যেই তপশ্চর্যা করে অক্ষয়ধামের অধিকারী হন। তাঁদের পুণ্যেই এ অরণ্যের অপর নাম জনস্থান। পুণ্যে-পাপে সুখে-দুঃখে এ অরণ্য সর্বংসহা বসুমতীর মতো যুগে যুগে মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে।

আজ আর মুনিঋষিদের আশ্রম নজরে পড়ে না। কিন্তু এ অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় এমন নির্জন পরিবেশে নিশ্চয় ছিল ভরদ্বাজমুনির আশ্রম। শত শতাব্দীর সাধনায়, সহস্র সন্ন্যাসীর তপঃপ্রভাবে আজও বনের আকাশ-বাতাস নির্মল সুন্দর। রৌদ্র এখানে অমলিন, ছালাময়ী নয়, বাতাস এখানে স্নিগ্ধ, ধূস্রলিপ্ত নয়। চিত্রকোট জলপ্রপাতে যান, কেশকলঘাটের বাঁকের মুখে গিয়ে বসুন, বাগড়া-প্রপাতের পাড়ে গিয়ে কাটিয়ে আসুন একটি সন্ধ্যা, মনে হবে দেশকালের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে এসেছেন বুঝি।



উত্তরে রায়পুর থেকে যাত্রা শুরু করেছে সাড়ে তিনশ মাইল দীর্ঘ এক রাজপথ — ন্যাশনাল হাইওয়ে নং তেতাল্লিশ। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা আর অন্ধ্র — তিনটি প্রদেশের মাটির তিলক কপালে ছুঁয়ে যাত্রা সমাপ্ত করেছে সুদূর ভিজিয়ানাগ্রামে। মাঝামাঝি জায়গায় জগদলপুর, বাস্তার জেলার সদর। রায়পুর থেকে জগদলপুর প্রায় দু'শ মাইল। একটানা যাওয়া যায় বাসে। আরামদায়ক ডি-লাক্স বাস — কিন্তু পথের খানাখন্দ সে সুখ ভোগ করতে দেবে না আপনাকে। আপনি যদি রায়পুর থেকে মোটরে রওনা হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন আপনার পাশে পাশে ছুটে চলেছে ছোট রেলের একজোড়া লাইন। লেভেল-ক্রসিং-এর বুড়ি ছুঁয়ে কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে বাঁধের আড়ালে বনের পিছনে সারাটা পথ সে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ছুটেছে আপনার সাথে সমানতালে। বেশীদূর কিন্তু সে যেতে পারবে না। রায়পুর থেকে মাইল চল্লিশ ছুটে ধাম্তারি স্টেশনে এসে হাঁফিয়ে পড়বে বেচারী। খেলা সাস্থ হবে তার। ধাম্তারির কাঠগুদাম আর কাঠচেরাই-এর কারখানা পিছনে ফেলে আপনি এগিয়ে চললেন সোজা দক্ষিণমুখো। পথ আর পথ। ফুরোয় না যেন। পঁচাশি মাইলের মাথায় ছোট্ট শহর কাঁকেরে পৌঁছে আপনাকে একটু ভাবনায় পড়তে হবে। ডাইনে বাঁক নেবেন, না সোজা দক্ষিণেই যাবেন ?

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় উদ্ভাস্ত পুনর্বাসনের কাজ হচ্ছে বস্তুত দুটি অঞ্চলে — মধ্যপ্রদেশের পারলকোট এবং উড়িষ্যার উমরকোটে। উড়িষ্যার মালকানগিরি অঞ্চলে কাজ সবে হতে চলেছে। আপনি যদি পারলকোটের উদ্ভাস্ত উপনিবেশ দেখে যেতে চান তাহলে শহর কাঁকের থেকে আপনাকে ডানদিকের রাস্তা ধরতে হবে। আপনি যদি বিকাল নাগাদ কাঁকেরে পৌঁছে থাকেন তাহলে আমার পরামর্শ শুনুন, ডানদিকে মোড় ঘুরে পারলকোটের দিকেই চলুন আপাতত। কাঁকের থেকে পারলকোটের পথে যেতে আমি জীবনের একটি স্মরণীয় সূর্যাস্ত দেখেছিলাম। নীল পাহাড়, সাদা মেঘ আর অস্তগামী সূর্যের সে এক অপূর্ব লুকোচুরি খেলা। আপনার প্রতি পর্জন্যদেব আর সন্ধ্যাগায়ত্রীর করুণা থাকলে হয়তো সে দৃশ্য দেখার সুযোগ আপনারও হতে পারে।

কিন্তু আপনি নিশ্চয় রায়পুরে এসে পৌঁছেছেন বস্বে মেলে — সেই ‘জওয়া-উগানা’র সময়, অর্থাৎ ‘জলখাবার বেলায়’ ; — আপনাদের শহরে ভাষায় যার নাম নাকি বেলা দশটা। ফলে কাঁকেরে এসে যখন পৌঁছাবেন তখন ‘নেক্‌নিটিট পোর্ড’ — মাথার ঠিক উপর সূর্য। তাই আপাতত ডাইনে মোড় না ঘুরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে আপনার পক্ষে সোজা দক্ষিণ দিকে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। রায়পুর থেকে শতখানেক মাইল এসে আপনি এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হবেন। দেখবেন, চারিদিক থেকে পাহাড় আপনাকে ক্রমশ ঘিরে ধরছে। আপনি যতই এগিয়ে আসছেন চারপাশের পাহাড়গুলোও এগিয়ে আসছে আপনার গাড়ির কাছাকাছি। শেষ পর্যন্ত মনে হবে, যে পথটিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন, বুঝি সেই পথটি ছাড়া আপনার তিনদিকেই দুর্ভেদ্য খাড়া পাহাড়।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, ধাম্ভারি থেকে কাঁকের পর্যন্ত পথের ধারে যেসব গ্রাম পড়েছে তার বাসিন্দা সব পশ্চিমা লোক। বিহার-মধ্যপ্রদেশের মামুলি মানুষের সঙ্গে তাদের কোন বিশেষ ফারাক নেই। ওরা সবাই ‘ছত্রিশগড়িয়া’। কিন্তু শহর কাঁকেরের পর থেকে চলতি মানুষের চেহারা যেন বদলাচ্ছে। ওদের গায়ের রঙ তামাটে কালো। পরিধেয় বস্ত্র সংক্ষিপ্ত কিন্তু আশ্চর্য রকমের সাফা। ধপধপে সাদা। ওদের গলায় কড়ি অথবা পুঁতির মালা আর কাঁধে টাঙি। ওরা বাস্তার জেলার আদিম মানুষ — মুরিয়া গোণ্ড। গোণ্ডি ওদের মাতৃভাষা। এ জেলায় আড়াই লক্ষ মানুষ গোণ্ডিভাষায় কথা বলে।

আপনি হয়তো গাড়ি থামিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়ে জাগাহ্ কা নাম ক্যা ?

খুব সম্ভব লোকটি আপনার কথা বুঝতে না পেরে বলবে : হয় ! — অর্থাৎ “জী হাঁ !” আর নেহাত যদি লগ্নে বৃহস্পতি নিয়ে আপনি যাত্রা করে থাকেন, মানে লোকটি যদি নেহাত আন্দাজে আপনার প্রশ্নের মর্ম অনুধাবন করতে পেরে থাকে তাহলে বলবে : কেশকলঘাট !

নদীমাতৃক দেশের মানুষ আপনি চমকে উঠবেন। ঘাট ! নদীর নাম গন্ধ নেই, এখানে ঘাট আসবে কোথা থেকে ? নিমতলাঘাট, আউটরাম ঘাটই শুধু নয়, মণিহারিঘাট, সক্রিগলিঘাটের সঙ্গেও আপনার পরিচয় আছে। সুতরাং আপনি এদিক-ওদিক চেয়ে নদীর নিশানা খুঁজবেন — এ আর বিচিত্র কী ? না, পুরানো সেই সুরের নদীর ঘাট নয়, ‘ঘাট’ মানে হচ্ছে পাহাড়ে উঠবার পাকদণ্ডী রাস্তা। চুলের কাঁটার মতো বাঁক ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের মাথায় এবার উঠতে হবে আপনাকে। সেই পথেই উঠে এলেন মালভূমির মাথায়। এই মালভূমিই দণ্ডকারণ্যের মালভূমি। ঘুরপথে বাঁক ঘুরে উঠবার সময় লাল টালির ছোট্ট একটি বাড়ি নিশ্চয় আপনার নজরে পড়েছে। ওটা কেশকলের পি.ডাবলু.ডি.ডাকবাঙলো। এই ডাকবাঙলোয় যদি অন্তত দশটা মিনিট অপেক্ষা না করে যান তাহলে দিনের শেষে ডায়েরিতে লিখে রাখবেন — ‘ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাইমি।’

সারা দণ্ডকারণ্যের সেরা ডাকবাঙলো এই কেশকলঘাটের পান্থাবাস। এর বারান্দা থেকে সমতলভূমির দৃশ্য সত্যিই ভুলবার নয়। যে পথ দিয়ে উঠে এসেছেন আপনি সেই পথটিকে দেখা যাচ্ছে ঐকে-বৈকে পড়ে আছে সানুদেশের সবুজাভায়। দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সারির পর সারিতে সাজানো পাহাড়ের মিছিল। হঠাৎ উপলব্ধি করবেন, সেই ত্রেতা যুগের দণ্ডকারণ্যেই এসে পড়েছেন বুঝি — নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো স্থির ঐ ধ্যানস্তিমিত পাহাড়ের সার দেখে মনে হবে ওরা বুঝি যুগযুগান্তর ধরে তপস্যায় বসেছে সারি সারি। পাহাড় নয়, ওরা যোগাসনে বসা মুনিঋষির দল — ওরা শিলীভূত তপঃপ্রভাব—ওরাই সেই অত্রি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, সুতীক্ষ্ণ, শরভঙ্গ !

আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তাহলে গাড়িটা গ্যারেজে তুলুন। রাতটা এখানেই কাটিয়ে যান। চৌকিদারই আপনাকে রোঁধে খাওয়াবে। গুঁড়োমশলার রান্নায় খানদানি হোটেলের স্বাদ হয়তো আনতে পারবে না — কিন্তু গরম মুরগীর মাংসের ঝোল

আর ফুরফুরে চালের ভাত ভালই লাগবে আপনার, আমি জামিন থাকছি। সকালবেলা আপনার ঘুম ভাঙবে নাম-না-জানা পাখির ডাকে, অগুনতি অচেনা ফুলের সৌগন্ধে মুগ্ধ হয়ে যাবেন আপনি।

পরদিন ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে আবার যখন যাত্রা করবেন দক্ষিণমুখো পথের দুপাশে দেখবেন খাড়া পাহাড়, ছোট পাথরের স্তূপ, শাল-মহুয়া-হরতুকী-বয়রার বন মাইলের পর মাইল। ডান হাতটা স্টিয়ারিং হুইলের উপর আলতোভাবে রেখে আপনি কিম্বদন্তি অন্য কথা ভাবছেন। আপনার বারে বারে মনে পড়ছে — কাল সন্ধ্যাবেলা দেখা অদ্ভুতদর্শন সেই লোকটির কথা। যে আপনাকে পথের সন্ধান দিয়েছিল। তারই মতো আরও দু-একটি লোক যে আপনার নজরে পড়েছে। ওরা চলেছে ফরাসগাঁওয়ের হাটে। হাওয়াগাড়ি দেখে পথ ছেড়ে নয়ানজুলিতে নেমে দাঁড়াচ্ছে। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে আপনাকে। রইল পিছনে পড়ে ফরাসগাঁওয়ের রিক্রামেশান-য়ুনিটের ছাউনি। বিরাটাকার যন্ত্রদানবদের আস্তানা — বুলডোজার, রুম্যানিয়ান আর রাশিয়ান ট্রাকটার। বন কেটে বসত তৈরি করার কাজে সভ্য মানুষের হাতিয়ার। বোরগাঁওয়ে একবার দাঁড়াতে হবে আপনাকে। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের কেন্দ্রীয় অফিস এখানেই। তাছাড়া আছে কাঠের কারখানা আর হস্তচালিত তাঁত। অদূরেই আছে একটি অস্থায়ী কাঁচা হাসপাতাল। সামান্য আয়োজন—কিম্বদন্তি এখানেই লণ্ঠনের আলোয় সার্থক সিজারিয়ান অপারেশন হতে দেখেছি একবার। তাই নয়, ট্রান্সপোর্ট অফিসের অদূরেই আছে দুটি নতুন গ্রাম। জুগানি আর বোরগাঁও। বস্তুতপক্ষে এ দুটি দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনার প্রথম-পদক্ষেপ করা গ্রাম। সেসব আপনার না দেখলেও চলবে। বোধ করি সে চেষ্টা না করাই মঙ্গল। আপনাকে এখানে থামতে বলেছিলাম সেজন্য নয় — আপনার গাড়িতে পেট্রল ভরে নেবার জন্য। কোণ্ডাগাঁওয়ের আগে পেট্রল স্টেশন পাবেন না আর।

ছোট্ট শহর কোণ্ডাগাঁও। তেলরঙে আঁকা ছবি যেন একখানি। আপনি যদি মুরিয়া-গোণ্ডদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে এসে থাকেন তাহলে কোণ্ডাগাঁওয়েই ঘাটি গাড়ুন। এখান থেকে পশ্চিমমুখো যে পথটা চলে গেছে নারাক্ষী নদী পেরিয়ে নারানপুরের দিকে ওটাই হচ্ছে আবুজমাড় পাহাড়ে যাবার পথ। কোণ্ডাগাঁও-নারানপুর অঞ্চলেই ঘটুল-মুরিয়াদের গ্রাম। নারানপুর পার হয়ে পাবেন আবুজ মাড়িয়াদের। এ পথ দিয়ে পারলকোট হয়ে আবার কাঁকেরে ফিরে যাওয়া যায় কি না? সেটা নির্ভর করছে বছরের কোন সময়ে দণ্ডকারণ্য দেখতে এসেছেন তার উপর। ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত এ সড়ক ব্যবহারযোগ্য আর বাকি ছয়মাস কুস্তকর্ণের মতো নিদ্রামগ্ন পড়ে থাকে।

কোণ্ডাগাঁও থেকে পূবমুখো যে নতুন তৈরি পথটা দেখছেন, ওটা ধরে আপনি সোজা চলে যেতে পারেন উমরকোট। উদ্ভাস্ত পরিকল্পনার বৃহত্তম কেন্দ্রে। এ রাস্তাটার নাম কোণ্ডাগাঁও-অমরাবতী-ইয়ারলা রোড।

কিন্তু না। আপনি দেখছি ডান-বাঁ কোনদিকেই মোড় ফিরতে রাজি নন। বেশ তাহলে সোজা দক্ষিণেই চলুন। কোণ্ডাগাঁও থেকে মাইল চল্লিশ গেলেই পৌঁছাবেন বাস্তার জেলার সদর শহর জগদলপুরে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বাস্তার জেলার লোকসংখ্যা ছিল তিন লক্ষের কিছু বেশী, আর জগদলপুরে ছিল মাত্র হাজার পাঁচেক মানুষ। শতাব্দীর যখন বানপ্রস্থ নেবার বয়স হল, তখন দেখি বাস্তারের লোকসংখ্যা হয়েছে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ, আর জগদলপুরের লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় চৌদ্দ হাজার। বাস্তারের মহারাজার প্রাসাদ এই জগদলপুরে। সম্প্রতি গদিচ্যুত-রাজা প্রবীরচন্দ্র ভগ্নদেও-কে নিয়ে বেশ কিছু হৈচৈ হয়ে গেল ইতিমধ্যে। এই রাজপরিবারটি চতুর্দশ শতাব্দীতে ওয়ারাঙ্গেল থেকে এ অঞ্চলে প্রথম আসেন।

অরণ্যদণ্ডকের কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছেছেন আপনি। এখান থেকে সারা দণ্ডকবনের আদিবাসী জাতি-উপজাতিগুলির মোটামুটি পরিচয় জেনে নিতে হবে। দণ্ডকারণ্যের একটা মানচিত্র নিয়ে বসলে বুঝতে সুবিধা হবে।

বস্তুত বিবিধ আদিবাসী উপজাতির সনাক্তকরণ এক দুর্ঘট ব্যাপার। সাঁড়াশী দিয়ে মাথার খুলি মেপে যাঁরা অন্ধ কষে মানুষের মূল্যায়ন করেন তাঁদের কথা আলাদা, আমি তো সাদা চোখে বারে বারেই ভুল করেছি! যাকে মনে করেছি ভাত্রা দেখা গেছে সে পরজা। যাকে ভেবেছি মাড়িয়া সে হচ্ছে কয়া। সূর্যাস্তের সময় পশ্চিমাকাশের বর্ণসম্ভার দেখে যেমন বলা যায় না আকাশের ঐ অংশটা লাল, এটা নীল আর ঐখানটা হলুদ — বাস্তার জেলায় তেমনি বলা যায় না এখানে ভাত্রা, ওখানে পরজা, সেখানে ধুরওয়াদের বাস। তাছাড়া নৃকুলবিদেরা বারে বারে ওদের নতুন করে সনাক্ত করেছেন, নতুনভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। কেউ বলেছেন, গোণ্ড জাতির পাঁচটি শাখা — মাড়িয়া, আবুজমাড়িয়া, মুরিয়া, ধুরওয়া আর ডোর্লা। আবার কেউ বলেছেন — মোটেই তা নয়। মাড়িয়া-মুরিয়াদের পৃথকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। আপনি নিশ্চয় জানেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চললেও অনেক আদিম উপজাতি ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। আন্দামানের ওঙ্গৈ, আফ্রিকার পিগমিয়া সংখ্যায় ক্রমে ক্রমে আসছে। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীদের মতো, এই সেদিন ফুরিয়ে যাওয়া ডোডো পাখির মতো ওরা হয়তো ভবিষ্যতে থাকবে শুধু ইতিহাসের পাতায়। আপনি জানতে চান — দণ্ডকারণ্যের আদিবাসী মানুষের জনসংখ্যা বাড়ছে না কমছে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, খুলে বসলেন আদম-সুমারীর রিপোর্ট। দেখলেন 1901 সালে গোণ্ডদের সংখ্যা ছিল দু'লাখ চার হাজার। 1921 সালে সেটা বেড়ে গিয়ে হয়েছে দু'লাখ বিশ হাজার। খুশীয়াল হয়ে উঠলেন আপনি। যাক ওরা তাহলে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে না ক্রমে ক্রমে। এবার আপনি খুলে বসলেন 1931-এর রিপোর্ট। কী সর্বনাশ। গোণ্ড উপজাতি মাত্র চব্বিশ হাজার! আপনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন! মাত্র দশ বছরে দু'লক্ষ গোণ্ড উজাড় হয়ে গেল কেমন করে? না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। 1931-এর আদমসুমারীতে পূর্ব-সনাক্ত গোণ্ডদের দেখানো হয়েছে ছয়টি ভাগে : ভাত্রা—ছত্রিশ হাজার ; গোণ্ড—চব্বিশ হাজার ; মাড়িয়া—এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ; মুরিয়া—সওয়া লক্ষ ; কয়া—দশ হাজার ;

পর্জা — সাড়ে সতের হাজার। একুনে প্রায় তিন লক্ষ ষাট হাজার। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আপনার।

সে যাই হোক, বাস্তার জেলার কেন্দ্রস্থলে যখন এসে পৌঁছেছেন তখন আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে এইবার পরিচিত হয়ে নিন—

ভাত্রা : জগদলপুরের উত্তরে ও পূর্বে, রাজপথের পূর্বদিকের গ্রামগুলিতে ভাত্রাদের বাস। এককালে ওরাও ছিল সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে একান্ত সুদূরে এখন কিন্তু জগদলপুরের আর্থ-সভ্যতার ছাপ পড়েছে ওদের জীবনে। একদিন হয়তো ওরা গোণ্ডিভাষায় কথা বলতো — এখন বলে ভাত্রি। তার ভিতর অনেক হিন্দী আর ওড়িয়া শব্দ নির্বিচারে ঢুকে পড়েছে। চাষ-আবাদই ওদের প্রধান উপজীবিকা, আর সেটা করে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনে। বৎসর শেষের চৈত-দাণ্ডার উৎসব হচ্ছে ওদের কাছে মুসলমানদের বকর ঈদ, খৃস্টানদের বড়দিন। এসময় ওরা দলে দলে — ছেলেমেয়ে একই দলে — নাচতে বের হয়। এ গ্রামে সে গ্রামে নেচে নেচে ফিরে আসে স্বগ্রামে আনন্দ-উদ্বেল নর-নারী। এদের একটি উপশাখা বিবাহের পর গলায় পৈতা দেয়!

হালবা : বাস্তারের কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে এরা থাকে না। এরা ছড়িয়ে আছে সারা জেলায়। 1931 সালে এদের সংখ্যা ছিল ষোল হাজার। ওদের এভাবে সারা জেলায় ছড়িয়ে থাকার একটা কারণও আছে। আগেকার দিনে হালবারা ছিল বাস্তার রাজার সেপাই শ্রেণীভুক্ত। বিভিন্ন গড় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সারা জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এদের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকতে হত। কালে সেই সব অঞ্চলেই ওরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছে। মাড়িয়া-মুরিয়াদের মতো এরাও কাঠের তৈরি অঙ্গদেও দেবতার উপাসক। এদের কথ্যভাষা হালবি হচ্ছে বাস্তার জেলার মাতৃভাষা। প্রসঙ্গত বলা যায়, তিনটি কথ্যভাষা বহুলপ্রচলিত। হালবি, গোণ্ডি আর মাড়িয়া। 1951-এর সেন্সাস্ বলছে, দু' লক্ষ ষাট হাজার আদিবাসী হালবিতে কথা বলে, আর আড়াই লক্ষ গোণ্ডিতে, অর্থাৎ প্রায় সমান সমান। মাড়িয়া প্রায় এক লক্ষ তের হাজার আদিবাসীর কথ্যভাষা। তুলনায় এ অঞ্চলে মাত্র বাহাদুর হাজার লোকের মাতৃভাষা হচ্ছে হিন্দী।

মাড়িয়া : মাড়িয়াদের কয়েকটি ছোট ছোট শাখায় ভাগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্তত দুটি উপশাখার উল্লেখ করা দরকার। ইন্দ্রাবতী নদীর উত্তরাংশে, নারানপুর শহরের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অরণ্যমৌলি সবুজ পাহাড় চলে গেছে চান্দা জেলা পর্যন্ত। এই পাহাড়ের নাম আবুজমাড়। সভ্য জগতের মানুষ বড় একটা যায়নি ওর ভিতরে। এমন শত শত গ্রাম আছে যেখানে হয়তো কখনই কোন সভ্য মানুষ পদার্পণ করেনি। সমতলের মানুষদের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। অরণ্য-পর্বতের একান্তে আপন মনে আছে ওরা। ওদের বলে আবুজ-মাড়িয়া। বৎসরান্তে বার্ষিক মেলা বসে এখানে ওখানে। তাকে বলে মাড়াই। দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে জমায়েত হয় আবুজ-মাড়িয়ার দল — কাঁধে টাঙি, পরনে ল্যাণ্ট, হাতে ধনুক, পিঠে তুণ। মেয়েদের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। কটি থেকে জুওয়া পর্যন্ত একটা আবরণ। জমিতেও ওরা

সার দিতে জানে না — আজ এখানে, কাল ওখানে চাষ করে। ধানচাষ করে কেউ কেউ ; তাছাড়া কোশুরো, অড়হর, মানবা-র আবাদ করে। জার্মানিতে শুনেছি ল্যাবরেটোরি আর ল্যাভেটোরি ছাড়া সর্বত্রই জল মানে বিয়ার, রাশিয়ার গ্রাম্য উৎসব শুনেছি ভড়কা ছাড়া আলুনি — আবুজ-মাড়িয়াদের জীবনযাত্রায় “শূলপি” স্থানও তেমনি অপরিহার্য। সাবু গাছের রস থেকে তৈরি হয় এ মাদক — শূলপি। আগেই বলেছি মাড়িয়া ভাষায় কথা বলে এক লাখের উপর মানুষ — সে ভাষায় গোন্ডি শব্দই বেশী। ওদের একটি বিচিত্র নাচের প্রচলন আছে — ‘কোকোরাম কোর’ নাচ। সে নাচে ছেলেরা শুধু নাচে আর মেয়েরা গান গায়। বাস্তার জেলার আদিবাসী সমাজের মধ্যে ওরাই আছে সকলের পিছনে, অথবা দৃষ্টিভঙ্গি বদলে বলতে পারেন ওরাই আছে আদিমতার পুরোভাগে। ওদের যে অঞ্চলে বাস সেটা দুর্গম বলে এবং ওরা সমতলে নেমে আসতে নারাজ বলে আপনি হয়তো ওদের দেখা পাবেন না — যদি না আমার মতো ভাগ্যক্রমে গিয়ে পড়েন কোকামেটার মাড়াই-য়ে। দুর্লভ-দর্শন শ’ পাঁচেক আবুজ-মাড়িয়ার এক জমায়েত আমি দেখেছিলাম কোকামেটায়। সে কথা যথাস্থানে।

ইন্দ্রাবতী নদীর দক্ষিণাঞ্চলে মাতা দন্তেশ্বরীর মন্দিরের কাছেপিঠে কিংবা দক্ষিণে থাকে দাদামী-মাড়িয়া বা বাইসন-হর্ন-মাড়িয়া। এরাও শূলপি খায় ; আর খায় ‘লাস্তা’। তাড়ির নামান্তর। দন্তেশ্বরী বাস্তারের সবচেয়ে জাগ্রত দেবী। কালীঘাটের কালীকে যদি কলকাত্তাওয়ালী বলা যায়, তাহলে দন্তেশ্বরীকে বলতে হয় বাস্তারওয়ালী। ডাকিনী আর শঙ্খিনী নামে দুটি নদী এসে যেখানে মিশেছে ; সেই মুক্তবেণীর সঙ্গমস্থলে মায়ের মন্দির। বাস্তার মহারাজার প্রতিষ্ঠিত মাতৃকামূর্তি। জায়গাটার নাম দন্তেওয়াড়া। এই দন্তেওয়াড়া থেকে দক্ষিণে চলে যান — দেখতে পাবেন আকাশ ছোঁয়া বাইলা-ডিলা পর্বতমালা। বাইলা অর্থ বলদ। বাইলা-ডিলা হচ্ছে বলদের ককুদসদৃশ পর্বত। এখানে প্রচুর খনিজ-লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। লোহা-পাথর সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে। তৈরী হচ্ছে রাস্তা, এমনকি রেলপথ। অরণ্যদণ্ডকে এই প্রথম বসছে রেলের লাইন। একটি জাপানী সংস্থার সঙ্গে ভারত সরকার লোহা-পাথর নিষ্কাশনের চুক্তি করেছেন, সেই চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রেললাইন পাতার কাজ শেষ করতে হবে। দিবারাত্র ছোটোছুটি করছে অসংখ্য জীপ, ল্যান্ড-রোভার, ট্রাক। লৌহ-শৃঙ্খলে বাইলা-ডিলা পাহাড়কে বাঁধছেন ডি. বি. কে. রেলওয়ে। দণ্ডকারণ্য-বলাঙ্গির-কিরুবিরু রেলপথ। দাদামী মাড়িয়ার দল এসব দেখে সরে যাচ্ছে আরও অভ্যন্তরভাগে। এদের গোড়-নৃত্যকে আজ ভারত-বিখ্যাত বলা চলে। 1960 সালে নয়াদিল্লীতে সাধারণতন্ত্র দিবসে যে লোক-নৃত্যের প্রতিযোগিতা হয় তাতে এই বাইসন-হর্ন মাড়িয়ার দল প্রথম পুরস্কার পায়। মোকপাল গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা দণ্ডকারণ্যের তরফ থেকে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্মান লাভ করল। গোড়-নাচের বৈশিষ্ট্য হল ছেলেদের ঘিরে গোল হয়ে নাচে যুবতীর দল। ছেলেরা বাজায় মান্দ্রি ঢোল, ঘুরে ঘুরে। তাদের মাথায় বুনো মোষের শিঙ দিয়ে তৈরী অদ্ভুতদর্শন শিরস্ত্রাণ। মেয়েদের হাতে থাকে দাগুর — লাঠির মাথায় বাঁধা বুমুর। তালে তালে লাঠি

ঠুকে অপূর্বভঙ্গিতে নাচে ওরা।

এ ছাড়া ডোরলা, কয়া প্রভৃতি মাড়িয়াদের আরও কয়েকটি উপশাখা আছে; কিন্তু সে-কথা থাক।

মুরিয়া : কোণাগাঁও-নারানপুর সড়কের দুই ধারে এবং কোণাগাঁও-জগদলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের পশ্চিমধারে মুরিয়াদের বাস। জগদলপুর থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা চলে গেছে চিত্রকোট জলপ্রপাতের দিকে তার দুপাশেও অনেকগুলি মুরিয়া গ্রাম আছে। কিন্তু তারা নিজেদের বলে ‘রাজ-মুরিয়া’, মনে করে জাত হিসাবে তারা সাধারণ মুরিয়াদের চেয়ে উন্নততর। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গোণ্ডদের একটি উপশাখা — যারা রাজবাড়ির কাছাকাছি থাকে — তারা আত্মপরিচয় দেয় রাজ-গোণ্ড বলে। মুরিয়ারা মাড়িয়াদের মতো অপরিষ্কার নয়। তার অবশ্য কারণও আছে। মাড়িয়ারা বাস করে পাহাড় অঞ্চলে — জল সেখানে দুস্প্রাপ্য। মুরিয়ারা বাস করে সমতলে — নদীর ধারে ধারে। মুরিয়ারা যখন দল বেঁধে চলে তখন পথে কোন নদী পড়লে ওদের মন চুলবুল করে ওঠে। ছেলেরা আর মেয়েরা পৃথক হয়ে যায়। তারপর নদীর ধারে কাপড় ছেড়ে রেখে অন্তত একটা ডুব দিয়ে নেয়।

মুরিয়া সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল ওদের ‘ঘটুল’। অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নৈশ-ক্লাব। না, ক্লাব নয়, তার বেশী কিছু। নৈশ-ক্লাবে তথাকথিত সভ্য যুবক-যুবতীর দল সমবেত হয় ইন্দ্রিয়জ সুখানুসন্ধানের আশায়। নাইট-ক্লাবেও খেলার ব্যবস্থা থাকে, নাচের ব্যবস্থা থাকে, খানা-পিনা এবং রোমান্সের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, সংহতির আয়োজন নেই, জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা সেখানে অপাংক্তেয়। অপর পক্ষে ‘ঘটুল’ নৈশ স্কুল নয়, এখানে খেলাধুলা এবং সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা পাশাপাশি আছে। ঘটুল অবিবাহিত ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতীর যৌথ ভূমিটারি। আসামের নাগাদেরও আছে এই ধরনের সার্বজনীন বাসগৃহ — ‘মোরাঙ’। সেখানে কিন্তু ছেলেদের মোরাঙ আর মেয়েদের মোরাঙ পৃথক গৃহ। ওরা মুরিয়াদের মতো একত্র রাত্রিবাস করে না।

তিন-চার বছর বয়স পর্যন্ত মুরিয়া শিশু হচ্ছে মায়ের সম্পত্তি। তারপর সে সমাজের। ঐ বয়সেই তারা চলে যায় ঘটুলে। প্রতি গ্রামেই আছে ঘটুলগৃহ। বড় একটা হল-কামরা, লতাপাতায় ঘেরা। ঘটুলের নিজস্ব জমি আছে, খামার আছে, ধানের গোলা আছে। ঘটুল কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয় — গ্রামের অবিবাহিত যুবক-যুবতীর একটা যৌথ খামার ও খামারবাড়ি। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে এখানে আসে ছেলেমেয়ের দল। বেরিয়ে আসে আঠারো-বিশ-বাইশে। আসে একা, ফেরে যুগলে। তা বলে আমরা যেমন ছেলেকে সৈনিক স্কুলে, মেয়েকে কনভেন্টে পাঠিয়ে তাদের খরচের খাতায় লিখে রাখি, ওখানে তা হয় না। ঘটুল গ্রামেই অবস্থিত। ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যায় ওখানে যায়, সকালে ফিরে এসে বাড়ির কাজকর্ম করে, বাড়ির সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ থাকে ঠিকই। ঘটুলবাসী মুরিয়া ছেলেমেয়ের সঙ্গে আবাসিক হোস্টেলে থাকা আমাদের সন্তানের তফাতটা হচ্ছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভরতপক্ষীর সঙ্গে যেন শেলীর ভরতপক্ষীর তফাত। আমাদের ছেলে সৈনিক স্কুলে গিয়ে উড়তে শেখে—

Singing still dost soar, and soaring ever singest !

ওরা ঘট্টলে গেলেও বাড়ির কথা ভোলে না। বাপমায়ের সেবা করে, ঘরের কাজ করে—গৃহের দাবি আর ঘট্টলের দাবি দুই দিকেই তাদের নজর থাকে—

True to the kindred points of Heaven and Home !

ঘট্টলেই হয়ত ওরা জীবন-সাথী বেছে নেয়। ফিরে এসে বাপমায়ের আশীর্বাদ নেয়, গাঁও-বুড়ো প্যাটেল অথবা গাইতার অনুমতি নিয়ে ঘর বাঁধে। ঘট্টলের সব সম্পত্তিই সার্বজনীন। সাম্যবাদীরা এখানে এসে শিক্ষা নিয়ে যেতে পারেন। সমান অধিকার বিষয়ে এদের ধারণা সভ্য-মানুষের ধারণাকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। এখানকার আদিবাসী পুরুষ-রমণীও সার্বজনীন সম্পত্তি। ঘট্টলের মেয়েরা সবাই ‘মোটিয়ারী’— ছেলেরা সবাই ‘চেলিক’। ঘট্টলের নিজস্ব কর্মপরিষদ আছে। মেয়েদের প্রধান হচ্ছে ‘বেলোসা’, ছেলেদের সর্বাধিনায়ক ‘শিরদার’। বড় মেয়েরা ছোট মেয়েদের শিখিয়ে তোলে নানান গৃহস্থালীর কাজে। লেখাপড়া বলতে যা বোঝায় — তা কেউ শেখে না ঘট্টলে। লিখিত বর্ণমালাই নেই ওদের ; কথ্যভাষা — গোষ্ঠি অথবা হালবি। মোটিয়ারীর কাছে চেলিক শুধু বয়-ফ্রেন্ডই নয়, আরও কিছু বেশী। সে তার দিনের কর্মসহচরই শুধু নয় — রাত্রে নর্মসহচরও। অথচ ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। একনিষ্ঠ নয় এ বন্ধন। কিন্তু প্রত্যেকটি মোটিয়ারী নিজ ঘট্টলের কাছে একনিষ্ঠ সতীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সতীত্বের সংজ্ঞাটা ওদের কাছে অন্যরকম — তাই আমরা, সভ্য-জগতের মানুষ এ ব্যবস্থায় মুখ বাঁকাই। আমরা একবারও ভেবে দেখি না যে, সতীত্বের যে সংজ্ঞাটা ওরা মেনে নিয়েছে তার মর্যাদা কী কঠিন শর্তে ওরা মেটায়। বিশেষ বিশেষ উৎসব রজনী ভিন্ন অন্য কোন ঘট্টলের কোন চেলিকের সঙ্গে ওরা এক-শয়্যায় বসতে পারে না। কিন্তু নিজ ঘট্টলের সব চেলিকের উপরেই তার সমান অধিকার — সব চেলিকেরই যেমন অধিকার আছে প্রতিটি মোটিয়ারীর উপর।

ঘট্টল আবার দু-জাতের। জোড়িদার-ঘট্টল আর নয়া-ঘট্টল। জোড়িদার ঘট্টলে চেলিক-মোটিয়ারীর দল জোড়ায় জোড়ায় থাকে। সেসব ঘট্টলে প্রত্যেকটি চেলিক একজন বিশেষ মোটিয়ারীর সঙ্গে আবদ্ধ। খেলাঘরের বর-কনে ওরা। তা বলে চার-ছয় বছরের শিশু ওরা নয়। তাই খেলাঘরের বর-কনের খেলার যে অর্থ আমাদের কাছে স্বীকৃত ওদের কাছে তা নয়। অবশ্য ওদের কাছে বাকিটাও খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মানিকলালের সঙ্গে একই ঘোড়ায় চড়তে হয়েছিল ইম্‌লি-বেগমকে। ফলে মানিকলালকে তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, ‘যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি তবে তোমাকে বিবাহ করিব।’ আজ বন্ধুর স্ত্রীকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে অনায়াসে আপনি টালা-টালিগঞ্জ, বালি-বালিগঞ্জ করছেন। সমাজ তেড়ে আসছে না। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সতীত্বের সংজ্ঞা বদলায়। মুরিয়া সমাজের এ ব্যবস্থাটাও মেনে নিতে যদি আপনার আমার নাকের পাশে কুঞ্চন জাগে তাহলে বুঝতে হবে দোষটা মুরিয়া সমাজের নয়, আমাদের নাকের। নয়া-ঘট্টলে প্রতি তিনদিন অন্তর জোড় ভাঙে — জোড় বাঁধে। বেলোসা আর কোতোয়ার সেটা নিয়ন্ত্রণ করে। কড়া নজর রাখা হয় যাতে সকলের সমান অধিকারের মর্যাদা রক্ষিত হয়।

পরজা এবং ধুরওয়া : জগদলপুর আর কোণাগাঁও তহশীলে প্রায় হাজার বিশেক পরজার বাস। এদের ভাষা পারজী, এদের বৈশিষ্ট্য পরজা নাচ। এ নাচ হালবারাও নাচে।

গাদাভা : গাদাভাদের চেনা যায় তাদের গানে আর কানে। এমন সুরেলা মিষ্টি গান আর কেউ গায় না। কানে পরে যে দুল তার ফাঁক দিয়ে প্রমাণ সাইজ ডিনার প্লেট গলে যাবে অক্লেশে।

শবর : শবর শব্দটার একটা ঐতিহ্য আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছেন, শবররা বিশ্বামিত্রের পুত্র। অথচ বাল্মীকি বলেছেন, বিশ্বামিত্রকে প্রতিহত করতে বশিষ্ঠের কামধেনু সুরভির দেহ থেকে শবরজাতি মন্ত্র-প্রভাবে সন্তৃত হয়েছিল। রামায়ণের কবি শবরীর গুরু মাতঙ্গকে মহামুনিক্রমে বর্ণনা করলেও কাদম্বরীর কবি বাণভট্ট বলেছেন : কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশ রাত্রির সমাহার-সদৃশ ঘোরবর্ণ মাতঙ্গ ছিলেন দণ্ডকারণ্যের মুনিঋষিদের কাছে কালান্তক যম। বাল্মীকি-চিত্রিত মাতঙ্গ আর বাণভট্ট বর্ণিত মাতঙ্গ অভিন্ন ব্যক্তি কি না কে বলবে ? এক ব্যক্তি হলেও আপত্তি করবার কী আছে? অন্ধের হস্তী-দর্শনের মতো বাণভট্ট বোধ করি তেঁতুল ফলের স্বাদ নিয়েছিলেন জিহ্বায় — বাল্মীকি দেখেছিলেন চোখ খুলে — ‘লাজুক একটি মঞ্জরী, মৃদু একটি গন্ধ, চিকন লিখন তার পাপড়ির গায়ে!’

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেই শুধু নয়, গ্রীক পণ্ডিত টলেমির জবানীতেও জানতে পাই শবরদের কথা। টলেমি বলেছেন : ভারতবর্ষের গাঙ্গেয় উপত্যকায় শবর জাতির বাস — তাদের দেশ হীরামুক্তায় ভরা !

কানিংহাম সাহেব বলেছেন :

‘My conclusion is, that in early times, where the name of Savara is used, it probably covers all the different divisions of the Kols as they are now called.

এই অর্থেই দণ্ডকারণ্যের যাবতীয় আদিবাসী রমণীকে ‘দণ্ডক-শবরী’ নামে অভিহিত করতে সাহসী হয়েছি।

নৃকুল বিদ্যায় আজকে যাদের শবর বলা হয়, তারা বাস করে উড়িষ্যার কোরাপুট আর গঞ্জাম জেলার সীমান্তে, গুনপুরের আশে-পাশে। সেটা আজকের দণ্ডকারণ্যের এলাকার বাইরে। তাই ওদের কথা আমাদের বিস্তারিত আলোচনা না করলেও চলবে। শুধু একটি মজার কথা না বলে পারছি না।

শবররা মুণ্ডাজাতীয় একটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার অধিকারী ছিল আদি যুগে। যেসব শবর সমতলে থাকে তাদের মধ্যে তেলেগু আর ওড়িয়া শব্দ অনেক অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু গুনপুরের পূর্বাঞ্চলে — অর্থাৎ যেখানে কোরাপুট জেলা গিয়ে মিশেছে গঞ্জাম জেলায় — সেখানকার পাহাড়ী আদি-শবররা তাদের ভাষাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। ভাষার প্রতি একনিষ্ঠতা এই পাহাড়ী উপজাতির একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

ওদের ভাষার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে ওরা প্রতিধ্বনিমূলক শব্দের ব্যবহার করতে ভালোবাসে। প্রতিধ্বনিমূলক শব্দ অর্থে একই অন্তর্ধানি বিশিষ্ট পর পর ব্যবহৃত দুটি

শব্দ। সব ভাষাতেই কম-বেশী এ ধরনের দ্বিত্ব-প্রয়োগ আছে। আমাদেরও ‘ভয়-টয়’ করে, ‘খালি-খালি’ লাগে। আমাদের মধ্যে ‘কেউ কেউ’ ‘কাজ-টাজ’ করে না, শুধু ঘরে বসে ‘কবিতা-টবিতা’ লেখে। ফলে তাদের ‘পয়সা-টয়সা’ জমে না। কিন্তু বাঙলা ভাষায় এ জাতীয় পৌনঃপুনিক শব্দের দ্বিতীয়টি স্বভাবতই ‘ট’ যুক্ত আর তার অর্থ ‘জাতীয়’ বোঝাতে। ‘টবিতা’ বলতে আমরা ছোট কবিতা, গান, গীতিকাব্য ইত্যাদি বোঝাই, ‘টয়সা’ বলতে যেমন গাড়ি-বাড়ি-বউয়ের গহনা। ওরা কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটা জাতীয় বোঝাতে ব্যবহার করে না। সেটা শ্রুতিমধুর বলে অহেতুক দ্বিত্ব প্রয়োগ করে। পাহাড়ের দেশে প্রতিধ্বনিতে অভ্যস্ত বলেই বোধ করি এভাবে কথা বলে ওরা। ‘জেলু-মেলু’ মাছ; ‘জোজোঞ্জি-যোযোঞ্জি’ অর্থে পূর্বপুরুষ, ‘কোকেডি-কাকোডি’ বলতে বোঝায় ধূর্ত লোক। ‘জেলু’ মানে মাছ, ‘মেলু’ মানেও মাছ, আর জেলু-মেলু মানেও মাছ। ‘মাছ-টাছ’ অর্থাৎ ডিম-মাছ-কাঁকড়া ইত্যাদি নয়।

এত কথা বললাম শুধু জানাতে যে, শবর ভাষায় ‘দন্’ শব্দের অর্থও জল, ‘ডক্’ শব্দের অর্থও জল। আর জানাতে যে, বাল্মীকি বলেছেন, শবরদের বাস ছিল দণ্ডকের সেই অঞ্চলে যেখানে পম্পার তীরে দেখা যেত শুধু জল আর জল!

॥ তিন ॥

আভ্যন্তরীণ উত্তাপে মাতা বসুমতী যখন থরথর করে কাঁপতে থাকেন, তখন নাকি মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে অবস্থিত বারাণসীতে তার কোন স্পন্দন অনুভূত হয় না। পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও কাশী যেন মদ্রবলে এ পার্থিব কম্পনকে এড়িয়ে যায়। অরণ্যপর্বতের এ-দেশের উপরেও তেমনি কোন দৈব আশীর্বাদ আছে কি না জানি না, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত প্রচণ্ড ভূকম্পন হয়েছে, লক্ষ্য করেছি তার কোন অনুরণন ধরা পড়েনি এ আরণ্যক সমাজের ভূকম্পনযন্ত্রে। তেঁতুলগাছের মতোই মানবভাগ্যের ওঠানামার প্রতি কোন ক্রম্বেপ না করে আত্মসমাহিত এই উদাসীন দণ্ডকারণ্য বজায় রেখেছে তার আদিম প্রকৃতির স্বাভাব্য। বোণ্ডো-মাড়িয়া-মুরিয়া-শবরদের গ্রামে গেলে মনে হবে দেশকালের গতিসীমাকে বুঝি কোন মদ্রবলে ছাড়িয়ে এসেছি। বিশ্বাস করা কঠিন হবে — আমরা বিংশশতাব্দীর মানুষ, ধারণা করা শক্ত হবে — আমরা ভারতবর্ষের ভিতরেই আছি।

এককালে এখানে যে সমৃদ্ধিশালী হিন্দু জনপদ ছিল তার প্রমাণ আজও মেলে বারসুর, বৈরামগড়, দন্তেওয়াড়া, কুরুশপালের জীর্ণ মন্দির আর শিলালিপির ধ্বংসাবশেষ দেখলে। পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে এসব জনপদ বারে বারে আক্রান্ত হয়েছিল — খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। চালুক্য, চোল, হয়শোল রাজারা বারে বারে এ অরণ্যকে পদানত করতে চেয়েছেন। কেমন করে সেইসব আধুনিক সমরসাজে সজ্জিত সেনাদলকে ওরা প্রতিহত করেছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। সে সাফল্যের কোন কাব্য-ইতিহাস-গাথা নেই আদিবাসীদের দপ্তরে। এই বনচারী মানুষগুলির কোন লিখিত বর্ণমালাই নেই, নেই তার কাব্য ইতিহাস! খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দেখি বাস্তার জেলার ইতিকথা প্রথম ইতিহাসের রূপ নিতে চলেছে। মধ্যযুগে, অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ওয়ারাঙ্গলে রাজত্ব করতেন একটি শক্তিশালী কাকতীয় রাজবংশ। সম্ভব প্রথম যুগে এঁরা ছিলেন চালুক্যদের করদ রাজা — কিন্তু পরবর্তী যুগে এঁরা নিজেদের স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করেন। ওয়ারাঙ্গলের ইতিহাসে দেখি পঞ্চদশ শতাব্দীতে আহমদ শাহ বাহমণীর কাছে পরাজিত হলেন কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্র। শুধু রাজ্যই হারালেন না, প্রাণও হারালেন যুদ্ধে। প্রতাপরুদ্রের ছোটভাই আন্নাম দেও। বাহমণী রাজার সৈন্যদলের চোখ এড়িয়ে তিনি গোদাবরী পার হয়ে পালিয়ে এলেন বাস্তার জেলায়। রাজার ছেলে যেখানে যায় রাজ্য গড়ে। বাস্তারের অরণ্যবাসীদের মধ্যে আন্নাম দেও গড়ে তুললেন এক রাজবংশ। বাস্তারের লোকগাথা অনুযায়ী আন্নাম দেওই বাস্তারের প্রথম রাজা।

কিন্তু আন্নাম দেওয়ের আগেও বাস্তারের শক্তিশালী করদ রাজা বা জমিদারের হৃদিস মেলে। দন্তেওয়ারা তহশীলে, বারসুরে নাগবংশী তেলেগু রাজারা আন্নাম দেওয়ের আগেকার যুগের মানুষ। জগদলপুরের মাইল পঁচিশ পূর্বে ইন্দ্রাবতী নদী যেখানে

সহস্রধারায় মালভূমি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচে সেই চিত্রকোট জলপ্রপাতের কাছে-পিঠে ছিল আর একটি শক্তিশালী জনপদ — কুরুশপাল। তখন এর নাম ছিল চক্রকোট। আজকের সুক্কা আর কোন্টা তহশীলেও ছিল ওয়ারাঙ্গেল রাজার করদ শক্তিশালী জমিদার।

বাস্তার জেলার মধ্যেই আমরা একক্ষণ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করেছিলাম, উড়িষ্যার কোরাপুট জেলারও কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। কোরাপুটের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে — যেখানে অন্ধ্রের সীমান্তে আজ মাচুকুন্দ জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে, সেখানকার কাছে-পিঠে মৎস্যতীর্থ, নন্দপুর আর মল্লিকামর্দনগিরির কথাও বলতে হয়।

দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্য যেমন পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে যায়, আর তার একটি ভাগ যেমন জন্ম দেয়গোলকুণ্ডারশক্তিশালী কুতুবশাহী বংশকে — ঠিক তেমনি-ভাবেই উড়িষ্যার গজপতিরাজ প্রতাপরুদ্রদেবের রাজ্য ভেঙে পাঁচটি ছোট ছোট রাজবংশ জন্ম নিয়েছিল। নন্দপুরের শীলবংশী রাজাদের প্রথম উৎপত্তি ঐ সূত্রেই। ইতিহাস এই শীলবংশী রাজাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু খবর আমাদের দেয়নি। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দেখি এই শীলবংশী রাজারা অন্যান্য সামন্ত-রাজাদের পিছনে ফেলে রঙ্গমঞ্চের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সে যুগে শীলবংশী রাজাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওড্ডাবাদীর মৎস্যবংশীয় রাজারা। বিশাখাপত্তমে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন বলে, এই মৎস্য বংশের আদি পুরুষ ছিলেন একটি বিরাটকায় মৎস্য। নন্দপুরের শীলবংশ রাজা অথবা ওড্ডাবাদীর মৎস্যবংশীয় রাজাদের কথা বিশেষ কিছুই জানতে পারি না। যাও বা খবর পাই তা শুধু সাল-তারিখ সংবলিত যুদ্ধবিগ্রহের নথিপত্র। সে যুগে আদিবাসী সমৃদ্ধির কী অবস্থা ছিল সে কথা লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকেরা প্রয়োজন বোধ করেননি। কল্পনার অনেকখানি প্রলেপ না লাগাতে পারলে সেই বংশতালিকার ইতিবৃত্ত থেকে রসঘন কোন উপাখ্যান খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীবিনায়কদেবের নন্দপুরের সিংহাসনে আরোহণের কাহিনীটি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে। নন্দপুররাজ প্রতাপগঙ্গা বার্ষিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই। শিশু সাহিত্যের সেই চিরন্তন সমস্যায় এই 'এক-যে-ছিল-রাজা'ও বিপর্যস্ত। রাজার হাতিশালে হাতি আছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিন্তু রাজার মুখে হাসি নেই। রাজা প্রতাপগঙ্গার কোন পুত্র-সন্তান নেই। শীলবংশী রাজার বৃদ্ধি আর বংশরক্ষা হয় না। এত বড় রাজ্য কাকে দিয়ে যাবেন সেই চিন্তাই রাজার চোখে ঘুম নেই। পুত্র না থাকলেও ও মহারাজার একটি সর্বগুণস্বিতা কন্যা ছিল। রাজকন্যা লীলাবতী। যদিচ ইতিহাস বলেনি, তবু গল্পের খাতিরে আমরা ধরে নিতে পারি রাজকন্যা লীলাবতী ছিলেন কুচবরন কন্যে, তাঁর মেঘবরন চুল। রাজকন্যা হাসলে পান্না আর কাঁদলে মুক্ত ঝরত। নন্দপুররাজকে এই সমস্যার মধ্যে বেখে এবার আমরা গল্পের পটভূমি সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি সুদূর কাশ্মীরে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে তখন সূর্যবংশীয় মহারাজের দুই পুত্র। প্রথা অনুযায়ী তিনি যখন জ্যেষ্ঠপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন তখন কনিষ্ঠপুত্র বিনায়কদেব বের হয়ে পড়লেন তীর্থপর্যটনে। বিনায়কদেবের মনেও শান্তি নেই। রাজজ্যোতিষী তাঁর অশান্তির মূল। শৈশবেই তিনি

কনিষ্ঠ রাজকুমারের করকোষ্ঠী বিচার করে বলেছিলেন — এ ছেলে রাজা হবে। শুনে শিউরে উঠেছিলেন মহারাজ কাশ্মীর রাজ! বিনায়ক কি শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃহত্যা করে বসবে নাকি? মহারাজের আশঙ্কা ক্রমে রাজবাড়ির অন্যান্য সকলের মধ্যে সংক্রামিত হল। বিনায়কদেবকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখে। বিনায়কের মনে ভ্রাতৃহত্যার কথা কোনদিনই জাগেনি। তিনি ছিলেন অবিবাহিত; নাটকের নায়িকা তখনও তাঁর জীবননাট্যের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হননি। ফলে লেডি ম্যাকবেথের অভাবে নাটক অন্য খাতে বইতে শুরু করল। উচ্চাভিলাষ মনের মধ্যে চেপে রেখে তীর্থভ্রমণে বার হয়ে পড়লেন বিনায়ক। তীর্থের সেরা বারাগসী। রাজপুত্র একদিন এসে পৌঁছিলেন কাশীতে। ভক্তিভরে দেবাদিদেববিশ্বেশ্বরকে পূজা নিবেদন করে রাজপুত্র মন্দির-চাতালে ক্রান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করলেন। সে রাত্রিটা বিনায়কদেবের জীবনে একটা বিচিত্র রাত্রি। গঙ্গাतीরের পাষাণরানার কঠিন শয্যায় পথশ্রান্ত রাজপুত্র শায়িত। গঙ্গার বুকে তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে কয়েকটি নিশাচর বজরা। আকাশে অগুনতি নক্ষত্র আর গঙ্গার বুকে তারই প্রতিফলন। বিনায়কদেব মনে মনে বললেন — হে বিশ্বনিয়ন্তা, এ তুমি কী করলে? রাজা হওয়ার কল্পনা আমার কোনদিনই ছিল না। আমি আমার পিতৃদেবের কনিষ্ঠ পুত্র; কোনদিন সিংহাসনে বসবার অধিকার আমার হবে না এ কথাই জানতাম আমি। তা হলে আমার করকোষ্ঠীতে কেন তুমি লিখে দিলে এমন অশুভ ইঙ্গিত? তরুণ গরুড়ের মতো আমার ক্ষুধার্ত বাসনা আকাশচুম্বী হতে চাইছে। তাকে আমি আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না, দেব। পাছে কোন অসতর্ক মুহূর্তে হাত আমার বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে তাই দাদার কাছ থেকে আমি দূরে সরে এসেছি। তুমি আমাকে শান্তি দাও!

প্রার্থনা জানাতে জানাতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন বিনায়কদেব। মধ্যরাত্রে তিনি স্বপ্নদেখলেন যেন স্বয়ং শিব তাঁর শিয়রের কাছে এসে বলছেন : রাজজ্যোতিষী তোমাকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাননি। আমিও তোমাকে মিথ্যা কুহকের মধ্যে ফেলছি না। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে যাও। গোদাবরীর সন্নিহিত জনস্থানে দেখবে সীমাচলম আর বিদ্যাপুরের মাঝখানে আছে এক বিশাল জলকুণ্ড। তার নাম মৎস্য-কুণ্ড বা মৎস্যতীর্থ। এই মৎস্যতীর্থ যে রাজ্যে তার নাম নন্দপুর। তুমি সেখানে যাও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল রাজকুমারের। স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিলেন না তিনি। যাত্রা শুরু হল দক্ষিণাপথে। দীর্ঘদিন পরে তাঁর যাত্রা সমাপ্ত হল নন্দপুর নগরীর উপকণ্ঠে সর্বেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে। রাজপুত্রকে এখন আর চেনা যায় না। বসন ছিল, মলিন, শরীর ধূলি-ধূসরিত। পথশ্রান্ত বিনায়ক বিশ্রাম নিলেন মন্দিরের চাতালে। পরদিন ভোরবেলা তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল তুরাভেরীর শব্দে। বিনায়কদেব চোখ মুছে উঠে দেখেন নন্দপুররাজ তার সম্মুখে। নন্দপুরের অপুত্রক মহারাজ পূর্বরাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন — সর্বেশ্বর মহাদেব তাঁকে স্বপ্নে বলছেন : আমার মন্দিরে বিশ্রাম নিচ্ছে কাশ্মীররাজের কনিষ্ঠ পুত্র। তাকেই কন্যা সম্প্রদান করে, তাকেই রাজ্যভার দিয়ে তুমি নিশ্চিত হও!

দেবাদিদেব শঙ্করের প্রত্যাদেশে বিনায়কদেব রাজ্য লাভ করেছিলেন বলে শীলবংশীদের এই দৌহিত্র বংশের নাম হল শঙ্করবংশ।

শীলবংশী রাজাদের রাজধানী নন্দপুর ছিল শীলা নদীর তীরে। নন্দপুর আজও আছে। জয়পুর থেকে বাসে করে যাওয়া যায়। মহাকালের রঙ্গমঞ্চে নন্দপুরের যে ভূমিকা তা অভিনীত হয়ে গেছে পূর্ব অক্ষে। আজ সেখানে কিছুই নেই। কিন্তু মৎস্যতীর্থে আজও যায় যাত্রিদল। তীর্থযাত্রী নয়, এক্সকার্শানের মোহে-পড়া পর্যটক। জয়পুরের পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে প্রাচীনকালের মৎস্যকুণ্ডে গড়ে উঠেছে এক জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা। মৎস্যকুন্ড নয়, ‘মাচকুন্দ হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট’। বিজলীবাতির শতনরী গলায় আধুনিক ‘মাচকুন্দ ড্যাম’কে দেখতে আসে সুবেশ তরুণ-তরুণীর দল। খেয়াল-খুশিতে একটা সন্ধ্যা কাটিয়ে যায় সেখানে। তারা জানে না, যেখানে শতরঞ্চি বিছিয়ে দু-দণ্ড হৈ-হল্লা করে গেল, হয়তো ঠিক সেইখানেই একদিন নাম-সংকীর্তনের আসর জমিয়ে বসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব !

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চলেছেন সীমাচলম তীর্থ থেকে বৃন্দাবনের দিকে। গোদাবরী তীরে বিদ্যাপুর। সেখানকার শাসনকর্তা গজপতিরাজ রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে চরিতামৃতে। সীমাচলম থেকে বিদ্যাপুরে যাবার পথে পড়ে এক অরণ্যপর্বত। তখন তার নাম ছিল মল্লিকা-মর্দনগিরি। যুগযুগান্তরের উচ্চারণ-বিকৃতিতে আজ যা নাকি মালকানগিরি। সুতরাং হয়তো মহাপ্রভুকে এই দুর্ভেদ্য অরণ্য পর্বতের পথেই যেতে হয়েছিল বৃন্দাবনে। এ কথা মনে করার বিশেষ কারণ আছে। ভ্রমণের ওই পর্যায়ে মহাপ্রভুর মৎস্যকুণ্ড দর্শনের কথা আছে। অবশ্য অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত বলেন — এই মৎস্যকুণ্ড ছিল অধুনা ফরাসি কবলমুক্ত মাহেতে। অর্থাৎ মালাবার উপকূলে। দু’পক্ষই অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন। মহাপ্রভুর ভ্রমণের সমসময়ে লেখা ভক্ত গোবিন্দদাসের দিনলিপিটি পাওয়া যায় না — আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণাত্যের তীর্থগুলি যে পর্যায়ক্রমে দর্শন করেন সেই পর্যায়ক্রমে তিনি ভ্রমণকাহিনী লিখতে পারেননি। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের মতো শ্রীচৈতন্যের পদরজধন্য কি না এ আরণ্যকভূমি, সেটা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

আমার কেমন যেন মনে হয়, মহাপ্রভু দণ্ডকারণ্যের এই দক্ষিণাঞ্চল দিয়েই গিয়েছিলেন বৃন্দাবনের পথে। আমার অনুমানের সপক্ষে একটিমাত্র যুক্তি আমি দাখিল করছি। ভাষাবিদরা হয়তো এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন।

মালকানগিরি অঞ্চলে দুর্গম পাহাড়ের মাথায় বাস করে অদ্ভুত এক আদিবাসী জাত। তাদের নাম বোণ্ডো। সমস্ত দণ্ডকারণ্যে যতগুলি আদিবাসী জাত আছে তার মধ্যে তিনটির প্রকৃতি একেবারে আদিম। সভ্যজগতের সঙ্গে এই তিনটি জাতির সংস্পর্শ মনোযোগে কম। আবুজমাড় পাহাড়ের মাথায় বাস করে আবুজমাড়িয়া, গঞ্জাম জেলার কাছাকাছি থাকে শবর, আর মালকানগিরি অঞ্চলে আছে বোণ্ডোরা। মুরিয়া, পরজা, ডায়া, ডোরলাদের তুলনায় এই তিনটি জাত অনেক বেশী অসভ্য। জয়পুর থেকে মালকানগিরি যাওয়ার পথে পড়ে একটা গণ্ডগ্রাম — গোবিন্দপল্লী। সেখান থেকে

একটা বন্য সড়ক চলে গেছে দক্ষিণমুখে। এ পথে পড়বে একটি ছোট গ্রাম মুণ্ডাগুড়া। বোণ্ডাদের যদি দেখতে চান, তা হলে এই মুণ্ডাগুড়া থেকে আপনাকে পাহাড়ে চড়তে হবে। দুর্গম পাহাড় পেরিয়ে আপনি পৌঁছবেন বোণ্ডা গ্রামে। খাদ্য-পানীয় কিছুই সেখানে আশা করবেন না — আপনাকে তাই হাতে করে নিয়ে যেতে হবে টিফিন-ক্যারিয়ার, জলের বোতল আর প্রাণ। যে কোন মুহূর্তে ওরা তীর ছুঁড়ে বসতে পারে। অতি অল্পেতেই ওরা চটে যায়। ওদের মেয়েরা মাথার চুল কামিয়ে ফেলে। উর্ধ্বাঙ্গে কোন আবরণ দেয় না। অগুনতি হার, বালা, চুড়িতে প্রত্যেকটি মেয়ে যেন জুয়েলারী দোকানের চলমান শো-কেস। পুরুষেরাও নেংটিসার। যে শিব আর শক্তি সারা ভারতে নাক গলিয়ে ঢুকে পড়েছেন তাঁরাও চড়তে পারেননি ঐ পাহাড়ের মাথায়। ওদের যে লিখিত বর্ণমালা নেই সে কথা বলাই বাহুল্য — ওদের কথা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অবোধ্য। তার মধ্যে তামিল-তেলেগু অথবা সংস্কৃত তৎসম বা তৎভব শব্দের ছিটেফোঁটাও নেই। ওদের বিবাহ হয়, পিতৃকুল সমাজ। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর ‘কুনয়’, স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর ‘আম্পর’। ছেলের প্রতিশব্দ ‘অন’, দাদা — ‘মাঙ’, এমনকি এমন যে সম্পর্ক ‘মা’ — যার অভিধা প্রায় সারা বিশ্বে ‘ম’ অক্ষর যুক্ত — তাকে বলে ‘মুং’। এ হেন বোণ্ডা ভাষাতে দুটি শব্দের সন্ধান পেয়েছি যা আমাদের নিঃসন্দেহে বিচলিত করেছে।

ঈশ্বর বা ভগবানের একটা ধারণা ওরা করতে পেরেছে। যদিচ তাঁর সত্তার যে ধারণা ওরা করেছে তার সঙ্গে ব্রহ্ম, আল্লা বা গডের কোন সাদৃশ্য নেই — তবু তিনিই ওদের অধিদেবতা। সেই অজানা জগৎনিয়ন্তাকে ওরা যে শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করেছে, সে শব্দটা হল ‘মহাপ্রভু’। আশ্চর্য নয় ?

এ ছাড়া ওদের সামাজিক রীতিতে পাতানো-বন্ধুত্বের মূল্য খুব বেশী। আমাদের দেশে ছোট মেয়েরা যেমন সই পাতায়, ওদের দেশে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তেমনি সই পাতায়। এই বন্ধুত্ববরণ একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আমাদের ধর্মে পোষ্যপুত্র নেবার মতো। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে আপন ভাইয়ের বিবাদ হলে ওরা বন্ধুর পক্ষ নিয়ে লড়ে। সই পাতালে একটা নামকরণ করতে হয়। একজন অপরজনের গঙ্গাজল, চোখের বালি কিংবা মহেন্দ্রের ভাষায় চুরুটের ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি জাতীয় একটা কিছু হয়। ছেলেবেলায় পড়েছি ত্রৈলোক্যনাথের মশা কঙ্কাবতীর সঙ্গে ‘পচাজল’ পাতিয়েছিল। বোণ্ডারা এই ধরনের আমৃত্যু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে একজন হয় আর একজনের ‘মহাপ্রসাদ’।

আমি অবাক হয়ে ভেবেছি যারা দিদিকে ডাকে ‘মিঙ’, বোনকে ডাকে ‘কু’, জ্যেষ্ঠা যাদের ‘বুমান’, স্বশুর ‘আঙকুই’ — তারা জগৎনিয়ন্তাকে ‘মহাপ্রভু’ নামে ডাকে কেমন করে ? কে তাদের শিখিয়েছে ঈশ্বরের এ অভিধা ? আর যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের মর্যাদা আমৃত্যু মাথায় করে রাখতে হয় তাকেই বা কেন বলে ‘মহাপ্রসাদ’ ? বলা বাহুল্য ‘প্রসাদ’ আর ‘প্রভু’ শব্দ দুটির ব্যবহার ওদের ভাষায় নেই, আর ‘মহা’ কোন উপসর্গই নয় ওদের কথা ভাষায়।

তাই আমার বিশ্বাস করতে মন চেয়েছে যে, শুধু শ্রীরামচন্দ্রই নন, প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিও পড়েছিল এই দণ্ডকারণ্যের প্রত্যন্ত দেশে।

॥ চার ॥

কোকামেটার মাড়াই দেখতে গিয়েছিলাম।

মাড়াই কাকে বলে তা দণ্ডকারণ্যের মানুষ জানে। এ অরণ্যে যাঁরা আমার মতো দৈবাৎ এসে পড়েছেন, অথবা যাঁরা আদিবাসী জীবন সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁরাই জানেন “মাড়াই” বস্তুটি কী জাতীয়। কিন্তু ছাপার অক্ষরে গল্প করতে বসায় বিপদ আছে। শহুরে মানুষদের জন্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

মাড়াই হচ্ছে আদিবাসীদের বাৎসরিক মিলন উৎসব। মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার পশ্চিমপ্রান্তে আকাশ-ছোঁয়া আবুজমাড় পাহাড়। ঐ পাহাড়ের অভ্যন্তরে মানুষ তো ছার, স্বয়ং মহাকাল পর্যন্ত পা টিপে টিপে চলেন। বিংশ-শতাব্দী ও-দেশে দূর অস্ত্র। ওরা রয়ে গেছে সেই বৃহদারণ্যকের যুগে। পাহাড়ের কোলে-কোলে আবুজমাড়িয়া গ্রাম। পশুপালন জানে, কৃষিকার্য জানে — যদিও সার দিতে শেখেনি জমিতে। আজ এখানে, কাল সেখানে পাহাড়ের বুকে আঁচড় কেটে দেখে কিছু হয় কি না। ‘পড়ু’-চাষ বা ‘দহি’-চাষ ওদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ বনে আগুন দেয়, মাইলের পর মাইল গাছপালা পুড়ে যায়। সেই পোড়া ছাইয়ের সারে জমি হয় উর্বর। চাষ করে তারপর। চাষের মরসুম শেষ হলেই এ গাঁয়ে ও গায়ে বাজে টোরি — মোষের শিঙের মতো দেখতে শিঙে। দু’দশ দিন অন্তর শোনা যায় মান্দ্রি-টোলের ডুগুডুগু। পৌষ মাসে বসে মাড়াই। টোল সহরত জানিয়ে দেয় কবে কোথায় মাড়াই বসছে। গুটিগুটি জমায়েত হয় প্রকৃতির কোলের মানুষগুলি — এ গ্রামে সে গ্রামে। বার্ষিক মেলা বসে। খেলা-ধুলা, খানা-পিনা, হৈ-হল্লার প্লাবন বয়ে যায়। আর নাচ তো আছেই। নাচ-গান বাদ দিয়ে সারা দণ্ডকারণ্যর যে কোন জায়গায় আদিবাসীদের আনন্দ উৎসবের অর্থ ডেনমার্কের রাজকুমার ছাড়া হ্যামলেট অভিনয়ের আয়োজন।

কোণ্ডাগাঁও থেকে নারানপুর হয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে আবুজমাড় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পারলকোট অঞ্চলে — সেই যেখানে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার উদ্বাস্ত উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, সে দিকে। ঐ নারানপুর থেকে বাঁহাতি একটা বন্য সড়ক চলে গেছে আবুজমাড় পাহাড়ের দিকে — পঙ্গম-সোনপুর হয়ে। কাঁচা রাস্তা, কাঠের সাঁকো, বুড়োর নড়বড়ে দাঁতের মতো। এ বছর প্রথম মাড়াই বসছে সেখানে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ সব এস্তাজাম করছেন। সাধারণতন্ত্র দিবসের অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচী — আদিবাসী অঞ্চলে।

জাহাজের কারবারী হলেও জংলী-জিঞ্জারের গন্ধে উন্মনা হয়ে উঠলাম। এ দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না। বাস্তারের সদর শহর জগদলপুর থেকে কোকামেটা গ্রাম প্রায় আশী মাইল। ‘বাস’ যায় না। কোন যানবাহন নেই। তবু ব্যবস্থা হল। বাস্তারের ডেপুটি ফালেক্টর সাহেব আমার আশ্রয় দেখে তাঁর জীপে আমাকে তুলে নিতে রাজি হলেন। বললেন : কষ্ট হবে আপনার, জীপে আমরা সাত-আটজন যাচ্ছি। তবু আপনি এদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে চান, আসুন আমার জীপে।

উৎসবের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে হাজির হলাম নারানপুরের ডাকবাঙলোয়। সভ্যজগতের শেষপ্রান্তে। এখান থেকেই আবুজমাড় পাহাড়ের দিকে কী-জানি-কোন-দিকে মোড় ঘুরে-ঘুরে বন্য সড়কটি রওনা হয়েছে কোকামেটার দিকে। নারানপুরে পৌঁছেই পেলাম সংবাদটা। হ্যাঁ, দুঃসংবাদ বইকি। দু’দিন আগে রাত্রে এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে। ফলে পথ কদমাক্ত— দু একটি সাঁকো গেছে ভেসে। এখানকার পাহাড়ের নদীগুলি সব কুস্তকর্ণের সহোদর। বছরে ছ-মাস ঘুমায়, ছ-মাস জাগে। বর্ষাগমে যেদিন তাদের প্রথম ঘুম ভাঙে সেদিন সমস্ত অরণ্য থরথর করে কাঁপতে থাকে ভয়ে। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে কুস্তকর্ণের অকালনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল, ফলে তখনই হয়ে গেছে বন্য সড়ক। সামলে উঠতে পারেনি এখনও। লরীতে করে নারানপুরের তহশীলদার মালপত্র পাঠিয়েছিলেন কোকামেটায়। সেটা কাদায় ফেঁসে পড়ে আছে। খবর এসেছে কোকামেটায় নাহক পাঁচ-ছ শ মাড়িয়া আদিবাসী জমায়েত হয়েছে। সরকারী টোল-সহরং শুনে ওরা দলে দলে নেমে এসেছে পাহাড় থেকে — কাল সকাল থেকে মাড়াই শুরু হবে। কোকামেটা গাঁয়ে দোকানপাট, খাদ্যদ্রব্যাদি কিছুই নেই। অত লোকের দিন-দুই তিনের রসদ পাঠানো হয়েছিল লরী করে। ওরা এ কয়দিন সরকারের অতিথি। চাল-ডাল-নুন-শুয়োর-পাঁঠা বোঝাই সেই রসদের লরীটাই ফেঁসে গেছে কাদার ‘দ’-য়ে। পথরোধ করে পড়ে আছে কাদায়-পড়া হাতির মতো। ‘দয়ে মজানো’ কথাটার এমন আক্ষরিক প্রয়োগ আগে কখনও দেখিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস্তার জেলার কালেক্টর সাহেব এসে গেলেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। চেনা লোকও দেখলাম একজন। সাংবাদিক ব্যানার্জিবাবু। স্থানীয় কর্মকর্তারা ভাবছিলেন অনুষ্ঠানটা বাতিল করার কথা — অথবা তারিখ পিছিয়ে দেওয়া — নেহাৎ না হলে স্থানটা পরিবর্তন করে এমন জায়গায় অনুষ্ঠানটা করা যেখানে এই বর্ষগশেষেও জীপে করে যাওয়া যায়। কিন্তু জেলা সমাহর্তা মশাই বেকে বসলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন : তা কিছুতেই হবে না। আমরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেড়া দিয়ে ওদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি — ওরা আমাদের নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছে। আমাদের যেমন করে হোক যেতেই হবে। ট্রাক না যায় গরুর গাড়ির খোঁজ কর — নেহাৎ না জোটে, আদি অকৃত্রিম মানুষের মাথা তো শাচ্ছেই। তাতেই মাল পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আর আমরা ? প্রয়োজন হয় আমরা হেঁটেই যাব।

বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক। শুনতে খুবই ভালো লাগলো। আতিথ্য-ধর্মের মর্যাদা রাখতে সভ্যজগতের মানুষের পক্ষে উপযুক্ত কথা। উনি যদি সে সময়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ফুট-লাইটের সামনে আর আমি বসে থাকতুম গদি-আঁটা চেয়ারে, তাহলে নিশ্চয় এই মওকায় এক দফা হাততালি দিয়ে নিতুম। কিন্তু হায়, উনি দাঁড়িয়ে আছেন নারানপুর ডাকবাঙলোর ধাপে আর আমি আছি আধগামবুট গভীর কাদায়। স্বভাবতই ঘাবড়ে গেলাম। ‘বোতামআঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান’ প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠল। দূরত্বটা এগারো মাইল, পথটা জঙ্গলাকীর্ণ শুধু নয়, কদম-পিচ্ছিল। আর সময়টা জানুয়ারির মধ্যরাত্রি।

কর্মকর্তারা তখনই উঠে পড়ে লাগলেন। অন্ধকারের মধ্যে ছোট্টাছুটি হাঁকাহাঁকি।

ডাকবাঙলোটা মহামান্য অতিথিতে ভরে গেছে। সাংবাদিক বন্ধু সমেত আশ্রয় নিলাম একটি ফরেস্ট রেস্টহাউসে। নীরঞ্জন অন্ধকার। বেতের চেয়ার পাতা আছে বারান্দায়, আর আশ্চর্য, তাতে ছারপোকা নেই! বাথরুমে বড় বড় বাথ-টব পাতা আছে, তাতে জল নেই। আর মাঝের হল-কামরায় প্রকাণ্ড ঝোলা লণ্ঠন আছে, বলাবাহুল্য তাতে কেরোসিন নাই। ঘনান্ধকারের মধ্যে মুখোমুখি বসলাম দুটি চেয়ারে। ব্যানার্জিবাবু যে সামনের কেদারাটায় বসে আছেন তার একমাত্র প্রমাণ ওঁর ঝলন্ত সিগারেটের আগুনটা। বারান্দার ও প্রান্তেও বসে আছেন আর একজন ভদ্রলোক—তাঁর অবস্থিতিটা বুঝতে পারছিলাম শব্দে। ভদ্রলোক জুতো থেকে অন্ধকারের মধ্যেই কাদা সাফ করছিলেন।

আলাপ করবার বাসনা ছিল। ব্যানার্জিবাবুকে সাদা বাঙলায় বললাম, ও পাশের ভদ্রলোকটি কে?

ব্যানার্জিবাবু বলেন, আপনিও যে তিমিরে আমিও সেই তিমিরে।

তা বটে। বললাম, যদি এখানেই আজ রাত কাটাতে হয়, তা হলে আলাপ করে রাখা ভালো। আপনি আর একটা সিগারেট ধরান দেখি— এক নজর ঠাউরে নিই, আলাপটা ইংরেজিতে করতে হবে, না হিন্দীতে।

দেশলাই জ্বালার প্রয়োজনই ছিল না। ও প্রান্ত থেকে গভীর কণ্ঠে উত্তর হল : আ-মরি বাঙলা ভাষাতেও করতে পারেন!

কী তাজ্জব! নারানপুরের এই ফরেস্ট রেস্ট-হাউসের বারান্দায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন একজন দেশওয়ালী ভাই? অ্যালিসের মতো বলতে ইচ্ছা হল, ‘কিউরিয়সার অ্যান্ড কিউরিয়সার!’ দণ্ডকারণ্য যেন সত্যই অ্যালিসদৃষ্ট ওয়ান্ডারল্যান্ড। এখানে সব কিছুই বোধ করি সম্ভব। স্থির করলাম, দণ্ডকারণ্যে অবাক হওয়ার অনুভূতিটাকে বাতিল করতে হবে। যা কিছু দেখব, শুনব — স্বাভাবিক বলে তাই মেনে নেব। অ্যালিস যেমন নিয়েছিল, ওয়ান্ডারল্যান্ডে।

প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হল কিন্তু পরমুহূর্তেই। ঘনিয়ে এসে বসলাম। আলাপও ঘনীভূত হল। আলাপই হল, পরিচয় হল না। মানে চাক্ষুষ পরিচয়। ভদ্রলোক ডাক্তার। সদ্য-পাস। দণ্ডকারণ্য সংস্থাতেই চাকরি করছেন— আছেন পারলকোটের মোবাইল মেডিক্যাল যুনিটে। আত্মপরিচয় দিলাম। আলাপ করিয়ে দিলাম ব্যানার্জিবাবুর সঙ্গে। ভদ্রলোকও নিজের নাম বললেন— আর তখনই অসতর্ক মুহূর্তে সদ্য-করা প্রতিজ্ঞাটা ভেঙে ফেললাম। ভদ্রলোকের নাম এম. রমানাথন পিল্লাই।

বললাম : এ ‘হ-য-ব-র-ল’র দেশে কোন কিছুতেই অবাক হব না ভেবেছিলাম— কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না। এমন চোস্ত বাঙলা শিখলেন কোথায়?

: কোথায় আবার? যেখানে আপনি শিখেছেন। বাঙলা দেশ।

রমানাথনের বাবা ছিলেন বিখ্যাত সার্জন। কলকাতার একটি ডাক্তারী কলেজে চাকরি করতেন। রমানাথন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। ডাক্তারিও পাস করেছেন কলকাতা থেকে। শুধু তাই নয় — একটি বাঙালী সহপাঠিনীকে বিবাহ করেছেন। বললেন : গোকুলপিঠে দিয়ে পরমান্ন অথবা কাসুন্দি দিয়ে লালশাক খাওয়ার ইচ্ছে হলে চলে

আসবেন পারলকোটে। আমি সেখানে ফ্যামিলি নিয়ে আছি।

বললাম, ইডলি-ডোসা-উপ্যার জন্য মন কেমন করে না?

রমানাথন হেসে বললেন, না। কারণ আমার মাও ছিলেন বাঙালীর মেয়ে। অথচ শর্মিলা সেটা বিশ্বাস করে না। মাদ্রাজী রান্না শিখেছে লোক রেখে। তাই তো বলছি, চলে আসুন পারলকোটে — তবু আপনাদের দেখে যদি দেশী রান্না রাঁধে শর্মিলা।

বললাম, যাব, নিশ্চয়ই যাব। আমাদের দৌলতে যদি আপনার গোকুলপিঠে জোটে— তা হলে বাধা দেব কেন?

ব্যানার্জিবাবু বললেন, একটা কথা। আমি সাংবাদিক, এসেছি সংবাদ সংগ্রহে। ইনি লেখক, এসেছেন কথাসাহিত্যের রসদের সন্ধানে, কিন্তু আপনি মশাই এতটা পথ উজিয়ে এলেন কেন? আর এলেনই বা কী করে?

রমানাথন বললেন, এসেছি একটা বন বিভাগের লরীর ড্রাইভারকে কিছু টাকা কবুল করে। আর এসেছি কেন? সেটা বলতে ভরসা হয় না। শুনে আপনারা হাসবেন।

বললাম, হাসব কেন? বলুন না।

পিল্লাই বললেন, ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে যায় যাত্রীর দল। আমি এসেছি মানবিকতার উৎস সন্ধানে।

বললাম, অস্যার্থ?

রমানাথনের উত্তরটা একটু দার্শনিকের মতো শোনালো। বললেন: মানবিকতার মোহানার দিকেই আজকের দুনিয়ার নজর। বাড়তে বাড়তে মানুষ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে দেখুন। রাশিয়া আর আমেরিকার বৈজ্ঞানিক আজ সেই মানবিকতার কাকদ্বীপ, আর এক পা এগুলেই সে অনাদি-অনন্তকে ছুঁয়ে ফেলবে। ল্যাবরেটরিতে যেদিন সে প্রাণ তৈরী করবে, সেদিনই সে পৌঁছাবে সাগরে — স্রষ্টার সঙ্গে তখন আর তার কোন ফারাক থাকবে না। আমরা সেদিকেই নজর ফিরিয়ে আছি শুধু। খবরের কাগজে নিত্য-নতুন সেই খবরটাই ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু এ গঙ্গার তো আরও একটা প্রান্ত আছে। সেটা কী? কমতে কমতে, সরু হতে হতে এই ভাগীরথীর উৎসমুখে নদীর কী রূপ? জলবিন্দু কখন নদী হল? বরফের চাঁই হল জলবিন্দু? মানব-সভ্যতার সে গোমুখ দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিকোবারে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে — আসতে হবে দণ্ডকারণ্যের এই নগণ্য গ্রাম কোকামেটায়। আমি তাই এসেছি।

মুগ্ধ হলাম ভদ্রলোকের আন্তরিকতায়। তবু বাজিয়ে নেবার জন্য বললাম, শুধুই চোখে দেখার তৃপ্তির জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করছেন?

: শুধু দেখা কেন? শিখতে এসেছি। বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে অনেক কিছুই, কেড়ে নিয়েছে বোধ করি তার চেয়েও বেশি। বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে মিলিয়ানে একজনকে করেছে মিলিওনেয়ার। বাকি মিলিয়ান-মাইনাস-ওয়ানকে ফেলেছে নানান অভাবের তাড়নায়। আমার ড্রাইভারটার একটা হাতঘড়ি নেই বলে সে দুঃখিত, যেমন আমি দুঃখিত একটা ফ্রিজিডিয়ার নেই বলে। আমাদের দেশে কোটিপতির যেমন মনোবেদনা বাড়িতে কালার্ড টেলিভিশন নেই বলে, বাড়ির ছাদের গ্যারেজে হেলিকপ্টার

নেই বলে। কাল যদি কোকামেটায় পৌঁছতে পারি দেখবেন ওদের কোনও অভাব নেই, আর তার ফলে অভাবজনিত হা-ছতাশও নেই। আনন্দের সন্ধানই যদি হয় মানব-জীবনের লক্ষ্য, তা হলে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে বলতে হবে। ওদের কাছে অনেক কিছু শিখবার আছে বইকি !

কথাটা মনে লাগলো। তবু তর্কের খাতিরে বললাম, কিন্তু ঐ অশিক্ষিত মানুষগুলোর কাছ থেকে জীবন-বেদের শিক্ষা নিতে আমাদের আত্মসম্মানে বাধবে না ? ওদের লিখিত বর্ণমালা নেই, ব্যাকরণ নেই। ওদের বক্তব্য ওরা বলবে কী করে ?

রমানাথন হেসে বললেন : এঞ্জিনিয়ার সাহেব, তা হলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। আপনি তো বাঙলা ভাষায় বই লেখেন। বলুন তো, আ-মরি বাঙলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ লেখেন কে ? আর কোন হরফে ?

স্বীকার করতে হল — এ গুট সংবাদ আমি রাখি না ! রমানাথন বললেন : বাঙলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ লেখেন একজন বিদেশী পোর্তুগীজ পাদ্রি, নাম মনোয়েল-দা-অ্যাসাম্পসাম্। বাঙলা ছাপা হরফ তখনও তৈরী হয়নি। বইটি ছাপা হয়েছিল 1743 খ্রিস্টাব্দে, লিসবন শহরে, রোমান হরফে ! আপনিও তেমনি এদের ভাষায় প্রথম বই লিখুন না বাঙলা হরফে — ছাপা হবে কলকাতায়। তারপর আজ থেকে দুশ বছর পরে পোর্তুগীজদের মতো যদি আমাদের উন্মাসিকতাকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারে দণ্ডকারণ্যের মানুষ, তখন লোকে বলবে ইনিই লিখেছিলেন আমাদের ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ।

বাধা পড়লো আলোচনায়। আসর ভাঙতে হল। কর্মকর্তাদের ক্ষমতা আছে বলতে হবে — শেষ পর্যন্ত ওঁরা আবিষ্কার করেছেন এমন একটি বন্য সড়ক যাতে জীপ চলবে। নৈশ আহার সেরে যখন নারানপুর থেকে রওনা হলাম রাত তখন বারোটা। প্রচণ্ড শীত। তেমনি দুরন্ত কুয়াশা। গাড়ির পাঁচ-সাত হাত সামনে কী আছে দেখা যায় না। শুধু আগের স্টেশন-ওয়াগনের ব্যাক-লাইটের এক জোড়া রক্তচক্ষু। দুধারে ঘন জঙ্গল — শাল, মছয়া, হরীতকী, বয়ড়া, নাম-না-জানা আরও কত হাজার রকম গাছ। চারিদিক অদ্ভুতভাবে স্তব্ধ, আর নীরঞ্জ অন্ধকারের মাঝখানে একজোড়া লালচোখ। খানাখন্দ ভেঙে জীপ যে কোথায় চলেছে কে জানে ? মাঝে মাঝে কাদায় পড়েছে চাকা, ফোর-হুইল গিয়ারটা বন্যজন্তুর মতো গোঁ-গোঁ করে গজরাচ্ছে মাঝে মাঝে। নেমে ঠেলতে হচ্ছে কিছুক্ষণ বাদে বাদে। নগর সংকীর্তনের ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে জীপের গর্ভে বসে কোথায় চলেছি আমরা ?

কিন্তু রাত্রিও যেমন নিশ্প্রভাত হয় না, যাত্রাও হয় না অন্তহীন। এক সময় জীপটা গর্জন করে থেমে গেল। কোকামেটায় এসে পৌঁছেছি শেষ পর্যন্ত। এগার মাইল পথ এসেছি পাক্কা দু'ঘণ্টায়, জীপে। নারানপুর থেকে যখন রওনা হই রিস্টওয়াচের কাঁটা দুটো তখন যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার করেছিল, এখন ছোট কাঁটাটা ক্রান্তিতে দুটোর ঘরে হেলে পড়েছে।

নামলাম। শুধু সাদা কুয়াশার নিশ্চিদ্র প্রাচীর। দূরে দূরে ঝলছে আগুন আর তারই আশেপাশে শীতল মানুষের জটলা। দূরের কিছুই নজরে পড়ে না। সবটাই কেমন

রহস্যঘন কুহেলিকাময়। দুই অথেই।

আর ঘণ্টা চার-পাঁচ কাটাতে পারলেই — আহ, কী আরাম, সূর্য উঠবে। ঝলমলে রোদ এসে লাগবে গায়ে! কর্মকর্তাদের একজন পাতায় ছাওয়া একটি কুটীর দেখিয়ে দিলেন। কী সৌভাগ্য! চারপাইও জুটে গেল একটা। একটা কেন দুটো। পিল্লাই সাহেব হলেন আমার কক্ষবন্ধু। ব্যানার্জিবাবুর ঠাঁই হল পাশের ছাপরায়। পোশাক বদলাবার প্রশ্নই ওঠে না। সব কটা গরম জামা, মায় ওভারকোট কক্ষাটার সমেত আশ্রয় নিলাম কক্ষলের গর্ভে।

ঘরের চালের পাতার ফাঁক দিয়ে সাদা আকাশ দেখা যায়। হ্যাঁ সাদাই। কুয়াশার চুনকামে আকাশ আজ তার নীলিমাকে হারিয়েছে নিঃশেষে। তারার দলও বোধ করি আমার মতো আজ রাতে কক্ষলের তলায়, উঁকি মারবার মতো মেজাজ নেই। হাড়ের মধ্যে ঠকঠকানি। ডাক্তারবাবু বলেন, কী মনে হয়, ঘুম হবে?

বললাম, ঘুম হবেকি নাজানি না, তবে নিমুনিয়া যে হবে এটা নিশ্চয়। আপনার?

—নিমুনিয়া হবে কি না জানি না, তবে রাত যে ভোর হবে এটা অবধারিত।

ভরসা পেলাম শুনে। না, রাত একসময় ভোর হবে এই অদ্ভুত বার্তা শুনে নয়, চরম দুঃসময়েও আশার কথা শোনার মতো একজন সাথী এ যাত্রায় সঙ্গে আছেন একথা জেনে।

পরদিন ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে। আলোর আভাস সবে ফুটতে শুরু করেছে। বেরিয়ে এলাম ছাপরা থেকে। কী আশ্চর্য, আমাদের কুটীরের সামনে মাটির হাঁড়িতে ফুটন্ত গরম জল। যারা এটা রেখে গেছে তারা কি নিশাচর? সরকারী ব্যবস্থাপনা যে জীবনে কখনও দেখিনি তাও তো নয়। মধ্যপ্রদেশ সরকারী কর্মচারীরা কি মঙ্গলগ্রহের জীব?

মুখহাত ধুয়ে নিতেই গরম এক পেয়ালা চা। ধন্যবাদ!

ঠিক আটটার সময় জেলা-শাসক উৎসবের উদ্বোধন করলেন। কুয়াশাটা কেটে গেছে। রোদ উঠেছে ঝলমলে। চারিদিকেই নীল-সবুজ পাহাড়। মাঝখানে একটা সমতলভূমি। লম্বায় আধ মাইল, চওড়ায় আধ ফার্লং। ছাপ্পান্নটি গ্রাম থেকে এসেছে ৫৪৫ জন মানুষ — রমানাথনের ভাষায় যারা নাকি মানবিকতার উৎসমুখের বাসিন্দা। সমতলভূমির মাঝখানে একটা পাথর, তিনিই কোকামেটার অধিদেবতা। জানি না তিনি ভীমুল পেন, বড়াদেও না তাল্লুর-মুটাই! পাথরের পাশেই ফ্ল্যাগ স্টাফ। জাতীয় পতাকা রয়েছে গোটানো। জেলা সমাহর্তা মশাই তুলবেন এবার। গোল হয়ে বসেছে আদিবাসীরা। নিশ্চুপ। একটি টু শব্দ নেই কারও মুখে। পাহাড়ের মাথায় অদ্ভুতদর্শন সব পার্টিংস্টোন। পাহাড়ের তলায় গোল-হয়ে-বসা আদিবাসীদের নিশ্চল মূর্তিগুলো দেখে মনে হচ্ছিল — ওরাও যেন আবুজমাড় পাহাড়ের এক একটা পাথর। লক্ষ্য করে দেখলাম ওদের। এই দুরন্ত শীতে মানুষগুলি নেংটিসার। পিঠে তুণ, গলায় মালা, মাথায় পালক অথবা বুনোশূয়োরের জোড়াদন্ত-শোভিত অদ্ভুতদর্শন শিরস্ত্রাণ। মেয়েদের কটিদেশ থেকে জানু পর্যন্ত একটা আচ্ছাদন। উর্ধ্বাঙ্গে পুঁতির মালা আর উষ্ণির নকশা। নানা বয়সের শ'তিনেক মেয়ে বসে আছে সারি সারি হাঁটু গেড়ে।

ওদের পায়ে বিহারী মেয়েদের মতো ভারী মল, কানে গলায় হাতে অসংখ্য অলঙ্কার। খোঁপায় গোঁজা ফুল আর কড়ির মালা। আবরণের চেয়ে আভরণের দিকেই মাড়িয়া জনপদবধুর নজরটা বেশী।

মনে পড়ল কলকাতার কথা। বোনদের নিয়ে, মাকে নিয়ে হিন্দী অথবা ইংরেজি সিনেমা দেখতে গিয়ে বিব্রত বোধ করেছি কোন কোন দৃশ্যে। হলিউড অথবা হিন্দী সিনেমার নর্তকীর কাঁচুলি তৈরী করতে যতখানি কাপড় লাগে এদের মেয়েরা বোধকরি এক একজন তার চেয়ে বেশী কাপড় ব্যবহার করেনি সারা দেহ ঢাকতে। তবু আমি হলপ করে বলতে পারি, সপরিবারেও যদি মাড়াই দেখতে যেতুম তাহলে অস্বস্তিবোধ করতুম না। মনে হল এরা শুধু অনাবৃত্তা — সিনেমা-নর্তকীর মতো নগ্নিকা নয়!

মাড়িয়া দলপতি কী একটা অদ্ভুত শব্দ করতেই চমকে উঠলাম। দেখি ওরা সবাই নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো। ব্যাপার কী? ডাক্তার পিল্লাই ছিলেন পাশেই, আমার কাঁধটা ধরে রাইট অ্যাবাউট টার্ন করিয়ে দিলেন। এদিকে ফিরতেই নজরে পড়ল পতাকাদণ্ড বেয়ে জাতীয় পতাকা উঠছে উপরে। ঝরে পড়ছে ফুল। রোদ-ঝলমল নীল আকাশে ভারতের জাতীয় পতাকা পতপত করে উড়ছে। জন-গণ-মন সঙ্গীত শুরু হল সমবেত কণ্ঠে। ওরা যোগ দিল না বটে কিন্তু বিয়োগও দিল না। জাতীয় সঙ্গীত ওরা জানে না — বোধহয় জীবনে প্রথম শুনছে, কিন্তু তাকে সম্মান দিতে জানে। দলপতির নির্দেশে ধনুক হাতে নগ্নকায় নরনারীর দল দাঁড়িয়ে রইল খাড়া। মানব-সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি উদাসীন ঐ যে অভভেদী আবুজমাড় পাহাড়, ওরা তারই পাঁচশত অসভ্য মাড়িয়া সন্তান!

অসভ্য? সভ্যতার সংজ্ঞা কী? এই যে এতগুলি মানুষ দলপতির অঙ্গুলি সংকেতে গোল হয়ে বসল, গোল করল না, দলনেতার নির্দেশে উঠে দাঁড়ালো জাতীয় সঙ্গীত শুনে, অবোধ্য সংস্কৃত গীতাপাঠের সময় একবার গা-চুলকালো না, পার্শ্ববর্তীকে ফিসফিস করে একটা কথা বলল না, এরা অসভ্য? সুসভ্য কারা? যারা একমিনিট সাইলেন্স অবজার্ভ করতে হলে দুবার আড়চোখে ঘড়ি দেখে, তিনবার হাই তোলে?

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে জগদলপুরের দশেরা উৎসবের কথা। বাস্তবের সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। বহুদূরের গ্রাম থেকে আদিবাসীরা দলে দলে এসে সমবেত হয়। আবুজ-মাড়িয়ারা অবশ্য বিশেষ আসে না — কিন্তু সমতলের মাড়িয়া, মুরিয়া, ভাত্রা, পরজা, কয়া, হালবার দল আসে কাতারে কাতারে। নিজ নিজ পরিবারগত দেবতার মূর্তি নিয়ে আসে মিছিল করে। কাঠের চৌদোলার মতো অঙ্গদেও, পাটদেও, কুরুংতুল্লা, তাল্লুর-মুটাই, ভীমুলপেন, বড়াদেও। দত্তেশ্বরী-মাতার দেবছত্রটিকে পূজারীরা বয়ে নিয়ে আসে জগদলপুরে। শহরের প্রান্তে রাজা স্বয়ং এসে ছত্রটিকে আমন্ত্রণ করে নেন — নিজে কাঁধ দিয়ে নিয়ে আসেন বাকি পথটুকু। বছরে এই একটি দিন রাজা নামেন পথের ধুলোয়, নগ্নপদে প্রজার সঙ্গে হাতে-হাত কাঁধে-কাঁধ দেন — প্রমাণ হয়ে যায় রাজার-রাজার কাছে পার্থিব রাজা-প্রজায় কোন ভেদ নেই। তারপর দত্তেশ্বরীমাতার ছত্রটিকে নিয়ে রাজা উঠে বসেন একটা কাঠের রথে। প্রায় মাহেশের রথের আকারের রথ। আদিবাসীরা সেটাকে টেনে নিয়ে যায় রাজপথ দিয়ে। সেই

উৎসব দেখতেই গিয়েছিলাম। রাজবাড়ির সামনে রাস্তাটা যেখানে বাজারের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে সেখানে একটি সমকোণ অতিক্রম করতে হবে রথকে, আর ঠিক কোনার মাথায় অস্থায়ী ছাপরা তুলে দোকান খুলে বসেছে কারা যেন। রথ এত বিরাটাকার আর রাস্তা এত সরু যে, সেই ফাঁকের মধ্যে রথ আদৌ ঢুকবে কি না সন্দেহ ছিল আমার। আন্দাজ একলক্ষ লোক ছিল পথে, নিদেন শ'দুয়েক লোক টানছে রথের রশি। বললে বিশ্বাস করবেন না, — একটি মাত্র লোক নির্দেশ দিল রথের পাটাতনের উপর চড়ে — আর অনায়াস ভঙ্গিতে রথ এক-পা-এগিয়ে দু-পা-পিছিয়ে তিন-পা এগিয়ে এক-পা পিছিয়ে ঢুকে গেল সেই সঙ্কীর্ণ গলিপথে। দলপতির নির্দেশ একশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম—এক লক্ষ লোকের জনতা এত নিস্তব্ধ ছিল! আর জনতার মধ্যে না হোক বাচ্চাই ছিল কয়েক হাজার। সেদিন মনে হয়েছিল, সেবারকার পূর্ণকুন্ডে যদি সুসভ্য তীর্থযাত্রীর বদলে অসভ্য দণ্ডকবাসীরা যেত প্রয়াগ স্নানে, তাহলে হয়তো ঐতিহাসিক ‘স্টাম্পিড্’ এড়িয়ে যেতে পারতাম আমরা। জানি না, এ শিক্ষা ওরা পেল কেমন করে!

কোথায় পেল জানি না, কিন্তু সারাটা দিন দেখলাম — কী চমৎকার সুশৃঙ্খল ওদের চলাফেরা কাজকর্ম। সব কিছুই যেন ওরা বলিষ্ঠ নাচের ভঙ্গিতে করে, সব কাজেই ফেলে তালে তালে পা। পতাকা উত্তোলনের পর খেলাধুলা শুরু হল। প্রত্যেক জাতেরই আছে নিজস্ব জাতীয় খেলা! ইংলন্ডে যেমন ক্রিকেট, আমেরিকায় বেসবল। আমাদের যেমন নিজস্ব খেলা ছিল কাবাডি কিংবা দাড়িয়াবান্দা। ওদেরও তেমনি নিজস্ব খেলাধুলা আছে অনেক। খেলাকে ওরা বলে ‘কারসানা’। ভারি মজার খেলা সেগুলি। ‘ওয়ানজিং কারসানা’ হচ্ছে চাষ-খেলা, ‘মিন কারসানা’ অনেকটা আমাদের চোখ বেঁধে আনিমানিজানিনে জাতীয়। সবচেয়ে মজা ‘কোর-কারসানায়’। ছেলেদের মিলিত দল প্রথমে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তারপর এ দলের একটি মেয়েকে ওরা চাদর দিয়ে মুড়ে দেয়। ওদের ছেলেরা এসে চাদরের উপর দিকে হাত বুলিয়ে অনুভব করে মেয়েটি কে। যদি ঠিক বলতে পারে, তাহলে তাদের এক পয়েন্ট। চাদরের উপর দিয়ে হাত দেবার সময় কাতুকুতু দিলেও আপত্তি করা চলবে না। মেয়েটি প্রাণপণে হাসি চেপে থাকে, কারণ শুনলাম প্রত্যেক মানুষের হাসির শব্দ শুনে নাকি চিনে ফেলা যায়। শুনে অবাক হয়েছিলাম। প্রত্যেকের হাসির শব্দ কি বিভিন্ন রকমের? হবেও বা। আমরা হাসিই ভুলেছি তা হাসি-বিচার করব কী করে? ওদের কাছে হাসির আমি, হাসির তুমি, তাই দিয়ে চেনা। তা সে যাই হোক, এখানে ওরা কিন্তু ওদের জাতীয় খেলাগুলি খেলল না। সরকারী বন্দোবস্তে যে স্পোর্টস-এর আয়োজন করা হয়েছিল, তা ওদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন! প্রতিটি আইটেমের আগে ট্রাইবাল-ওয়েলফেয়ার অফিসার গুপ্তেজী খেলার আইনকানুনগুলি বাতলে দেন। ওদের দলপতি হয় তার মল্লিনাথ! টিকা-টিপ্পনী সমেত আর একবার বুঝিয়ে দেয় খেলার নিয়ম। ঘন ঘন মাথা নেড়ে ওরা বলে — বুঝেছে।

যে কথা বলছিলাম। সারাটা দিনই দেখলাম — কী চমৎকার সুশৃঙ্খল ওদের চলাফেরা, কাজকর্ম, খেলার মধ্যেও দেখলাম সেই আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতা। মাইকের

সামনে কেউ গিয়ে বিরক্তিকর পরীক্ষাকার্য চালানো না — ‘ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর, হ্যালো, ওয়ান...টু...থ্রি হ্যালো, হ্যালো...ওয়ান...শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো ওয়ান-টু!’ কেউ কর্কশস্বরে প্রতিযোগীর নাম্বার হাঁকলো না বারে বারে — কেউ মাইকের সামনে গিয়ে রাসভ-বিনিন্দিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল না — ‘আপনারা অযথা মাঠের মধ্যে ভিড় করবেন না—ট্র্যাকের উপর থেকে আপনারা দয়া করে সরে আসুন।’ অথচ হিট হল, ফাইনাল হল। প্যাটেল অথবা গাইতার অঙ্গুলি-হেলনই ওদের পক্ষে যথেষ্ট।

আমরা চেয়ারে বসে দেখছিলাম। সভ্য দুনিয়া থেকে ট্রাক বোঝাই হয়ে সেগুলি আনা হয়েছিল, যাতে আমাদের প্যাণ্টে কোকামেটার ধুলো না লাগে। আমাদের সামনে একবারও কেউ উঠে দাঁড়িয়ে আড়াল করল না। বুঝলাম মানবদেহের সম্বন্ধে মাড়িয়াদের ধারণাটা অন্য রকম। সভ্য-জগতে এ জাতীয় জমায়েতে দেখেছি মানুষ-মাত্রেরই মনে করে তার দেহ স্বচ্ছ — পিছনের লোকের দেখতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এদের ধারণা এরা ‘ওপেক’। তাই আমাদের চেয়ারের সামনে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে যারা দাঁড়াতে চায়, দেখলাম তারা নিঃশব্দে পিছনে গিয়ে সারি দিল!

স্পোর্টস-ইভেন্টস-এর মধ্যে তিনটি কর্মসূচী আমার ভালো লাগলো। মেয়েদের কলসী-দৌড়, ছেলেদের তীর-ছোঁড়া আর বিড়ি ধরানোর প্রতিযোগিতা। শেষোক্ত বিষয়টির অলিম্পিক রেকর্ড নেই — তাই কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন! আবুজমাড়িয়ারা দেশলাই চেনে না। অবশ্য তারা কেউ কেউ কখনও-সখনও পঞ্চম-সোনপুর-নারানপুরে গিয়েছে! ফলে এরা যে দেশলাই একেবারে না চেনে তা নয়, তবে ব্যবহার করে না। দুনিয়াতে এত কাঠ থাকতে কে মশাই দেশলাই বয়ে বেড়াবার হাঙ্গামা পোহায়! আর তাছাড়া দেশলাইয়ের নামই কি কম? একটা দেশলাইয়ের বদলে হয়তো দু-শোলি (আন্দাজ এক সের) ধানই চেয়ে বসবে হাটের ব্যাপারী। ওরা আজও অরনিকাঠের সাহায্যে আগুন জ্বালে। প্রতিযোগিতাটা তারই। ছইসিল পড়লেই ওরা কাঠে কাঠে ঘষতে থাকে! যে আগুন জ্বলে বিচারকের মুখের উপর প্রথম বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে পারবে সেই জয়ী।

রাজশেখরবাবুর ‘চলন্তিকার’ বাইরে অরনিকাঠ কখনও দেখিনি। ব্যাপারটা গিয়ে দেখলাম। কোন বিশেষ জাতের কাঠ নয়, শ্রেফ বাঁশ। বাঁশ মানুষকে নানাভাবে জ্বালায়, একথা জানতাম, কিন্তু বাঁশ যে নিজেও এভাবে জ্বলে তা জানতাম না। চেড়া বা আধলা বাঁশ একখণ্ড রাখে মাটিতে, চেপে ধরে দুজনে দুদিন থেকে পা দিয়ে। অপর কঞ্চিখানি দুজনে দুদিকে ধরে ঘষতে থাকে। নিচে থাকে একখণ্ড পলতের আকারের ন্যাকড়া। স্টপ-ওয়াচ ছিল। কোকামেটা অলিম্পিকে রেকর্ড হল সাতচল্লিশ সেকেন্ড!

দ্বিতীয়ত, কলসী দৌড়। সর্বসমেত চব্বিশজন প্রতিযোগী। বাচ্চা নয়, কিশোরী, যুবতীর দল। এক একবারে ছয়জন দৌড়ালো। চারবার হিট, একবার ফাইনাল। ব্যাপারটা কী, এবং প্রতিযোগিতার আইনকানুন বুঝিয়ে দিল প্রথমে ওদের প্যাটেল। তারপর ছইসিল পড়তেই ছুট-ছুট-ছুট। খুলে গেল চুল, দুলতে লাগলো অনাবৃত বুকের উপর কড়ির মালা — উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে ওরা। সবচেয়ে মজা, ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারায় যখন জলভরা কলসী উল্টে পড়ল, তখন স্থূল-কলেজের মেয়েদের মতো

মুখ কাঁচুমাচু করল না মোটেই। লজ্জিত হল না একটুও। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল নিজের অসাফল্যে। খেলাকে ওরা খেলা বলেই মেনে নিল।

তৃতীয়ত, তীর-ছোঁড়া। সেটা দেখে মনে হল — কোকামেটা জঙ্গলে নয়, শেরউড ফরেস্টে এসে পড়েছি বুঝি। বুল্‌স্-আই ভেদ করল মাত্র তিনজন — কিন্তু জনাপঞ্চাশেক তার এক-দেড় ইঞ্চি ঘেঁষে সাদায় লাগালো। ওদের তীর-ছোঁড়া দেখে মনে হল — লক্ষ্য যদি হয় একটা হরিণ, আর তা থাকে রেঞ্জের ভিতর তাহলে শতকরা নব্বইজনই জানোয়ারটাকে বাড়ি আনতে পারবে। এই একটা আইটেমেই দু'শর উপর প্রতিযোগী। শেষ হতে বেলা দুপুর। এ আইটেমে প্রতিযোগীর সংখ্যাধিক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তীর ছোঁড়ার কায়দা শুধু পেটের দায়েই নয় — প্রাণের দায়ে শিখতে হয় মাড়িয়া যুবককে। কোন মেয়ের দিকে পুষ্পশর ছোঁড়ার আগে ছোঁড়াগুলিকে ছুঁড়তে শিখতে হয় সত্যিকারের তীর।

তীর-ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। ক্রীড়াঙ্গনের পশ্চিমপ্রান্তে তাঁবু খাটিয়ে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে একটা জটলা। ব্যাপারটা কী? কাছে গিয়ে দেখি, র্যাশন বিতরণ হচ্ছে। শামিয়ানা খাটিয়ে মধ্যপ্রদেশ সরকারের তরফে একজন কর্মচারী মাড়িয়াদের চাল-ডাল মেপে দিচ্ছেন। র্যাশন কার্ড নেই, র্যাশন ব্যাগ নেই, নেই দাঁড়িপাল্লা। কর্মচারী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছেন, কজন লোক?

সামনে দাঁড়ানো লোকটা জবাব দিচ্ছে। পিছনে স্তূপাকৃতি চাল, ডাল ও লবণ। ওরা ওজন বোঝে না, মাপে আয়তনে। বিভিন্ন মাপের ঘট আছে। মাথাপিছু দেওয়া হচ্ছে এক শোলি চাল। প্রায় চল্লিশ তোলা বা আধসের। ওদের হাপুরবাজারে মাপের হিসাবটা হচ্ছে শোলি-পাইলি-খণ্ডিতে। এক খণ্ডি প্রায় দু মণ। চল্লিশ পাইলিতে এক খণ্ডি, চার শোলিতে এক পাইলি।

রসদটা কেউ নিচ্ছে কোঁচড়ে, কেউ পাগড়িতে বেঁধে, কেউ বা লতাপাতায় বোনা টুকরিতে। মিনিট-দশেক দাঁড়িয়ে দেখলাম। কিউ দিয়ে ওরা দাঁড়ায়নি, কিন্তু কী জানি কী অমোঘ আইনে ওরা পর পর এখান থেকে ওখান থেকে একের পর একজন এগিয়ে এল। অফিসগামী বাসের একটি সিট খালি হলে আমরা যে কায়দায় সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে আড়াল করে নিগমনকারীর পথ করে দেই — যাতে শূন্য আসনে আর কারও প্রবেশাধিকার না থাকে — সেই চারুকলাটা ওরা অভ্যস্ত করতে পারেনি দেখলাম। যে দশ-মিনিট ছিলাম, তার মধ্যে কোন হট্টগোল হৈ-চৈ দেখলাম না।

যে ভদ্রলোক র্যাশন দিচ্ছিলেন, তাঁকে বললাম, ঐ যে লোকটিকে পাঁচজনের র্যাশন দিলেন ওর সংসারে ঠিক পাঁচজনই যে আছে তা কেমন করে জানলেন?

ভদ্রলোক ট্রাইবাল-ওয়েলফেয়ার বিভাগের কর্মচারী। মধ্যপ্রদেশের লোক। বিস্মিত হয়ে বললেন, বা রে। ওই তো বললো পাঁচজন!

বিস্মিত হবার পালা আমারও। এ ভদ্রলোক কি আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে করতে সভ্যজগতের আদবকায়দা, রীতিনীতি ভুলে গেছেন? বললাম, মিথ্যা কথাও তো বলে থাকতে পারে। হয়তো ও একাই এসেছে মাড়াইয়ে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, না স্যার। এরা এখনও ভারি অসভ্য। অক্ষশাস্ত্রে ভারি কাঁচা। একা এলে কিছুতেই মনে করতে পারত না র্যাশন নেবার সময় ওর পরিবারের লোকসংখ্যাকে কল্পনা করতে হবে পাঁচ।

বটেই তো ! ন্যায়রত্নমশাইকেও কলু এ জবাবই দিয়েছিল। ন্যায়রত্নমশাই যজমান কলুর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছেন। দেখলেন, কলুর ঘানিঘরে চোখ বাঁধা গরুটা ঘুরছে ক্রমাগত, আর তার গলায় বাঁধা ঘণ্টায় অনবরত উঠছে রুনুঝু আওয়াজ। ন্যায়রত্ন বললেন, হ্যাঁরে ওর গলায় আবার একটা ঘণ্টা বেঁধেছিস কেন ?

কলু বললে, আজ্ঞে দ্যাবতা, ওতে কাজের বড় সুবিধা হয়। গরু থামলেই ঘণ্টার আওয়াজ থাকে। আমি যেখানেই থাকি বুঝতে পারি গরু থেমেছেন। অমনি গিয়ে ন্যাজমলা দেই।

ন্যায়সঙ্গত কথা। ন্যায়রত্ন প্রণিধান করলেন যুক্তির সারবত্তা, কিন্তু তখনই মনে আগল প্রতিপ্রশ্ন : কিন্তু ধর তোর গরু যদি একজায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু মাথা নাড়তে থাকে ?

কলু একটু ভাবনায় পড়ল। তারপর বলল : আজ্ঞে দ্যাবতা, আমার গরু তো আপনার মতো ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি। এ বুদ্ধি ওর মাথাতে আসে না !



“মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু
কথা আর নাহি,
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি —”

এ অসভ্য মাড়িয়াগুলো কলুর চোখ-বাঁধা গরুর মতো। কল্পনার এতটুকু প্রসার নেই। একা এলে কিছুতেই মনে করতে পারে না পাঁচজন এসেছে। কী অশিক্ষিত !

দুপুরে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম। আমরা পংক্তিভোজনে বসলাম গোল হয়ে।

অফিসার আর আগন্তকের দল। অর্থাৎ সভ্য জগতের আমরা কজন। না, ইঁদুর-সেদ্ধ,

কন্দমূল, লাগু আর ওল্‌সির ঝোল নয়। রান্না করেছিল সভ্যজগত থেকে আমদানি করা দোবেজি-তেওয়ারীর দল। কিন্তু পরিবেশন করতে এগিয়ে এল আদিবাসী মেয়েরা। সে এক ভারি মজা। লুটির ঝুড়ি হাতে সামনে এসে দাঁড়ায় — জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকায়। ভাবখানা—কটা লুচি দেব? আমাদের অবস্থা তখন ‘মুখে তার চাহি, কথা বলিবারে গেনু, — কথা আর নাহি। সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।’ কিন্তু ভাষা না জানলে কী হবে, হস্তসঞ্চালনের প্রক্রিয়াটা আদি এবং অকৃত্রিম। ‘এক দুই’ ওদের সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে কী অভিধা বহন করে জানি না, কিন্তু তার চেয়ে তর্জনী-মধ্যমার ব্যঞ্জনা আরও প্রাঞ্জল। আর উপরোধে আরও দু-একখানা লুচি পাতে চাপিয়ে দেবার ওদের প্রচেষ্টাও প্রাণ-জল। কিন্তু উপরোধে তো সত্যিই টেকি গেলা যায় না, এক সময়ে পেট যখন একেবারে ভরে এল তখন আমরা যে মুদ্রাটা করলাম তারও অর্থ ওরা বুঝে নিল ঠিকঠিক — ‘ন দদ্যাৎ ব্যাঘ্রবাম্পনে’ উদ্ভটশ্লোক না জানলেও।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমাদের অল্পরস মাধুর্যে রূপান্তরিত হবার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ চাটনির পর মিষ্টান্ন আসে-আসে, এমন সময় মাঠের মাঝখান থেকে ভেসে এল ডুগুডুগু-ডুগুডুগু। আর যায় কোথা! শরৎচন্দ্র বহুবার বলেছেন পরিবেশন করে অভুক্ত পুরুষমানুষকে খাওয়াতে পেলেন মেয়েরা নাকি আর কিছু চায় না। বোধ করি তিনি মাড়িয়া-গোণ্ড কোন মহিলার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেননি। রইল পড়ে চাটনির সস্প্যান, মিষ্টান্নের থালা — ওরা পড়ি-তো-মরি ছুট লাগালো মাঠ পানে! মাদ্রি ঢোল বাজছে। নাচ শুরু হয়ে গেছে। ‘পুরানো সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূরে’ — আর রক্ষে আছে?

বিকালবেলায় নাচ, নাচ আর নাচ। ছেলেরা মাজায় বাঁধল ঘণ্টা! নিতম্বের উপর। মাথায় চাপালো পগ্গ, গলায় দিল মালা। কেউ কেউ পাগড়ির উপর গুঁজে দিল শিখিপুচ্ছ, কেউবা চাপালো ছোট হাত-আয়না। কিন্তু কই মেয়েরা তো মোটেই সাজল না? যেমন ছিল তেমনিই নেমে পড়ল মাঠে।

একটা থিয়োরি খাড়া করলুম মনে মনে। প্রকৃতিতে দেখি যত সাজ সব পুরুষের। মেয়েদের সাজের প্রয়োজন নেই। কোকিলের কুছ, ময়ূরের পেখম, সিংহের কেশর, মোরগের ঝুঁটি। কিন্তু কোকিলা-ময়ূরী-সিংহী-মুরগীর কোন কিছু চাই না। তারা জানে অলকে কুসুম না দিলেও রূপ-মুগ্ধ পুরুষ ছুটে আসবে তার কাছে। পুরুষকে কাছে টানবার আকর্ষণীশক্তি ওদের ঈশ্বরদত্ত ধন। এই মাড়িয়ারা আছে মাটির কাছাকাছি — প্রকৃতি ওদের সৎমা নয় আমাদের মত। তাই ওদের মেয়েদের কৃত্রিম মেকআপের প্রয়োজন হয় না। সহজাত কবচ-কুণ্ডলের যে অধিকারী সে কেন ছুটেবে স্যাকরার দোকানে মান্তাশা আর কানপাশার খোঁজে? আমরা প্রকৃতির সন্তান নই — সভ্যতার সন্তান। মন তার স্বতঃস্ফূর্ত যে লালিমাকে হারিয়েছে আমাদের মেয়েরা তা পূরণ করতে চায় আলতায়-সিঁদুরে, আধুনিকা হলে লিপস্টিক-ম্যানিকিওরিঙে। হৃদয় তার সহজাত শুভ্রতাকে হারিয়েছে — তাই সে অভাবপূরণ করবার জন্যে স্নো-পাউডার আর হোয়াইটেব্লের আয়োজন। ওদের শুভ্রতা হাসিতে, লালিমা প্রাণোচ্ছল নৃত্যরসে। ওদের নিরাবরণ তনুদেহের কোন অংশ তাই অলীলভাবে আভারলাইন করা নয়

কৃত্রিম উপায়ে। ওদের তা প্রয়োজন হয় না।

মাড়িয়া গোণ্ড নাচের মধ্যে বৈচিত্র্য নেই কিছু। একই সুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা একই নাচ নেচে চলে। এ নাচের নাম, ‘পাটা এণ্ডানা’! নৃত্যাংশের চেয়ে সঙ্গীতাংশেই ওরা জোর দেয় বেশি — আর সে গানও একটানা বিলাপের সুর যেন। ফিরে ফিরে একই ধুয়োয় কে যেন দীর্ঘ বিলাপ করছে। মাঝখানে তিনটি ছেলে কাঁধ ধরাধরি করে মূল ধুয়োটা ধরে রাখে — ঠিক তাদের পিছনেই তিনটি মেয়ে। আর বাদবাকি ছেলেমেয়েদের দল সারি বেঁধে নাচে ওদের সামনে অথবা পিছনে। কখনও বা চারিদিকে ঘিরে। গোল হয়ে নয় কিন্তু — খুব লম্বাটে একটা উপবৃত্তের আকারে। ক্ষেত্র-বিশেষে গানের মূল গায়ক-গায়িকা দুটি বা তিনটি দলে ভাগ হয়ে যায়। তাদের বলে ‘পাটা ডাটা’। সাজ-পোশাকটাও তাদের জবর। অনেকটা যেন যাত্রাদলের সেপাই। ছেলেদের সকলেরই মাজায় বাঁধা অসংখ্য ঘণ্টা। প্রতি পদক্ষেপে বুন্-বুন্ করে বাজে। পাটা ডাটা দলের কেউ কেউ আবার সাজের বাহার দেখাতে কাঁধে তুলে নিয়েছে একখানা করে ছাতা। পাতায় বোনা ছাতা নয় — ন্যায্য বাঁশের বাঁট, লোহার শিক, কালো কাপড়ের ছাতা। নিঃসন্দেহে শহর বাজার অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে সেগুলি। বর্ষার হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে ওরা ব্যবহার করে পাতায় বোনা একটি বিরাটাকার কুলোর মত জিনিস; সেটা পিঠে বাঁধে। তাকে বলে রেরাইনো। শীতাতপ থেকে বাঁচবার জন্য ওদের কেউ কখনও ছাতার ব্যবহার করে না। ছাতা শুধু নৃত্যের সরঞ্জাম। গান বাড়ছে ক্রমশ — ছাতার প্রয়োজন নাচের আসরে, বাঁশের প্রয়োজন বিড়ি ঘরাতে।

একদল নাচে আর অন্যদল গোল হয়ে ঘিরে বসে দেখে। হাটে একটি মাত্র দোকান দেখলাম। অস্থায়ী দোকান। মেলার জন্যে খুলেছে। সেখান থেকে কয়েক প্যাকেট সস্তা সিগারেট কেনা গেল। সাংবাদিক ব্যানার্জিবাবু এবং আমার উপর ভার দেওয়া হল সেগুলি বিতরণের। এই ভালো। কর্মকর্তাদের কোন উপকারেই তো লাগছি না। অন্তত এই ছোট কাজটাই করি। প্রত্যেককে একটি করে সিগারেট দিয়ে লাইটার খেলে ধরিয়ে দিচ্ছি। তাড়া-হুড়া নেই — পর পর ওরা হাত বাড়চ্ছে। সপ্তম কি অষ্টম গ্রহীতার পর বনে আছে কয়েকটি মেয়ে। আমি থমকে পড়ি! ভিতরে ভিতরে খেমে উঠি আমি!

এখানে একটু ব্যক্তিগত কথা বলতে হয়। স্ত্রীলোক আর সিগারেট ও দুটি জিনিস একত্র হলেই লক্ষ্য করেছি আমি কেমন যেন সব গুলিয়ে ফেলি। একবার একজন সদ্যপরিচিত মহিলার সঙ্গে একান্তে প্রথম আলাপের অবকাশে ধূমপানের নেশা চাপায় আমি তাঁর অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি মুখ লুকিয়ে হেসেছিলেন শুধু। আর একবার একটি স্বল্প-পরিচিত মহিলার সঙ্গে আলাপচারির অবকাশে তাঁর বিনা অনুমতিতেই সিগারেট ধরিয়েছিলাম বলে শুনেছি তিনি অফেন্স নিয়েছিলেন। পরে জানতে পারি তিনি আমার চেয়ে বয়সে অল্প বড় এবং সম্পর্কে নাকি আমার মাসিমা হন! কিন্তু সেখানেই আমার দুর্দশার শেষ নয়। তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটেছিল আর একটি উনার পার্টিতে। সদ্য পরিচিত একটি পাঞ্জাবী দম্পতির সঙ্গে বসেছিলাম এক টেবিলে।

ভদ্রলোককে সিগারেট অফার করে আমি যখন সিগারেট কেসটি পকেটজাত করেছি তখন ভদ্রমহিলা তাঁর ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে বার করলেন একটি ঝকঝকে সোনার সিগারেট কেস। লিপস্টিক রঞ্জিত বিম্বাধরে সিগারেটটাকে বসিয়ে তাতে আগুন দিলেন। সিগারেট নয়, পুড়তে লাগলাম আমিই — অনুশোচনায়, লজ্জায়। ক্ষমাও চাইতে পারিনি। কোন লজ্জায় বলব : ভারতীয় মহিলারা সিগারেট খান্না মনে করেই আপনাকে অফার করিনি, মাপ করবেন। তাই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সিগারেটের ব্যবহারের বিষয়ে আমি সদা সঙ্গত।



গুণ্ডয়িং নাচ কারাং মেটা ঘটুল

মুশকিল আসান হয়ে গেল ও-পক্ষ থেকেই! সামনের সারির প্রথম মেয়েটি সলজ্জে বাড়িয়ে দিলে উজ্জ্বল-লাঙ্ঘিত মোটা রুলি-পরা একখানা হাত। গ্রহণের মুদ্রায়। আরে এই মেয়েটিই তো এতক্ষণ লুচি পরিবেশন করছিল আমাদের। আর এরই তো কড়ি-বাঁধা খোঁপার ফটো নিলাম তখন। ঘাম দিয়ে স্বর ছাড়ল। সিগারেট অফার করা তাহলে ওদের সামাজিক রীতি-বিরুদ্ধ হবে না। সিগারেটটা দিয়ে লাইটারটা ছেলে মুখের সামনে ধরতেই — ও বাবা, এ কী হল? এক ঝাপটায় সরিয়ে নিলে মুখ। পার্শ্ববর্তিনীর দল খিলখিলিয়ে হেসে উঠল আচমকা। আমি তো অপ্রস্তুত। ছাঁকা লাগলো নাকি? তা কেমন করে হবে? ওর মুখ তো অনেক দূরে। ব্যাপার কী? মেয়েটি ইঙ্গিতে যেভাবে হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার মুদ্রা করল তাতে বুঝলাম কেটে পড়তে বলছে। পড়লাম, কেটেই পড়লাম সেখান থেকে। কিন্তু অপরাধটা কী হল বুঝলাম না।

একটা ইংরেজি গল্পে পড়েছিলাম জাহাজ-ডুবি-হওয়া একজন নাবিক বুঝি ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠেছিল কোন ক্যানিবলদের দ্বীপে। ক্যানিবলেরা তাকে ধরে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করছে যখন, তখন নাবিক বলল : তোমাদের আমি এমন একটা জিনিস

দেখাতে পারি, যা তোমরা জীবনে দেখনি।

ক্যানিবলেরা বললে : বেশ তাহলে ম্যাজিকটা দেখাও তারপর তোমাকে পুড়িয়ে খাব।

নাবিক বলে : না, তা হবে না। নতুন জিনিস যদি দেখ, তা হলে তার পুরস্কার হিসাবে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

কৌতূহল প্রবল। ক্যানিবলেরা রাজি হল : বেশ, দেখাও তোমার ম্যাজিক, যদি আগে কখনও এ ম্যাজিক না দেখে থাকি তাহলে তোমাকে না হয় ছেড়েই দেব।

নাবিক তখন পকেট থেকে বার করল একটা সিগারেট লাইটার। ফস্ করে লাইটার ঝালিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল ক্যানিবলদের, বিস্ময়ে। অবাক কাণ্ড !

নাবিক বললে : কী ? এ ম্যাজিক আগে কখনও দেখেছ ?

ওরা স্বীকার করলে : না — এ দৃশ্য এই প্রথম দেখল বটে।

বন্ধন-মুক্ত নাবিক তখন বললে : এর নাম লাইটার।

ওরা হেসে বললে : আরে থামো সাহেব। ও যন্ত্র আমরা কত দেখেছি। জাহাজ-ডুবো যত সাহেব এ দ্বীপে এসেছে তারা সবাই যখন তখন খচর খচর করে ঐ যন্ত্রর ছেলেই সিগারেট খেত — যতদিন না আমরা সবাই খেতাম তাদের। ও যন্ত্রর আর চিনি না আমরা !

নাবিক বললে : সে কী ? তাহলে তোমরা যে বললে, এই প্রথম দেখলে এটা ?

: প্রথম দেখলাম যন্ত্রটা নয়। যন্ত্রর স্থানার কায়দাটা। এর আগে আমরা যে সব সাহেবদের খেয়েছি তারা দেখতাম ক্রমাগত খচর-খচর করে তবে সিগারেট ঝাপতো। এ যন্ত্রর যে ফচাং করে একবারে স্থালা যায় এটাই নতুন দেখলাম !

এক্ষেত্রেও কি তাই হল নাকি ? ফচাং করে একেবারে লাইটারটা ধরিয়েছি বলেই আমকে উঠল মেয়েটা ?

ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার গুপ্তেজীর দ্বারস্থ হলাম। সবটা শুনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, বললেন : জানে-মানে বেঁচে ফিরেছেন এ শুধু বাপ-দাদার আশীর্বাদে !

হললাম : কেন ? কী ব্যাপার ?

: যে পুরুষকে মন দিয়েছে একমাত্র তার হাত থেকেই ওরা বিড়ির আগুন নেয় !

রাধামাধব ! কী কেলেকারী ! অজান্তে ‘ম্যান প্রোপোজেন্স্, উয়োম্যান্ ডিস্পোজেন্স্’ হয়ে গেল নাকি ? নেড়া কি তা হলে বারবার যায় বেলতলায় ?

এরপর শুরু হল সমবেত নৃত্য। অর্থাৎ যারা ছিল ছোট ছোট নৃত্যগোষ্ঠীর দর্শক তারাও নামল নাচে। সারা ময়দান জুড়ে নাচছে শ’তিন-চার নরনারী ! ছেলেদের মাজায় বাঁধা অসংখ্য ঝুমুর তালে তালে ঝুম্ঝুম্ করে বাজছে। ঝুমুর নয়, ছোট ছোট গাটা — গরুর গলায় যা আমরা ঝোলাই। মাজাতেও ঠিক নয়, নিতম্বের উপর। তালে তালে তা ঝুম্ ঝুম্ শব্দ তুলছে। মেয়েরা তালে তালে ঠুকছে তীরডুরি—মুরিয়ারা যাকে বলে দাগার। অর্থাৎ ঝুমুর-বাঁধা লাঠি। আমরা ব্যস্ত ফটো তোলায় ! ক্রমাগত

স্পুল বদলে চলেছেন ব্যানার্জিবাবু। বোস-সাহেব যুঁজি শট্ নিচ্ছে এ-কোণ থেকে ও কোণ থেকে। সকালবেলায় কোন কোন অফিসার তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় শখ করে হাত লাগিয়েছিলেন। বাৎসরিক ফাইন-আর্টস প্রদর্শনীতে যেমন প্রতিযোগিতায় আর্টিস্টদের কয়েকটি এক্সিবিট থাকে — ‘নট ফর কম্পিটিশন’ মার্কা — এঁরাও তেমনি পুরস্কারের লোভে নয়, এমনিতেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলাফলের কথা না তোলাই ভালো। শুধু এটুকু বলতে পারি মাড়িয়াকূলে জন্মগ্রহণ করলে সেইসব ধনুর্ধর অফিসার-পুঙ্গবদের একদিন চিরকুমার অবস্থায় চিতায় উঠতে হত, বংশরক্ষা হত না! বিকালবেলায় দেখলাম কারও কারও একটু নেচে দেখবারও শখ গেল। তাতে আমাদের, সভ্য জগতের প্রতিনিধিদের, শেষ অহংকারটুকুও ধূলিসাৎ হল নিঃশেষে। ওরা ভাবলে এই শহরে জংলীগুলো কি একেবারেই অপদার্থ? একগাদা জামা কাপড় তো জড়িয়েছে গায়ে — মানে শীত সহিতে পারে না, তীর ছোঁড়ার ক্ষমতা তো ও-বেলায় দেখা গেল; — মায় এমন যে সহজ কাজ, তালে তালে নাচ — তাতেও জুতোসুদ্ধ গোদা পায়ে মাড়িয়ে দেয় নৃত্যসহচরীর নূপুরনন্দিত চরণ?

প্রসঙ্গত আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমরা জনা-তিনেক গিয়েছিলাম মালকানগিরি অঞ্চলে ইরালগান্ডি গাঁয়ে। জাতে তারা কয়া, অর্থাৎ অন্ধ্রের প্রভাবান্বিত বাইসন-হর্ন-মাড়িয়া। আমাদের ঘিরে ওরা দল বেঁধে নাচছিল, আর গাইছিল গুন্ গুন্ গান। ওদের প্যাটেল হিন্দী জানে অল্প, অসমীয়া জানে ভালো। তেজপুরের কাছে এক চা-বাগানে চালান করেছিল বুঝি কোন আড়কাঠি। তার কাছেই শুনলাম যে, গানের কলি ওরা তখনই সদ্য রচনা করে গাইছে একটা বাঁধা ধুয়োয়। অনেকটা আমাদের বাঙলাদেশের কবিগানের মতো। প্যাটেল কিছু কিছু অনুবাদ করে শোনাতে আমাদের। কিন্তু অনুবাদের দিকে মন দিতে গেলে নাচ দেখা যায় না। আমরা তো আর নেপলিয়ন বোনাপার্ট নই। তাই তাকে থামিয়ে দিয়ে আমরা তন্ময় হয়ে শুধু নাচই দেখেছি — ‘গুগুরিং এগুনা!’ অনেকক্ষণ নাচের পর হঠাৎ একটা নতুন ধুয়ো শুরু হতেই দেখি সবাই হাসছে। নৃত্যরত নরনারীর সে হাসি সংক্রামিত হল মুহূর্তে গ্রামবাসী দর্শকদের মধ্যেও। ব্যাপার কী? প্যাটেলকে প্রশ্ন করলাম — এ গানের অর্থ কী? সে তো কিছুতেই বলবে না। শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে বললে, পদকত্রী বলছেন: শহরের এ মানুষগুলো শিকার করতে জানে না, নাচতেও জানে না, কিন্তু ওরা তিনজন হাসছে না কেন? ওরা কি হাসতেও জানে না?

অনুবাদ শুনে আমরা তিন বন্ধু হো হো করে হেসে উঠলাম।

বোধ করি ওরাও নিশ্চিত হলে। এ অপদার্থ শহরে মানুষগুলো অন্তত তাহলে হাসতে জানে।

যাক যা বলছিলাম।

শুনলাম, মধ্যপ্রদেশ সরকার একাত্তরটি উন্নয়নী ব্লক খুলছেন আদিবাসীদের মধ্যে। এক-একটিতে বাইশ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে। এদের উন্নয়নের জন্য সে টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। বাজেট এক্সপেন্ডিচার ছাড়া সে টাকা ব্যয়ের আরও কিছু উদ্দেশ্য থাকবে নিশ্চয়। জানি না সেটা কী রূপ নেবে। ব্লক পিছু বাইশ

লক্ষ টাকা বড় কম কথা নয়। বৈরামগড়, কুরুশপাল, বারসুরে এদেরই পূর্বপুরুষ একদিন প্রতিহত করেছিল চালুকা, চোল, হুয়শাল রাজাদের। কেমন করে করেছিল তার কোন ইতিহাস নেই, কিন্তু বহিরাগত আক্রমণ এরা ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এবার ঐ বাইশ লাখের অ্যাটম বোমার আঘাত কি সহ্যে পারবে ওরা ?

সিনিক হিসাবে বলছি না। উন্নয়ন-পরিকল্পনার বিস্তারিত কর্মসূচী এখনও তৈরি হয়নি। হলে হয়তো এ কথা আশঙ্কা করার অবকাশ আর থাকবে না। শুনলাম ওদের জন্য হাসপাতাল হবে, স্কুল হবে, ওদের জন্য লিখিত বর্ণমালা তৈরি হবে, বই হবে। রাস্তাঘাট, বাজার হবে। নিঃসংশয়ে এসব ভালো কথা। অতি উৎসাহী কোন পরিকল্পনাকারের দৃষ্টিভঙ্গির দোষে যদি ওদের সংহতির মূলে কুঠারাঘাত না করে এসব করা যায় তাহলে খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু যদি ওদের ধর্মবিশ্বাস, ওদের (কু?) সংস্কার, ওদের ঘটুল-পদ্ধতি, রীতিনীতি — যা কিছুই আদিম তাই যদি এই বাইশ লক্ষ মেগাটনের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা হয় তাহলে ওদের সমূহ ক্ষতিই করা হবে। ওদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বুঝতে শিখবে ‘ভূম গুড়জ্জ্বলতা’ — আকাশের দেবতার জলন্ত তীর নয়, ইলেকট্রিক শক — ‘ভীমূল উইল’ আসলে দেব ভীমূল পেনের সাতরঙা ধনুক নয়, ওটা জলীয় বাষ্পের আঘাতে রৌদ্রকণার বর্ণালী। ওরা জানবে ‘হাঁড়-গড়িয়াল-লেবাতায়’ চাঁদ আর সূর্য যখন ঢেকে যায় তখন তাদের ভূতে ধরে না — সেটা গ্রহণ। কিন্তু কী যায় আসে তাতে ? কী সুখ বাড়বে ওদের ? বিজ্ঞান ওদের দেবে যা তার বেশি নেবে কেড়ে। ওরা ভাবতে শিখবে বটে, কিন্তু ভুলবে হাসতে, ওরা দশটা-পাঁচটা ছুটেতে শিখবে বটে, ভুলবে নাচতে ! জ্ঞানবৃক্ষের সুস্বাদু ফলটা ওরা এখনও আস্বাদন করেনি ! তাই আজও ওরা আছে আদম-ঈভের সেই আদিম নন্দনে। ঈশপের লাজুলহীন শৃগালের মতো আমরা ওদের সে অসত্যতা যেন সহ্যে পারছি না। ওদের সমস্যাহীন জীবনে আমরা আমদানী করব সমস্যা, আর তার সমাধানটা রাখব না ওদের নাগালের মধ্যে। যে বস্ত্রসমস্যা ওদের নেই তা আমদানী করেই ক্ষান্ত হব না। তার সমাধানটা নিয়ে গিয়ে উঠে বসব কদম গাছের ডালে। বস্ত্রহরণ পালার এই মজা !

তবে একটা আশার কথা ! এ পর্যন্ত যেটুকু দেখে এলাম তাতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। মধ্যপ্রদেশ সরকার সূচনা ভালই করেছেন। হাত দিয়েছেন রাস্তা তৈরী করার কাজে। দ্বিতীয় পর্যায়ে খোলা হচ্ছে সততা-বিপনী। কোকামেটাতেও একটি সততা-বিপনী খোলা হবে।

বললাম : সততা-বিপনীটা আবার কী জন্ত ?

ওয়েলফেয়ার অফিসার গুপ্তেজী বললেন, মাড়িয়ারা হাটে এসে যা কিছু কেনে তাতেই তাদের ভীষণ ঠকতে হয়। একটা পুঁতির মালা, একটা দেশলাই, মোমবাতি, কাপড়, লবণ যা কিছু কিনবে তাতেই ঠকবে। ওরা আজও আছে বিনিময়ের যুগে। এক শোলি লবণের মূল্য এক শোলি চাল। কর্তৃপক্ষ তাই ওদের গ্রামে দোকান খুলতে চান। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ? কে হবে দোকানী ? সভ্য জগতের কেউ যাবে না এ নির্বাসনে — যাবে কেন, যদি অতি মুনাফার লোভ না থাকে ?

একমাত্র সমাধান ওদের দিয়েই দোকান খোলানো। সে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ভবী তাতে ভোলেনি। ওরা এসব হাঙ্গামা পোহাতে রাজি নয়। খেত-খামার করব, শিকার করব বনে-বাদাড়ে, খেয়াল-খুশিতে গাইব-নাচব — এটা বুঝি ; দোকানদারী বুঝি না বাবু। মাছ মারব খাব ভাত, দোকানদারী কী উৎপাত- ভাবখানা এই রকম। তাই স্থির হয়েছে খোলা হবে সততা-বিপণী। কিছু দূরে দূরে কোন গ্রামে কর্তৃপক্ষ একটি দোকানঘর তৈরী করবেন ! সেখানে লবণ, কাপড়, তেল, দেশলাই, পুঁতির মালা, তীরের ফলা, টাঙির লোহা — ইত্যাদি ওরা হাটে এসে যা কিছু কেনে তা রেখে দেওয়া হবে। আর ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে ঢোল সহরং করে জানিয়ে দেওয়া হবে চালের সঙ্গে প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের বিনিময় হার। কর্তৃপক্ষ আশা রাখেন মাসতিনেক পরে সভ্য জগৎ থেকে যখন কোন রাজকর্মচারী নূতন পণ্যসম্ভার নিয়ে সেই দোকানীহীন বিপণীতে যাবেন, তখন দেখতে পাবেন পণ্যদ্রব্যের বদলে রয়েছে পরিমাণমতো চাল।

আশা জিনিসটা ভালো। আশাবাদীরাই দুনিয়ার অ্যাসেট। কিন্তু তার একটা সীমা আছে। টানলে রবার বড় হয়, ফোলালে বাড়ে বেলুন — কিন্তু সময়ে থামতে জানা চাই। অহেতুক আশার কুহকে ভুলে বসে থাকা কোন কাজের নয়। সদ্য পরিচিত সাকার্সের গাধাকে মাঠে-চরা গাধা বলেছিল : কেন মরতে পড়ে আছিস ঐ সাকার্সে, চলে আয় আমাদের দলে। উত্তরে সাকার্সের গাধা বলেছিল : এখানে আমার চাকরির একটা প্রসপেক্ট আছে। একটা চান্স নিচ্ছি আমি।

: কিসের প্রসপেক্ট ? কী চান্স নিচ্ছিস ?

গম্ভীর হয়ে সাকার্সের গাধা বলেছিল : তারের খেলা দেখায় যে মেয়েটা সে একদিন পড়ে গিয়েছিল, ম্যানেজার তখন তাকে ধমক দিয়ে বলেছিল — ফের যদি কোনদিন পড়ে যাও অমন করে, তাহলে ঐ গাধাটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। আমার দুর্ভাগ্য, সে চান্স আজও আসেনি আমার। মেয়েটা এরপর একদিনও পা ফস্কায়নি।

সততা-বিপণীর গল্প শুনে মনে হয়েছিল মধ্যপ্রদেশ সরকার কি সাকার্সের সেই জন্তুবিশেষের মতোই অতি-আশাবাদী ? নেংটিসার অভাবগ্রস্ত মানুষের গ্রাম সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে দুর্গম অরণ্য পর্বতের অভ্যন্তরে ; একটুকরো কন্দমূলের আশায়, চকিত-দেখা একটা হরিণের পিছনে ওরা পাহাড়ে-কন্দরে ছুটে ছুটে বেড়ায়। ওদের সামনে গুদামঘরে সাজিয়ে রাখা হবে থরে থরে নানান লোভনীয় জিনিস। কোনও দোকানী থাকবে না, পাহারাদার থাকবে না। কারও জিন্মাদারী নেই, কেউ হিসেব রাখবে না। তবু সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে ! মানবিকতার মোহনায় যারা মেগাটন বোমা বানাচ্ছে তাদের চেয়ে কৃতিত্ব কি তাহলে কম দেখাবে উৎসমুখের এই মানুষগুলি ? প্রথমটা অবিশ্বাস হলেও ক্রমে ওদের দেখে-শুনে আমারও বিশ্বাস হয়েছে — এ পরিকল্পনারও একটা প্রসপেক্ট আছে, এ চান্স নেওয়াই উচিত। কেন হবে না ? এ হতভাগাগুলো যে আজও অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্বর — পরের দ্রব্য না বলে পকেটজাত করার যে চারুকলা তা যে এরা এখনও রপ্ত করেনি। টাইবাল-অফিসারকে বললাম, আর কোনদিন হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার ঠিকানাটা রাখুন —

তিনমাস পরে আপনার কর্মচারী এসে কী দেখলেন তা আমাকে জানাবেন।

বললেন, কী হবে জেনে ?

বললুম, আমার দাদাকে জানাব। তিনি কলেজের অধ্যাপক। পরীক্ষার ‘হলে’ জাঁদরেল গার্ড হিসাবে তিনি কলেজে সুনাম কিনিছেন।

সন্ধ্যাবেলায় দড়ি টানাটানি খেলা হল। আদিবাসী দল বনাম অফিসার দল। বেস্ট-অফ-থ্রি হওয়ার কথা। হল না। দুবারেই খেল্ খতম। ফলাফলের কথাটা লেখা শুধু অন্যায় নয় অধর্ম হবে ; কারণ এক্ষেত্রে ঠিক সমানে-সমানে যোঝাযুঝি হয়নি। যে পক্ষ হারল, তাদের পরাজিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তারা ছিল সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত — সারাদিন স্পোর্টস দেখা, নাচ দেখা, ফটো তোলায় ধকল কি কম ? হারতে হবে, এ আর বিচিত্র কী ?

সন্ধ্যার পর ডাক্তার পিল্লাই বললেন, গ্রাম দেখবেন ?

—গ্রাম ? কোথায় গ্রাম ?

—কোকামেটা গ্রাম — এখান থেকে সিকি মাইলও হবে না।

আমি তো একপায়ে খাড়া। বললাম : আলবৎ ! এম্মুণি !

কীড়াঙ্গনের কাছেই কোকামেটা গ্রাম। ষাটঘর মাড়িয়ার বাস। খাস আবুজমাড়িয়া নয় — হিল্-মাড়িয়া। গোধূলি-লগ্নে গ্রাম দেখতে গেলাম পিল্লাই-সাহেবের সঙ্গে। এরা খাজনা দিয়ে জমি ভোগ করে। যার যতটা জমিই থাক — লাঙল যার খাজনা তার। খাজনা অবশ্য খুবই কম। বছরে প্রাপ্তবয়স্ক পিছু দেড়টাকা, যদি সেই প্রাপ্তবয়স্কের লাঙল আর টাঙি থাকে, নইলে নয়। বিনিময়ে ওরা সারাবছরে যত ইচ্ছে জ্বালানি কাঠ কাটতে পারে। খাজনা আদায়ের পদ্ধতিটাও সরল। গাঁয়ের গাইতা বা প্যাটেলের কাছে থাকে একটা মুখবন্ধ ঘট। তাতে পয়সা ফেলা যায়, বার করা যায় না। গ্রামবাসীরা সময় ও সুযোগমত তার মধ্যে দু-আনা চার-আনা ফেলে যায়। হিসাব তারাই রাখে। গাঁওবুড়ো শুধু ঘটের জিন্মাদার। বৎসরান্তে ঘট নিয়ে গাঁওবুড়ো যায় নারানপুরে। তহশীলদারের কাছে। তিনি ঘট ভেঙে সিকি-দুয়ানি গুনে নিয়ে গাঁয়ের নামে রসিদ কাটেন। প্রাপ্তবয়স্ক পিছু দেড়টাকা আদায় হল কি না সেটা দেখে নেবার দায় তাঁর। রাজারা মানিক কোথায় পায় এ প্রশ্ন অসিদ্ধ হলেও মাড়িয়ারা পয়সা কোথায় পায় এ প্রশ্নটা করা চলতে পারে। বললাম, ওরা তো আছে বিনিময়ের যুগে — সিকি-দুয়ানি এরা পায় কোথায় ? উত্তরে শুনলাম হাটে ব্যাপারীরা সিকি-দুয়ানি বিক্রি করতে আসে, সেখানেই কিনতে পাওয়া যায়। খাজনা দেবার প্রয়োজনে এরা চাল দিয়ে মুদ্রা কেনে। ‘চাল বিক্রি করে’ কথাটা ওদের ব্যাকরণসঙ্গত নয় নাকি। ওদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিজনেস্-ডীলের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটা এ রকম দাঁড়ায় : ওরা চাল নিয়ে হাটে আসে, তার বিনিময়ে নেয় লবণ, সেটা খায়, — নেয় কাপড়, সেটা জড়ায় মাজায় ; নেয় টাঙির ফলা, সেটা গাছকাটার প্রয়োজনে লাগে। তেমনি চালের বিনিময়ে নিয়ে যায় একরকম ছোট ছোট চাক্তি, সেটা খাজনা দেবার প্রয়োজনে কাজে লাগে। একে যদি তোমরা বল চাল বিক্রি করা, তা বল। ওরা তা বলে না।

শুনলাম কোকামেটার পিছনে খাস আবুজমাড় পাহাড়ে থাকে যে মাড়িয়া, আবুজ

মাড়িয়া, তারা খাজনাও দেয় না। কে যাবে আদায় করতে? কে বোঝাবে তাদের — জমির মালিক মাটিলাল নয়, ভীমুল পেন নয় — ভারত সরকার। আরও মজার কথা শুনলাম—এই কোকামেটা গাঁয়েও আছে বারোজন এনলিস্টেড ভোটার! আগামী নির্বাচনে তারা ভোট দেবে। মাথাপিছু ওরা দেবে এক ভোট, যার বেশী দিতে পারবেন না অধ্যাপক সত্যেন বোস অথবা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ!

সন্ধ্যার পর ওরা দল বেঁধে এল জেলা-সমাহর্তা মশায়ের কাছে দরবার করতে। যেন ঋষ্যমুক পর্বতে শ্রীরামচন্দ্রকে ঘিরে বসেছে কপিসেনা। করজোড়ে বসেছে গোল হয়ে নেংটিসার মানুষগুলো। কালেক্টার-সাহেব বললেন তিনি খুব খুশি হয়েছেন ওদের নাচ-গান-খেলা দেখে। এত খুশি হয়েছেন যে তাঁর খুশি হওয়ার একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন তিনি এ গ্রামে রেখে যেতে চান। গ্রামবাসীদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে এবার তাহলে তা বলতে পারে।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। গোণ্ডিভাষা না জেনেও আমরা বুঝতে পারলাম ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন। কিন্তু অসভ্য বর্বরগুলোর মাথায় গোবর পোরা, বললে, আপনারা কষ্ট করে আমাদের নাচগান দেখতে এতদূরে এসেছেন এতেই আমরা ধন্য।

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব এবার আরও স্পষ্ট করে বললেন, তোমাদের কোন অভাব আছে? কোন কিছু চাও?

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এ প্রশ্নটা হতে পারে তাই যেন ধারণা ছিল না ওদের। অভাব? আকাশে আলো আছে, নদীতে জল আছে, জঙ্গলে হরিণ-খরগোশ-বুনো শুয়োরা আছে, মন্ড্রাগাছে মধু আছে — আবার অভাব কিসের?

ডি-এম বললেন, বেশ অভাব না থাকে তো অভিযোগ আছে কিছু? কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ আছে?

এবার উঠে দাঁড়ালো একজন মোড়ল। হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়েছে তার। খালি গা, মাথায় বুনো-শুয়োরের জোড়াদাঁত দিয়ে বানানো শিরস্ত্রাণ, দুহাতে দুটো দস্তার বালা। জোড় হাতে উঠে দাঁড়ালো এবার। লোকটার নাম নিশ্চয় ‘রামনাথ’ নয়; কিন্তু সে যে ‘বুনো’ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বললে, অভিযোগের কথা যখন তুললেন হুজুর, তখন বলব, হ্যাঁ আছে, অভিযোগ আছে আমাদের।

: কার বিরুদ্ধে? কিসের অভিযোগ?

: ঝাড়ালবাহাই তাড়িখানার মালিকের বিরুদ্ধে হুজুর। লোকটা মদের বদলে শুধু জল চালাচ্ছে আজকাল। শ্রেফ জল, একসাথে নির্জলা দু-বোতল টেনে দেখেছি হুজুর — তবু নেশা হয় না।

কালেক্টার বললেন, বেশ আমি খোঁজ নিচ্ছি। তোমার অভিযোগ সত্য কি না।

লোকটা অবাক হয়ে গেল। ভাবখানা, অভিযোগ আবার মিথ্যা হয় নাকি? মিথ্যাই যদি হবে তবে খামোকা অভিযোগ জানানো হবে কেন, আর অভিযোগ জানানো যখন হচ্ছে তখন তা সত্য ছাড়া আর কিছু হবে কী করে? লোকটা বলল, আমার কাছে বোতল আছে হুজুর, আপনি নিজে টেনে দেখুন, নেশা হয় কি না হয়।

আমি মনে মনে বললুম : তারা ! ব্রহ্মময়ী !

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বললেন, না তোমার বোতলটা শেষ করব না— আমি ওর দোকানে গিয়ে নিজেই পরখ করব। যদি নেশা না হয় তখন লোকটার লাইসেন্স বাতিল করে দেব ! বলে, আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচুকে হাসলেন।

কলকণ্ঠে আনন্দধ্বনি উঠল ওদের মধ্যে ! এবার ঠিক জন্ম হবে ঝাড়ালবাহাই তাড়িখানার সেই ভুঁড়ো-পেটা লোকটা ! আনন্দ উচ্ছ্বাসটা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবার নিজে থেকেই বললেন, তিনি কোকামেটা গ্রামের জন্য ৩১৯৯ টাকা নিজ তহবিল থেকে দিচ্ছেন। দু'হাজার টাকায় একটা পাকা ইঁদারা হবে, আর বারো শ'টাকায় তৈরী হবে একটা প্রাইমারী স্কুল। প্রথামত সকলে হাততালি দিলাম ! কিন্তু ওদের মধ্যে এবার আর কোন চাঞ্চল্য দেখলাম না। বরং আগের প্রতিশ্রুতিটাতেই ওরা বেশী খুশি হয়েছিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম কোকামেটার গ্রাম দেখতে গিয়ে। গাঁয়ের মেয়েরা দেখছি নগ্নবক্ষে অসংকোচে গৃহকর্ম করছে, পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে পুরুষদের সামনে। কিন্তু যেই আমাদের দুজনকে দেখছে অমনি পিছন ফিরছে। একটি মেয়ে যাঁতা পিষছিল, আমাদের আসতে দেখে হাঁটু দুটো বুকের কাছে টেনে এনে জড়সড় হয়ে বসলে। কেন ? অথচ আজই সকালে কোকামেটা ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে যে সব মাড়িয়া মেয়েদের দেখেছি, তাদের তো উধ্বাসের বিষয়ে কোন গোপনীয়তা-বোধ লক্ষ্য করিনি। কলসী দৌড়ে তিনবার হিটে অন্তত জনা-পঁচিশেক মেয়ে প্রতিযোগী ছিল। তাদের বয়স চৌদ্দ-ষোল থেকে পঁচিশ-ত্রিশ। কই, তারা তো সঙ্কোচবোধ করেনি ঐ ভাবে আমাদের সামনে দৌড়াতে। একটু পরেই বুঝতে পারলাম কারণটা। কোকামেটায় আদিবাসী উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে। সভ্যজগতের মানুষ জানাগোনা সবে শুরু করেছে এখানে। আর প্রতিযোগী মাড়িয়ারা এসেছিল আরও অভ্যন্তরভাগ থেকে। তারা এখনো সভ্যতার আলোক পায়নি। কোকামেটার ছেলেদের নারানপুরে যাতায়াত আছে। সভ্য জগতের মেয়েদের জামা-কাপড় পরার ধরন দেখে হয়তো তারা কিছু বুঝতে শিখেছে। হয়তো তারা এসে কিছু বুঝিয়েছিল এদের। কিন্তু হয়তো কোন ক্যামেরাধারী সভ্য জগতের মানুষ অসভ্যদের পিছু পিছু ধাওয়া করে কিছু বুঝতে শিখিয়েছে। তাই গাঁয়ের মানুষ আর বাইরের জগতের মানুষকে ওরা ভিন্ন চোখে দেখতে শুরু করেছে। আমাদের বাঙলাদেশের গাঁয়ের বধু যেমন পরদেশী দেখলে 'হাতের পোঁছায় গায়ে মাথার কাপড় গোছায়,' ওদের ভাবখানাও সেই রকম। না ! উদাহরণটা ঠিক হল না ! আমাদের মেয়েরা যেমন তাড়িখানা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা টলটলায়মান মাতালের সামনে পড়লে তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় টেনে আড়াল খোঁজে, অথবা বলা যায় যুদ্ধের আমলে গোরা সৈন্য দেখলে আমাদের মেয়েদের যা অবস্থা হত — আমাদের দেখে ওরা তেমনি করেছে। গোরা সৈন্যরা পরাধীন ভারতবাসীকে মানুষ বলে গণ্য করত না...প্রকাশ্য স্থানে নগ্ন হয়ে স্নান করত। ওরা যে সভ্য, আমরা যে অসভ্য। চাকা পালটেছে, আমরা এখন ক্যামেরা নিয়ে অর্ধনগ্ন মাড়িয়া মেয়েদের পিছু ধাওয়া করতে সঙ্কুচিত হই না। আমরা সভ্য, ওরা যে অসভ্য !

কোকামেটায় ঘটল আছে। কিন্তু রাত্রে মেয়েরা সেখানে থাকে না। এটা মুরিয়া গ্রাম নয়। মাড়িয়া গ্রাম। মাড়িয়াদের ঘটলে মেয়েদের রাত্রে শোবার হুকুম নেই। সন্ধ্যারাত্রে নাচ-গানের পর মেয়েরা যে যার ঘরে যায়। অনেকটা নাগা অঞ্চলের মোরাঙের মতো! মাড়িয়া ঘটল শুধু অবিবাহিত পুরুষদের ডমিটারী। মুরিয়াদের ঘটল কিন্তু ভিন্ন বস্তু। সে কথা বারান্তরে।

রাত্রে কর্মসূচীর দুটি আইটেম বাকি ছিল। প্রথমে পুরস্কার বিতরণ। তারপর সিনেমা শো। প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হয়েছে জেলা সমাহর্তা মশাই নিজেই তাদের পুরস্কার বিতরণ করলেন। কাপড়, তোয়ালে, সাবান, বাসনপত্র। পুরস্কার বিতরণ-পর্ব শেষ হলে সমাহর্তা মশাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগল আপনার সারাদিনের উৎসব?

এককথায় জবাব কী দেব ভেবে উঠবার আগেই আবার বললেন, আপনি তো শুনেছি এদের নিয়ে বই লিখছেন — কিন্তু বাঙলা ভাষা তো আমি জানি না। বই বের হলেও পড়তে পারব না। তাই জানতে চাইছি আপনার মতামত।

বললাম সংক্ষেপে, কোকামেটার এই একটা দিন আমি জীবনে ভুলব না।

বললেন, কোন সাজেশান আছে আপনার? এটা আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান। তাই জানতে চাইছি।

যে সুরে ভদ্রলোক প্রশ্নটা করলেন, তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসলে নির্বোধেরও সুবিচার করার হুক জন্মায়। জেলা সমাহর্তার চেয়ারে বসলে মানুষ ভাবে অপরের সাজেশান শুনতে চাওয়ার অর্থ সময়ের অপব্যয়। এ ভদ্রলোক বোধ করি সে নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই যা মনে হল অকপটে জানালাম।

— জানতে যখন চাইছেন, তখন বলব, আমার সাজেশান আছে।

— বলুন, বলুন। — উৎসাহিত হন উনি।

— প্রথমত — স্পোর্টসের কোন রেকর্ড রাখা হয় না। এটা হলে ভাল হয়। বিশেষ করে তীর ছোঁড়া। ‘আচারির’ একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে নিশ্চয় — দূরত্বের এবং লক্ষ্যের মাপের। সেটা মেনে নিয়ে প্রতিযোগিতা করলে আমরা ধারণা করতে পারব ওদের লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা। দ্বিতীয়ত, আপনারা যদি আগে থেকে জানান, তাহলে ওরা এই বার্ষিক উৎসবে ওদের হাতে তৈরী করা জিনিস আনতে পারে। ওদের তৈরী মান্দ্রি ঢোল, বিড়িয়া ঢোল, টাঙি, শিরজ্ঞাণ, কাপড়, গহনা। আপনারা উচ্চমূল্যে আগে সেগুলি কিনে সেগুলিকেই পুরস্কার হিসাবে বিতরণ করতে পারেন। এতে একদিকে ওদের শিল্পের প্রচেষ্টা হবে আর একদিকে ওরা পুরস্কার হিসেবে এমন কিছু পাবে, যা ওরা ব্যবহার করে। এছাড়া আমার মতো বহিরাগত যদি কেউ আসে, তাহলে এসব দুস্ত্রাপ্য জিনিস কিনেও নিয়ে যেতে পারে।

উনি বললেন, আর তৃতীয় সাজেশান?

— তৃতীয়ত, এর পরের বছর থেকে দড়ি-টানাটানির খেলাটা অফিসার দল বনাম আদিবাসী দল না হয়ে যেন ডি-এম-এর দল বনাম এস-পি-র দল হয়।

— কেন, তাতে লাভ?

—তাহলে এর পরের বছর দড়ির দুপ্রান্তে থাকতে হবে না আমাদের। বছরে অন্তত একটা দিনও ওদের হাতে হাত মেলাতে, কাঁধে কাঁধ মেলাতে পারব। টানতে পারব জগন্নাথের রথের রশি না হলেও অন্তত টাগ-অফ-ওয়ারের দড়ি।

উনি বললেন, ঠিক বলেছেন, তাতে আরও একটা উপকার হবে।

—কী ?

—বছরে বছরে আমরা ওদের কাছে হেরে যাই। ওভাবে এলোমেলো করে নিলে অন্তত সে লজ্জার হাত থেকে তো রেহাই পাব।

হো হো করে হেসে উঠলাম শুনে।

রাত্রে সিনেমার ব্যবস্থা। রুচিজ্ঞান আছে মধ্যপ্রদেশ প্রচার বিভাগের। সাক্ষ্য অনুষ্ঠানের জন্য ওঁরা এনেছেন আদিবাসী জীবন আর জঙ্গলের ছবি।

আদিবাসী জীবনের উপর এই রঙিন ডকুমেন্টারি ছবিটি তুলেছেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের নিজস্ব প্রচার-বিভাগ। অপূর্ব ছবি হয়েছে তা। আজকাল সেন্সর বোর্ড ছবি অনুমোদন করবার সময় বলে দেন কোন্ ছবি ‘ইউ’ আর কোন্ ছবি ‘এ’। অর্থাৎ কোন্ ছায়াচিত্র সর্বসাধারণের পক্ষে দর্শনীয়, আর কোন্ ছবি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের দেখবার উপযোগী। ‘এ’মার্ক ছবি অপরিণতদের দেখানো বারণ। সভ্যজগতের মানুষ নোট করে রাখুন : ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা অপরিণত, ঐ অসভ্য মাড়িয়াদের তুলনায়। মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই আদিবাসী জীবনের উপর তোলা ডকুমেন্টারি ছবি আদিবাসী গ্রামে অসংকোচে দেখানো চলে — সভ্য জগতের কোন সিনেমা হলে প্রাপ্তবয়স্কদের দেখানো মানা ! মধ্যপ্রদেশ সরকারের মতে আপনি-আমি সে ছবি দেখবার উপযুক্ত নই — মুংতা-আপেতু-কোণ্ডা-টুডুর দল সে ছবি দেখবার অধিকারী। ওরা সে ছবি দেখল কৌতুহলভরে, যদিও কমেটারি ছিল হিন্দীতে। দেখলুম আমিও, ঘটনাচক্রে সেখানে উপস্থিত থাকায়। অথচ জানি, নিরাবরণাদের সে ছবি কোন শহরে দেখানো হলে কমেটারির একটি শব্দও শুনতে পেতাম না — নিরবচ্ছিন্ন সিটি মারার শব্দে !

আদিবাসী জীবনচিত্রের পর শুরু হল জঙ্গলের ছবি। খুব আমোদ পেল ওরা। গুলিবিদ্ধ হরিণের ছটফটানি দেখে কী খুশী ! পাবলিসিটি কর্মচারীরা বাধা না-দিলে তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরত পদটি। পালিয়ে না যায় ! আফ্রিকার জঙ্গলের দৃশ্যে জিরাফের ছবি ভেসে উঠল পর্দায়। পার্শ্ববর্তী আদিবাসী উন্নয়ন অফিসারকে বললাম, জিজ্ঞাসা করুন তো এটা কী জন্তু ?

প্রশ্নোত্তর হল হালবি অথবা গোঙিতে। অফিসারের মাধ্যমেই শুনলাম জবাবটা, ওটা এক রকমের লম্বা গলা হরিণ।

চমকে উঠলাম। যতটা অশিক্ষিত মনে করেছিলাম, আসলে ততটা নয় নাকি ? ডারউইন সাহেবের ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’ বইখানা অন্তত পড়েছে ও ছোকরা। না হলে বিবর্তনবাদের যে গুঢ় সূত্রটা আবিষ্কার করতে রীতিমত হিমশিম খেয়েছিলেন ডারউইন, ও ছোকরা শ্রেফ ইন্টুইশানে তা কেমন করে বাতলে দিল ?

সেই রাত্রেই রওনা হলাম জগদলপুরের দিকে। ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল। না হলে

আরও একটা দিন হয়তো থেকে আসতাম। ডাক্তার পিল্লাই চলে গেলেন পারলকোটের দিকে। বারে বারে আমন্ত্রণ করে গেলেন তাঁর ওখানে যাবার জন্য : সুযোগ পেলেই চলে আসবেন। বনমুরগীর মাংস খাওয়াব — বরাত ভালো থাকলে হরিণের।

বললুম, বিশ্বাস করি না।

: বিশ্বাস করেন না ? কেন ?

: আপনার কথায় বিশ্বাস কী ? কাল রাত্রে বললেন, কাসুন্দি-শাক, গোকুলপিঠে-পায়েস — আর আজ বলছেন আমিষ ডিশ! আপনার কথার ঠিক কী মশাই ?

হো-হো করে প্রাণখুলে হাসলেন পিল্লাই : খামোশ। আমিষ-নিরামিষ দুই-ই খাওয়াব।

বললাম, পারলে এখনই যেতাম। পারছি না। ছুটি নেই। তবে নিশ্চয় যাব একদিন আপনার ডেরায়। খাওয়ার লোভে নয়, মানুষের লোভে। খাশ আবুজমাড়ে নিয়ে যেতে পারেন ?

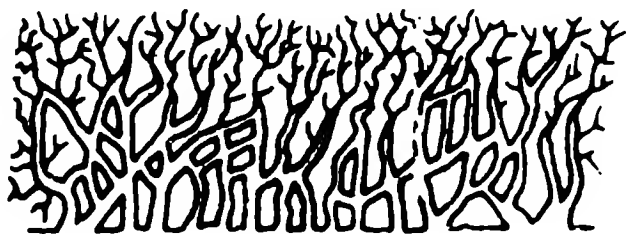
ডাক্তার-সাহেব বললেন : শক্ত বায়না দিলেন মশাই। তবে দণ্ডকারণ্যের আদিবাসীদের নিয়ে যদি বই লেখেন, আমি বলব অন্তত বোণ্ডো আর শবরদের দেখতে ভুলবেন না।

—তারা থাকে কোথায় ?

—বোণ্ডোরা মালকানগিরি অঞ্চলে, পাহাড়ের মাথায়। আর শবররা সারা অঞ্চলে ছড়ানো। তবে আসল শবরদের দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে রায়গড়া এলাকায় গুনপুরের কাছে। আমি যাবার তাল করছি। যাবেন আপনি ?

বললাম, সুযোগ পেলেই যাব। যাবার আগে অন্তত একটা খবর দেবেন।

ধুলোর ঝড় তুলে আমাদের জীপ ফিরে চলল নারানপুরের দিকে। সেখান থেকে কোণ্ডাগাঁও হয়ে আবার আমার কর্মস্থলে। গতানুগতিক জীবনে। সেই যেখানে বসে থোড়, বড়ি এবং খাড়ার কতরকম সম্ভাব্য পার্মুটেশন-কম্বিনেশন হতে পারে তার রিসার্চ করি। জীপে ফিরতে ফিরতে সেই কথাই মনে হচ্ছিল। মনে হল, হারিয়ে গেল কোকামেটা গ্রাম ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অজানা গাঁয়ের ভিড়ে। কিন্তু সত্যিই হারিয়ে গেল কি ? আর কোনদিন সশরীরে কোকামেটায় ফিরে আসব না, একথা নিশ্চিত। কিন্তু কে বলতে পারে, হয়তো স্বপ্নের ঘোরে একদিন আবার এসে হাজির হব এই ‘বক্ষিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন’ কোকামেটায়। ‘বহুদূরে পথ চিনে চিনে’ এসে শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা পাব আমার স্বপ্ন-নামিকার। উষ্ণিলাঙ্কিতা বলিষ্ঠ-গঠন। সেই তরুণী মেয়েটির। মুখের সিগারেটে আগুন দেবার প্রস্তাব করায় যে এক ঝামটায় সরে গিয়ে বলেছিল — কী বলেছিল তা অবশ্য বুঝিনি, তবে হুপ করে বলতে পারি তার অবধারিত বঙ্গানুবাদ : মুয়ে আগুন ঘিন্‌সের !



॥ পাঁচ ॥

ঝন্ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোন। আত্মপরিচয় দিতেই ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, গুপ্তেজী কথা বলছি, চিনতে পারেন ?

বললাম, আলবৎ। কিন্তু আপনার তো তিনমাস পরে আমাকে চিঠি লেখার কথা ছিল। মাত্র সাতদিনের মধ্যেই ফোন করছেন যে ? সততা বিপণীর নতুন খবর আছে নাকি কিছু ?

—বিপণী না হলেও সততার খবর বলতে পারেন। কিছু হারিয়েছে আপনার ?

বললাম, হারিয়েছে ? হারিয়েছে অনেক কিছুই। ‘জীবনে অনেক ধন পাইনি, নাগালের বাইরে তারা, হারিয়েছি তার অনেক বেশী হাত পাতিনি বলেই।’ কিন্তু এ কথা কেন ?

গুপ্তেজী বললেন, কাব্য ছেড়ে একটু কাজের জগতে নেমে আসুন মশাই। কোকামেটায় হারিয়ে এসেছেন কিছু ? কোন বই।

—কই না তো।

—না তো কি মশাই ? আপনার নাম লেখা একটা বাঙলা বই এসে পৌঁছেছে যে আমার হাতে কোকামেটা থেকে।

—তাই নাকি ? তা বইটার নাম কী ?

—তা বলতে হলে ঐ অদ্ভুত হরফগুলো আমাকে প্রথম চিনতে শিখতে হয়। মালিকের নামটা ভাগ্যে ইংরেজিতে লিখেছিলেন, তাই খুঁজে পেলাম।

—কেমন করে পেলেন ?

—তা জানতে হলে অবিলম্বে আমার অফিসে চলে আসুন। আমার অফিস চেনেন তো ?

—আমি না চিনলেও আমার জীপ ড্রাইভার পাঁড়েজী চেনে বোধ হয়। না হলেও ট্রাইবাল অফিসারের দপ্তর খুঁজে পাবই।

গিয়ে হাজির হলাম গুপ্তেজীর অফিসে। আপ্যায়ন করে বসালেন। হ্যাঁ, আমারই বই। হাতে নিয়ে বললাম, আমারই বই বটে। কেমন করে পেলেন ?

—বলছি, কিন্তু কী বই ওটা ? কবিতার বই নিশ্চয় — কী নাম ?

বললাম, গীতাঞ্জলি —

গুপ্তেজী যেন চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বইখানি টেনে নিলেন আমার হাত থেকে। পাতা উল্টে উল্টে দেখলেন, হাত বুলালেন দুর্বোধ্য হরফে ঠাসা মসৃণ পাতাগুলোর উপর। তারপর আবার আমার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, একটু পড়ে শোনাবেন ? মূল গীতাঞ্জলির কোন কবিতা আমি কখনও শুনিনি।

বললাম, শোনাব। আমার বাসায় আসবেন সন্ধ্যাবেলায়।

—অফকোর্স, অফকোর্স। আমারই অন্যায়। আমি শুনেছি — এ বই আপনারা, বাঙালীরা, ভগবদ্-গীতার মতোর শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েন। অফিসে এ বই পড়তে অনুরোধ করা অন্যায়ই হয়েছে আমার।

বাধা দিয়ে বলি, সেটাও আপনার ভুল ধারণা গুপ্তেজী। এ বই আমার নিত্যসঙ্গী। যখন-তখনই পড়ি। কাপড় ছেড়ে, পুষ্মুখো হয়ে বসে, আচমন করে এই বই পড়তে হয় না। সে জ্ঞানো বলছি না। এখানে ঠিক মুড আসছে না।

—ঠিক কথা।

—কিন্তু কেমন করে বইটি পেলেন আপনি?

—বইটি এনে দিয়েছে কোকামেটা থেকে একটি মুরিয়া ছেলে। চয়ন গোণ্ড। দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেই।

পিয়নকে ডেকে কী যেন বললেন হালবিতে। অল্লক্ষণ পরেই সে ডেকে নিয়ে এল একটি ছেলেকে। পর্দা সরিয়ে ঘরে দাঁড়াতেই আমি চমকে উঠি। একনজর দেখেই আমি যেন মোহিত হয়ে গেলাম। ছেলেটির বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হতে পারে। খালি গা, মালকোচা সাঁটা, ফরসা একটি ধুতি। গলায় একসার লাল-সাদা পুঁতির মালা। মাথায় হাতে-বোনা তাঁতের কাপড়ের উপর একটি নীলাভ শিখিপুচ্ছ। দু-হাতে দুটি ভারী দস্তার বালা। কিন্তু সাজপোশাক নয়, আমি দেখছিলাম মানুষটাকে। মুরিয়াদের মধ্যে অমন সুপুরুষ মূর্তি আমি খুব কম দেখেছি। যেন কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা ওর দেহ, তেমনি অপূর্ব মুখশ্রী। মনে হল সৃষ্টিকর্তা ছেনিহাতুড়ি নিয়ে ঐ পাথরে গড়া তনুদেহটি খুদে বার করেননি। তারুণ্যের প্রতীক এ মূর্তিটি তিনি যেন মন্ত্রবলে সৃষ্টি করেছেন। অথবা বলা যায় শ্বেতপাথরের বদলে কষ্টিপাথর হাতে পেলে মিকেলাঞ্জেলোর ‘ডেভিড’ এমন চেহারা নিত।

ছেলেটা ‘জোহার’ করল আমাকে। তাড়াতাড়ি প্রতিনমস্কার করলাম বাঙালী কায়দায়। চয়ন হচ্ছে কাবোঙ্গা গাঁয়ের শিরদার। কাবোঙ্গা ঘটুলের প্রধান।

গুপ্তেজী বললেন, এই ছেলেটি আপনার বইটি এনে দিয়েছে আমাকে।

বললাম, আমার হয়ে ছেলেটিকে ধন্যবাদ জানান।

গুপ্তেজী হেসে বলেন, তাতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে। প্রথমত, ‘ধন্যবাদ’ শব্দটার গোণ্ডি প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, আপনার জিনিস আপনাকে পৌঁছে দেওয়াটা ওদের কাছে এত স্বাভাবিক যে, তার জন্য প্রাপক যে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে এটার ওর মাথায় ঢুকবে না। অসভ্য কিনা।

বললাম, কিন্তু বইটা ও এতদূর বয়ে এনেছে কেন? আমাদের পরেও তো কোকামেটা থেকে অনেক ফিরেছে, তাদের হাতেও পাঠাতে পারত।

গুপ্তেজী হাসলেন। রহস্যময় হাসি। শুধু রহস্যময় নয়, কেমন যেন করুণ দেখাল হাসিটা। বললেন, তাহলে আপনাকে একটা গল্প শোনাতে হয়। ওদের গ্রামে বছর দুয়েক আগে একটি বিদেশী ফিল্ম সোসাইটির দল তাঁবু গাড়ে। সুইডিশ পার্টি। মুরিয়া জীবন নিয়ে তাঁরা একটি ডকুমেন্টারি ছবি তোলেন। দিন পনের ওখানে থেকে, ছবি তুলে তারা যখন সদলবলে তাঁবু গুটিয়ে চলে যায় তখন ওদের গ্রামের একটি ছেলে একটা অদ্ভুত জিনিস কুড়িয়ে পেল। জিনিসটা আকারে মছয়া ফলের মতো ছোট, বাচ্চা তালশাঁসের মতো। নিঃসন্দেহে জিনিসটা জ্যান্ত, কারণ কানের কাছে ধরলে শোনা যায় ক্রমাগত কী বলে চলেছে। গাঁ-শুদ্ধ ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মদ সেটা দেখে

অবাক হয়ে গেল। রাত্রে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তার চোখ ঝলঝল করে। এটা যে সাহেবরা ফেলে গেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেমন করে ফেরত দেওয়া যায় এই হল চিন্তা। সাহেবদের পোষা জন্তু কিনা, তাই মালিককে দেখতে না পেয়ে মনের দুঃখে সেটা পরদিন মরে গেল। আর শব্দ শোনা যায় না। গাইতার পরামর্শ মতো সেই অদ্ভুত মরা জিনিসটা নিয়ে মুরিয়া ছেলেটি চলল শহর বাজারের দিকে — সাহেবদের ফেরত দিতে হবে। ছয় ক্রোশ জংলা রাস্তা ভেঙে সে এসে পৌঁছালো সদর সড়কে। জগদলপুরগামী একটা বাসের দেখা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ছেলেটি। বাসে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি গোণ্ডিভাষা বোঝেন। তাঁকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে মৃত জন্তুটা তাঁর হাতে দেয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন শহরে গিয়ে সাহেবদের খুঁজে বের করে যার জিনিস তাকে ফেরত দেবেন। ছেলেটি নিশ্চিত হল, তাহলে তাকে আর জগদলপুর পর্যন্ত যেতে হবে না। দুর্ভাগ্য বেচারীর। দিন-কয়েক পরে ওদের গ্রামে এল পুলিশ। সাহেবদের একজন একটা হাতঘড়ি ফেলে গেছে, তার খোঁজ করতে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল জিনিসটা তারা দেখেছে। ছেলেটিও অকপটে বলে গেল হারানো ঘড়ির ইতিকথা। তার গল্পের প্রথমার্ধ বিশ্বাস করল পুলিশ, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের কোন প্রমাণ না থাকায় চালান দিল ছেলেটিকে থানায়। কী কাণ্ড! চুরির দায়ে ধরা পড়ল বেচারী। অজানা অচেনা মানুষকে কেউ অমন দামী সোনার ক্রনোমিটার দিতে পারে এ কথা বিশ্বাস করা যায়! যাই হোক, অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত ছেলেটি চুরির দায় থেকে মুক্ত হয়। সেই থেকে ওরা সাবধান হয়ে গেছে। চয়ন তাই এবার আর ভুল করেনি — যার ধন তাকে নিজে হাতে দেবে বলে ছুটে এসেছে এতদূর।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম শুনে।

গুপ্তেজী বললেন, চয়ন আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছে ওদের গাঁয়ে।

—নিমন্ত্রণ? কীসের নিমন্ত্রণ?

—আমি পরশু যাচ্ছি ওদের গাঁয়ে। একটা প্রাইমারী স্কুল খোলা হচ্ছে সেখানে। সেই ব্যাপারে। চয়ন বলেছে, আপনাকে নিয়ে যেতে। যাবেন আপনি?

বললুম, আপনি কি পরশু গিয়ে পরশুই ফিরবেন?

—না, একদিন থাকতে হবে ওদের গাঁয়ে। পরের দিন যাব নারানপুরে। সেখানে মাড়াই বসছে। কোকামেটাতে দেখেছিলেন মাড়িয়াদের মাড়াই — এখানেও মাড়িয়া অনেক আসবে বটে তবে নারানপুরের মাড়াইতে মুরিয়ারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সুযোগে মুরিয়াদের মাড়াই দেখে আসতে পারেন। দিন-তিনেকের ছুটি নিয়ে দুর্গা বলে ঝুলে পড়ুন আমার সাথে।

বললাম, যাবার ইচ্ছে ষোল আনার উপর আঠারো আনা। দেখি ছুটি পাই কি না।

সেদিন আমাদের সাক্ষ্য আড্ডায় ঐ কথাই উঠে পড়ল। নারানপুরের মাড়াই। শুনলাম অনেকেই যাচ্ছেন। মেহুরা সাহেব আমাকে বললেন, যাবেন নাকি নারানপুরে? আমার স্টেশন-ওয়াগনে জায়গা হবে কিন্তু।

বললাম, ধন্যবাদ। আমার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। গুপ্তেজীর সঙ্গে যাচ্ছি আমি।

—গুপ্তেজী? কোন্ গুপ্তেজী?

—আপনাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার গুপ্তেজী।

শুভানুধ্যায়ীরা কী জানি কেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

ত্রিবেদীসাহেব বললেন, ও কি নিজেই বলেছে সে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার?

আমি বলি, কেন, তাই কি ঠিক নয়?

—আমরা তো জানি, তা নয়।

—তবে উনি কী?

—তা জানি না। আদিবাসী-উন্নয়ন বিভাগে খোঁজ নেবেন। সরকার ওদের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা স্যাংশন করছেন আর ওরাও মনের আনন্দে নতুন নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করে চলেছে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার, রিজিওনাল অফিসার, ওয়েলফেয়ার অফিসার, কোয়ার্টিনেশন অফিসার, স্পেশাল অফিসার। ভূতের বাপের শ্রদ্ধা! আপনার গুপ্তেজীও ঐ ধরনের একজন ভুঁইফোঁড়। কোয়ালিফিকেশান জিজ্ঞাসা করলে হয়তো শুনবেন কোন খদরওয়ালার ভাইপো-ভাগ্নে!

মেহুরা সারেক আমলের লোক। ব্রিটিশ বুরোক্রাসির স্তম্ভ না হলেও নাট-বলু ছিলেন এককালে। বাইরে মরচে ধরলেও ভিতরে প্যাঁচের পর প্যাঁচ। তাই রিটায়ার করলেও প্যাঁচ কষে রিএমপ্লয়মেন্ট বাগিয়েছেন। স্বাধীন সরকারের এই আদিবাসী উন্নয়নের হুজুগটাকে মনে করেন ‘আধিক্যতা’, ঐ নিগ্রো-কালো জংলীগুলোর পিছনে টাকা ঢালার অভিধা, ওঁর ভাষায় — ‘শ্রাদ সেরিমনি অফ গোস্টস্ ফাদার!’

দেখলাম মজলিসের কেউই গুপ্তেজীর প্রতি সম্ভ্রম নন। লোকটা দান্তিক, একগুঁয়ে আর অসামাজিক। কারও সাথে মেশে না। কারও বাড়ি যায় না। শুধু অফিস-বাড়ি করে। ছুটির দিনেও ছুটে যায় আদিবাসী গাঁয়ে। পড়ে থাকে ওদের ঘরে। অফিসারস্ ক্লাবের সভ্য হতে সে নাকি সরাসরি অস্বীকার করেছে। প্রথম প্রথম সামাজিক ডিনার পার্টিতে ওকে নিমন্ত্রণ করা হত; কিন্তু দেখা গেছে ওর প্রতি আর.এস.ভি.পি.-কার্ড নিক্ষেপ করার অর্থ বুঝেও ছোঁড়া। ছোট জগদলপুর শহরে গুপ্তেজীর কোন বন্ধু নেই।

—কেন? — অবাক হতে হয় আমাকে।

বক্তা পার্শ্ববর্তী মেহুরা-সাহেবকে কনুয়ের একটা গোঁতা মেরে বললেন, বলুন না স্যার, আপনার শ্যালকের ব্যাপারটা।

—বাদ দিন সেসব কথা।

বাদ অবশ্য ওঁরা দিলেন না শেষ পর্যন্ত। শুনলাম মেহরা-সাহেবের এক কালেজি শালক দগুকারণ্য দেখতে এসেছিল। কোন্ আদিবাসী জমায়েতে সে বুঝি কয়েকটি মেয়ের ফটো নেয়। গুপ্তজী দেখতে পেয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েন তার ঘাড়ে। বাচ্চা ছেলে তো, ঘাবড়ে যায় বেচারী। উনি তার ক্যামেরা কেড়ে নেন।

মেহরা বললেন, স্কাউন্ডেলটার সৌভাগ্য, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।

মনে হল, এটা যদি করে থাকেন তাহলে সত্যিই বাড়াবাড়ি করেছেন গুপ্ত সাহেব। এ তো রীতিমতো রাহাজানি! ক্যামেরা কেড়ে নেবার তিনি কে?

মিসেস মেহরা বলেন, অ্যান্ড লুক অ্যাট হিস্ চিক — আমার ভাইকে বলেছে ‘তোমার জামাইবাবুর কোর্টে আমার নামে নালিশ কর!’

বুঝলাম নালিশ করা হয়নি, তবে গুপ্তকে বয়কট করেছেন সবাই।

ত্রিবেদী বললেন, লোকটা জংলীদের সাথে দিনরাত মেশামেশি করে স্বেফ জংলী হয়ে গেছে।

মেহরা বলেন, আনকাল্চার্ড!

মিসেস আরও সংক্ষেপ করে বলেন : ব্রুট!

বললুম, যাক, যাব যখন বলেছি, তখন ধর্মে ধর্মে ঘুরি আসি!

নারানপুর থেকে ছোট-ডোঙ্গারের দিকে চলে গেছে যে বন্য-সড়ক তারই ধারের গ্রাম কাবোঙ্গা। নারানপুর অতিক্রম করে যেতে হবে। নারানপুরে নজরে পড়ল অস্থায়ী ছাপড়া তৈরী হচ্ছে হাটের জমিতে। অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। একটু দেখে আসার লোভ হল, কিন্তু গুপ্তজী রাজি হলেন না। এমনিতেই নাকি দেরি হয়ে গেছে। কাবোঙ্গাতে কাজ সেরে সেখানেই রাত্রিবাস করে কাল সকালে এখানে ফিরে আসার প্রোগ্রাম। গুপ্তজী বদমেজাজী মানুষ, তাই দ্বিতীয়বার তাঁকে অনুরোধ করার সাহস হল না। প্রথম থেকেই তাঁর অবাধ্য হওয়া কোন কাজের কথা নয়। একে তো লুকিয়ে ক্যামেরা এনেছি ব্যাগের ভিতর, তাতেই বুকটা টিপ্‌টিপ্‌ করছে! তবে নারানপুরের হাটে এক পেয়ালা চা খেয়ে নেবার অনুমতি পাওয়া গেল। জীপ থামিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম হাটের একটি দোকানে। নারানপুর তহশীলের সদর। এখানে ডাকবাঙলো আছে, তহশীলদারের দপ্তর আছে। সদ্য হয়েছে বি. ডি. ও.-র দপ্তর আর ব্লক ডেভেলপমেন্ট কলোনি। চায়ের দোকানে লোক বেশ ছিল। প্রচুর দুধ এবং প্রচুরতর চিনিসহযোগে যে পানীয়টি গলাধঃকরণ করা গেল শুনলাম তার নাম স্পেশাল চা, যদিও স্বাদে তা গরম দুধের সরবৎ! দোকানদারটি সুদর্শন। ব্যবহার অমায়িক। বছর বিশেক বয়স। হাতে দামী ঘাড়ি — গায়ে পাঞ্জাবি, কপালে ইংরেজি ইউ-অক্ষরের আকারে তিলক। মাথায় কাজ-করা টুপি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের লোক। তার দোকানে দেখলাম সুন্দর একটি ক্যালেভার টাঙানো আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি। পিছনে জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের আবছা আভাস — সামনে গুরুদেব অশান্তচিন্তে বড়লাটকে ঐতিহাসিক প্রতিবাদপত্র লিখছেন। ঘরে ঢুকতেই ছবিটি নজরে পড়ে।

চা-পানাস্তে আবার যাত্রা। নারানপুর থেকে শুরু হল কাঁচা রাস্তা। অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হল জীপের গর্ভে আমাদের উপবেশন-নৃত্য। কয়েকটা বনমুরগী আর

খরগোশ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু নজরে পড়ল না। শুধু নারানপুর থেকে মাইল পাঁচেক উজানে এসে পথের ধারে একটি মাড়িয়া যুবতীকে দেখে মনে পড়ে গেল কয়েকদিন আগেকার কথা।

সেবার মৌলানা-সাহেবের সঙ্গে যাচ্ছিলাম ছোট-কাপসির দিকে। সঙ্গে ছিল কয়েক হাজার নগদ টাকা। উদ্ভাস্তদের মজুরি মেটাতে হবে। এ রাজ্যে যদিও চলন্ত গাড়ি থামিয়ে রাহাজানি কখনও হয়নি তবু সরকারি আইন অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে চলেছে একজন বন্দুকধারী শিকারী। আমি আর মৌলানা-সাহেব বসেছিলাম পিছনের সীটে। সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল শিকারী। হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো ড্রাইভার। তন্দ্রা এসে গিয়েছিল গাড়ির দোলানিতে। চমকে জেগে উঠে দেখি সড়কের মাঝখানে একটা বিরাটাকার হরিণ। হরিণ নয়, সম্বর। অপূর্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গাড়িটার দিকে অবোধ দৃষ্টি মেলে। দূরত্ব ত্রিশ ফুটও হবে না। বাঁকের মুখে বলে এতক্ষণ আমাদের দেখতে পায়নি। বিদ্যুৎগতিতে শিকারী তুলে নিল তার রাইফেল — আমিও ঝুঁকে পড়লাম ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বার করতে। গুলি ছোঁড়ার আগেই একটা স্ল্যাপ নিতে হবে। কিন্তু দ্রুততার প্রতিযোগিতায় জয়ী হলেন মৌলানা-সাহেব। শিকারীর হাত চেপে ধরে বলেন : মৎ মারো !

ক্যামেরা ফোকাস করার আর সময় পেলাম না। ঐ ‘মৎ মারো’ শব্দটাতেই বুঝি মৃত্যুর সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল বিহুল সম্বরটার মনে। চকিতে মিলিয়ে গেল গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

নারানপুর থেকে মাইল পাঁচেক এসে ঠিক তেমনি বাঁকের মুখে এবার দেখলাম এই মাড়িয়া মেয়েটিকে। একটা কলসীতে জল নিয়ে বোধ করি সে গাঁয়ে ফিরছে। হঠাৎ আমাদের জীপের আওয়াজে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেই হরিণটার মতোই অবাক-চোখে দেখছে আমাদের দিকে। বিউটি কম্পিটিশনে প্রতিযোগী হলে মেয়েটি অবশ্য প্রাইজ পাবে না, কিন্তু তার জন্য দায়ী আমাদের সৌন্দর্যবোধ। মনে হল মহাবলীপুরম মন্দিরগাত্র থেকে মেয়েটি সদ্য নেমে এসে দাঁড়িয়েছে নারানপুরের ফরেস্ট রোডে।

গুপ্তেজীকে বলি, মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছেন ?

—করেছি, আর লক্ষ্য করেছি আপনার মুগ্ধ দৃষ্টি।

—মুগ্ধ হবার মতো রূপ কি নেই ওর ? আপনি মুগ্ধ হননি ?

গুপ্তেজী বললেন, না। নারীর রূপ ছাড়াও অরণ্যে আরও দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। আমি তাতেই মুগ্ধ।

কথাটা ভালো লাগলো না। ওঁর বক্তব্যের চেয়ে বাচনভঙ্গিটাই খারাপ লাগলো আমার। কিন্তু উনি একটু পাগলাটে ধরনের লোক, একথা জানা ছিল। তাই আর কিছু বললাম না।

কাবোঙ্গায় গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন পড়ন্ত বেলা। ছোট গ্রাম। ঢুকতেই প্রথম নজরে পড়বে বাঁ-হাতি একটা বড় তালো। বর্ষাকালে মানুষ-ভর জল থাকে। গ্রীষ্মকালে আগে শুকিয়ে যেত। গাঁয়ের মেয়ে-মদ মিলে কয়েক বছর হল পুবদিকের তাল-নিকাশী

নালাটার উপর একটা বাঁধ দিয়েছে। জলটা তাই এখন সারা বছর থাকে। গ্রীষ্মের শেষাশেষি বিঘতখানেক জল থাকে কি না থাকে। তালুওয়ের ধারেই একটা সাবুগাছ। গাঁধের নিচে ঘটুল-ঘর। ঘটুলের সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ঝকঝক তক্তক্ত করেছে মোটিয়ারীদের নিপুণ হাতের পরিমার্জনে। ঘটুল-ঘরের সামনে নয়, উত্তর-পূর্বে ছোট একটি একচালা। গ্রামদেবী তাল্লুর-মুটাইয়ের ছাপরা। পিতল অথবা কাঁসার তৈরী ছোট মাতৃকামূর্তি। এক হাতে থালা, অপর হাতে চিড়িতনের টেক্কার মত একটা দণ্ড। মাথার উপর গোলাকৃতি ছটা। পাটাতনের নিচে কাঁসার পঞ্চপ্রদীপ আর তার পাশে একটি অসংখ্য-ঘণ্টা-ঝোলানো লক্ষ্মীর বাঁপি। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাস্তারে কাঁসা-পিতলের কাজ খুব ভাল হয়। পিতল-কাঁসার নানান জাতের গহনা, টৌরি (শিঙে), খেলনা, মূর্তি দেখেছি এখানে-ওখানে। জোড়িমায়ের মূর্তি, বুলা-মায়ের মূর্তি, হস্তিস্কন্ধসমাক্রাটা মাতৃমূর্তি। কাঁসার হাতি-ঘোড়া, পিতলের লক্ষ্মীর বাঁপি, দস্তার মল কৌতুহল উদ্বেক করে। এ শিল্প মরে যেতে বসেছে। তবু যা আছে তার তুলনা হয় না।

যাক্, যা বলছিলাম। তাল্লুর-মুটাই মন্দিরকে বাঁয়ে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। তখন আমাদের আপ্যায়ন করে নিয়ে গেল। ঘটুলের সামনে পেতে দিল খান-দুই 'কাটুল' — জংলিকাঠের চৌপায়া। নিজেরা বসল মাটিতে, অথবা মাড়াঙ ঘাসের মাড়নি (মাদুর) পেতে। গুপ্তেজী দুর্বোধ্য ভাষায় ওদের সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। আমি বোকার মত বসে না থেকে স্কেচ বইটা বার করি এই মওকায়।

একটু পরে গুপ্তেজী বলেন, আমাদের এতটা পরিশ্রম ব্যর্থ হল। আবার আর একদিন আসতে হবে।

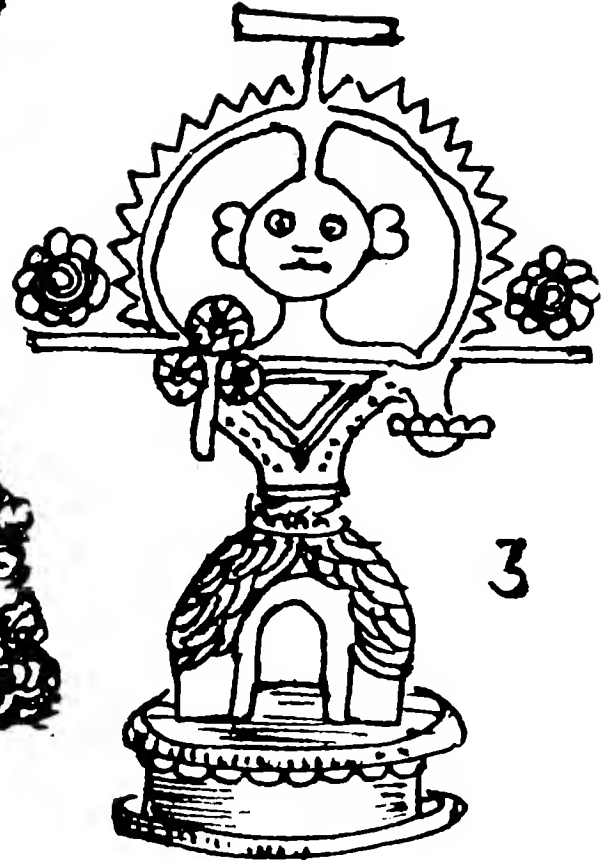
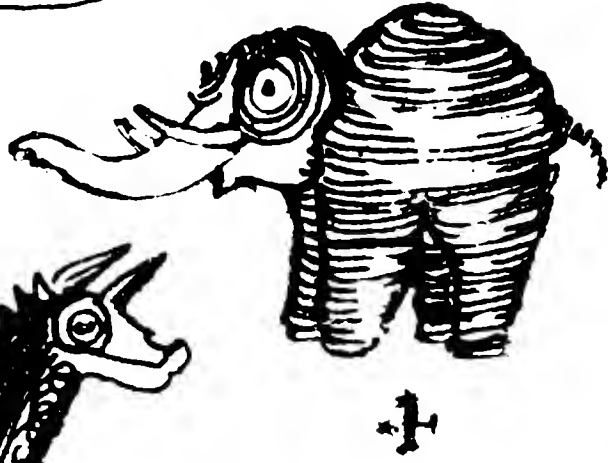
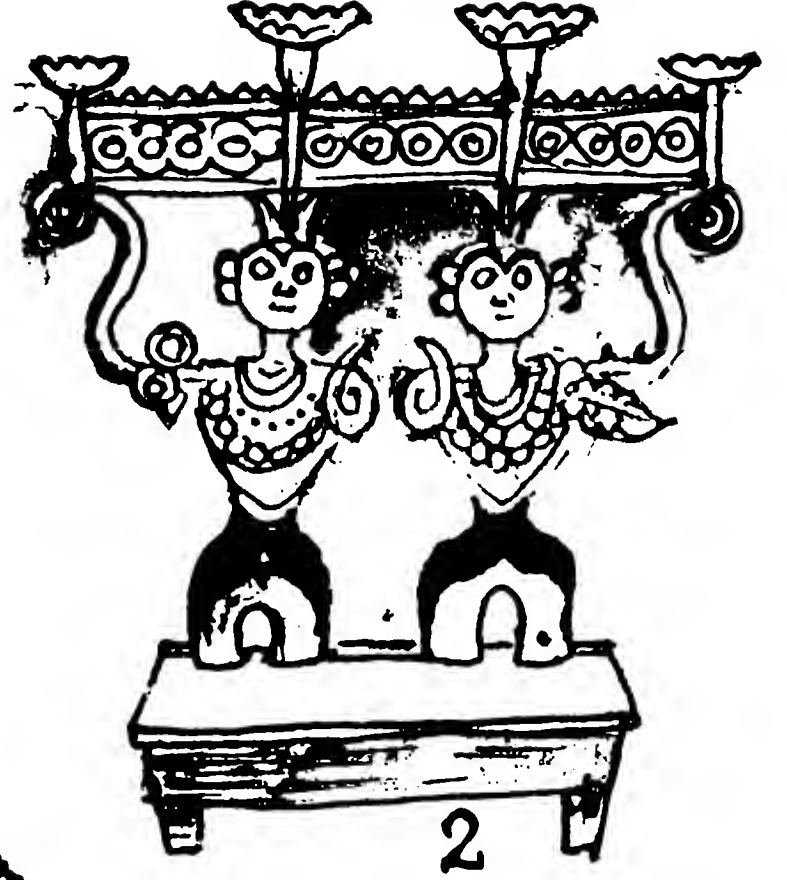
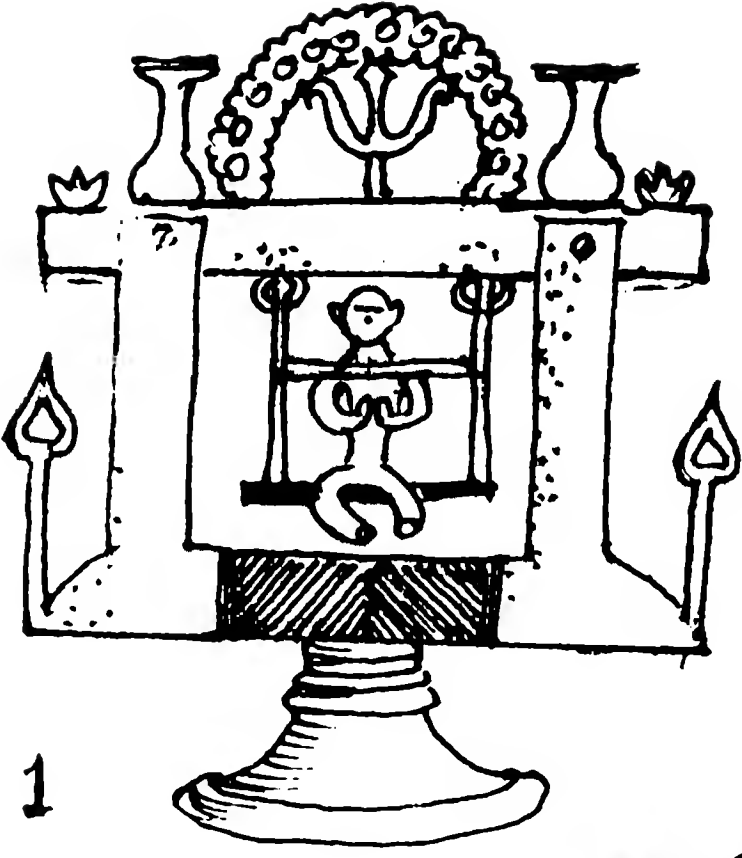
আমি স্কেচ বই থেকে মুখ না তুলেই বলি, কেন? কী হল?

—আজ এদের কারাংমেটা গ্রাম থেকে একদল চেলিক-মোটিয়ারী আসছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করার মত মনের অবস্থা ওদের নয়। আজ ওদের চৈত-দাগুর শ্রম হল।

খাতাটা বন্ধ করতে হল। বললাম, চৈত-দাগুর উৎসবটা আবার কী?

গুপ্তেজী মুরিয়াদের উৎসবের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলেন —

সাধারণভাবে বলা যায়, নারানপুর-কোণ্ডগাঁও সড়কের দক্ষিণ দিকের গ্রামগুলিতে পৌষকুলাঙ উৎসবটাই চলে বেশী। রোদ-পালানো পৌষের প্রারম্ভেই ঘটুল-দলপতিরা গাঁয়ের গাইতার সঙ্গে শলা আঁটতে বসে — কবে কোন্ দিকে এবার অভিযান চালানো যাবে। গতবছর কোন্ কোন্ গাঁয়ে আপ্যায়নটা ভালো রকম জমেছিল সে কথা স্মরণ করেবার চেষ্টা করে। সেইমত দিন সাতেকের একটা ভ্রমণের খসড়া তৈরি করা হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষ থেকেই নাচের মহড়া শুরু হয়ে যায়। পৌষকুলাঙ উৎসব খেমাল-খুশিতে নাচের হৈ-হল্লা নয়। এর সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ আছে। সূরে ভুল গেলে, নাচের তালে ছন্দপতন হলে দেবতা রুষ্ট হন। পৌষকুলাঙ দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত উৎসব। ঘটুলের বাইরের প্রাঙ্গণে দিন সাত-দশ দিবারাত্র অভ্যাস করে নাচ আর গান, তালে-তালে পা ফেলার কাহুদা।



বাস্তারের ধাতু শিল্প — ১। বুলা মাসি ২। জোড়ি মাসি ৩। তাল্লুর মুটাই ৪। পিতলের হাতি।
৫। লক্ষ্মীর ঝাঁপি ৬। পঞ্চপ্রদীপ ৭। ঘোড়-সওয়ার ৮। তৈরী মল।

বৈষ্ণবের কাছে কীর্তনের যা দাম, মুসলমানের কাছে আজান-ধ্বনির যা মূল্য, রোমান-ক্যাথলিকের কাছে গির্জার সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীতের যা অর্থ — মুরিয়ার কাছে নাচ আর গানের আবেদন তার চেয়ে এক তিল কম নয়, বোধ করি বেশী। আনন্দকে উপলব্ধি করতে পারলে জাগতিক ভয় থেকে যে মুক্তি পাওয়া যায় — এ কথা কেমন করে জানি জানতে পেরেছে মুরিয়া সমাজ। শুধু যে জানে তা নয়, মানে। দেবপূজায় ওরা কানন থেকে ফুল তোলে না, ফলের সন্ধানে ফেরে না, কলস ওদের শূন্য — ওদের শুধু তনুতনুতে বাঁধনহারা, বন্দনা ওদের ভঙ্গিতে আর সঙ্গীতে। শুধু দেবপূজায় নয়, জীবনযাত্রার সব কাজেই ওরা নাচে আর গায়। শিকারে যাবার আগে নাচে, বিবাহ-বাসরে নাচে, আনন্দে নাচে — এমনকি, হ্যাঁ দুঃখেও নাচে! ঘটুলের কোন সভ্য অথবা সভ্যাকে যদি শাস্তি দেওয়া হয় — এক পায়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তা হলে দণ্ডভোগের মেয়াদটাকে ওরা দণ্ড-পল-ঘণ্টা-মিনিট দিয়ে প্রকাশ করে না! প্রকাশ করে নাচের ভাষায়! বলে, দুই রেলো দাঁড়িয়ে থাক্ একপায়ে!

অপরাধী যখন এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে তখন তার বন্ধু-বান্ধবীর দল বিষাদখিল্ল বদনে নাচতে শুরু করে ‘রেলো-রেলো’ নাচ। ওদের মুখ ম্লান, চোখে জল, সমবেদনায় ওদের বুকের ভিতরটা গুমরে মরে, তবু তালে তালে পা ফেলে ওরা নেচে চলে নিয়মমায়িক। দুই প্রস্থ ‘রেলো-রেলো’ নাচ শেষ হলে অপরাধীর শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে!

নাচতে ভালবাসে সবাই। সব জাতের মানুষই। নাচতে যে জানে না সে-ও লটারিতে হঠাৎ টাকা পেলে হয়তো বেতালা নেচে নেয় কয়েক পাক। কিন্তু নাচ আর গানকে এমন ওতপ্রোতভাবে জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে আর কোন জাত পেরেছে বলে শুনিনি। নাচের তালে ভুল হওয়া, গানের সুরে বেসুরো তান — মুরিয়া সমাজের অমার্জনীয় অপরাধ।

যাত্রার পূর্বদিন সন্ধ্যায় ওরা ঘটুলের সামনে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালে। সেই ক্যাম্প-ফায়ারের আলোয় ঘুরে ঘুরে নাচে চেলিক মোটিয়ারীর দল। জোড়ায় জোড়ায়, সারিতে-সারিতে, সামনে-পিছনে, ঘুরে-ফিরে। অভিযানের পূর্বসন্ধ্যার এ নাচকে বলা যেতে পারে ড্রেস-রিহাসাল। পরদিন যাত্রা, তাই বেশী রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে না ওরা। এক প্রহর রাতেই নাচের আসর ভেঙে যায়। শয্যাগ্রহণ করে সবাই। পরদিন অতি প্রত্যুষে ওদের কয়েকজন পাণ্ডা আসে অগ্নিকুণ্ড পরীক্ষা করতে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিবে যাওয়া ছাইয়ের গাদায় কোন নিশাচর প্রাণীর পায়ের ছাপ পড়েছে কি না। যদি কোন রাত্রিচর প্রাণী অথবা পথভুলো মানুষ ছাইগাদায় এসে থাকে, যদি পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তা হলেই সর্বনাশ! তখন ছোট্ট গাইতার কাছে। গাইতা, শিহারা আর গুণিয়া পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে বলে তার অর্থ কী? অর্থ আর কী? দেব লিঙ্গোপেন ওদের বারণ করেছেন অভিযানে বার হতে। সতর্ক করে দিচ্ছেন: যাত্রা অশুভ। ফলে অভিযান স্থগিত রাখতে হয় কিছুদিনের জন্য। ছাইগাদায় নিশাচর প্রাণীর পায়ের ছাপ হচ্ছে ওদের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গুপ্ত-সংকেত

— ত্র্যহস্পর্শ। ফলং যাত্রা নাস্তি !

আর যদি ছাইগাদা অবিকৃত থাকে তা হলে ‘মঙ্গলে উষা বুধে পা !’

লিঙ্গোপেন হচ্ছেন মুরিয়া সমাজের আদি এবং আদর্শ পুরুষ। পুরুষ নয়, পুরুষোত্তম। শ্রীরামচন্দ্র, রামদাসজী অথবা শ্রীকৃষ্ণ মহাকাব্যের পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরে স্থায়ী আসন পেতেছেন, দেব লিঙ্গোপেনও তেমনি ওদের লোকগাথা ছেড়ে দেবতার আসনে উঠে বসেছেন প্রতিটি মুরিয়ার মনের মন্দিরে। তা সেই লিঙ্গোপেন এই পৌষকুলাঙ উৎসবের জনক। তিনিই প্রথম কুলাঙ অভিযানে বার হয়েছিলেন নিজ ঘট্টলের চেলিকদের দলপতি হয়ে। চেলিক দলের আগে চলেছিলেন তিনি, সঙ্গে ইয়া এক কেঁদো পোষা বাঘ। তা সকলের তো আর পোষা বাঘ থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। কী করবে ? এদিকে নিয়মও মেনে চলা চাই। তাই এখন দলপতি বাঘের বদলে সঙ্গে নিয়ে চলে একটা পোষা কুকুর। তার গলায় বেঁধে দেয় একটা ঘণ্টা। অভিযানের সময় প্রতিদিন ওরা পংক্তি ভেজনে বসলে সবার আগে দলপতি সেই কুকুরকে দেয় তিন মুঠি ভাত। কুকুর খাওয়া শুরু করলে তখন সবাই খেতে শুরু করে।

যাত্রার দিন সকালে চেলিক-দল গাঁয়ের গাইতার বাড়ির সামনে সমবেত হয়। এখানে সদলবলে ওরা ‘কাঠিনাচ’ নাচে। তারপর গাইতাকে সঙ্গে নিয়ে আসে ঘট্টল প্রাঙ্গণে। সেখানে দ্বিতীয় দফা নাচ। গ্রাম-সীমান্তে এসে তৃতীয় দফা নাচ শেষ হলে গাইতা মাটির ওপর একটা দণ্ডী কেটে দেয়। তার উপর রাখে সাতটা কুশের আংটি, সাতটা তীর আর সাত মুঠি চাল। কেন ? নিয়ম যে ! ছেলেরা একে একে লাফ দিয়ে পার হয়ে যায় সেই গণ্ডী। এই গণ্ডী অতিক্রম করার অর্থ হল অভিযান এবার শুরু হল। উৎসবেরও শুরু হল এই সাথে। এই মুহূর্ত থেকে গ্রামে ফিরে আসা ইন্তক অভিযাত্রীদের সম্পূর্ণ সংযম মেনে চলতে হবে। এই সাতদিনে চেলিকরা কোন মোটিয়ারীর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না। না নিজের গাঁয়ের, না ভিন গাঁয়ের।

পৌষকুলাঙে অভিযানের বিধিনিষেধ ভারি কড়া। একচুল নড়চড় হবার উপায় নেই। এ তো আর খেয়ালখুশীর আনন্দ-উৎসব নয়, এ যে দেবতার নামে নাচ। পৌষকুলাঙ অভিযানে যায় শুধু ছেলেরাই — মেয়েরা পড়ে থাকে গ্রামে।

চৈতদাণ্ডার উৎসবে কিন্তু ধর্মের আমেজটা কম। আনন্দই যেন তার মূল উৎস। চৈতদাণ্ডার উৎসবে তাই বিধি-নিষেধের কড়াকড়িটাও কম। পৌষকুলাঙের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব বেশী। এ ক্ষেত্রেও ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে গ্রাম থেকে সাত-দশ দিনের মতো। সেজে-গুজে নেচে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামে। আশ্রয় নেয় ভিন গাঁয়ের ঘট্টলে। ‘দাণ্ডার নাচ’ বা কাঠি-নাচটাই চলে বেশী। যাত্রার আগে ওরা দল বেঁধে আসে গ্রামদেবীর কাছে। তাকে কিছু মধুক উৎসর্গ করে বলে : হে মাটিমাল, হে তাল্লুরমুটাই, তোমার নাম নিয়ে আমরা যাত্রা করছি, আমরা অবোধ শিশু। তুমি আমাদের বিপদে-আপদে রক্ষা কর।

তারপর আসে গাইতার বাড়ি। গাইতা তার বাড়ির সামনে গর্ত খোঁড়ে — তার মধ্যে ফেলে দেয় একটা কুশের আংটি। পুঁতে দেয় শিমুলের একটা চারা — মাটি

চাপা দেয়। দেব ভীমুল পেনের নামে কিছু মছ্যা উৎসর্গ করে। গাইতার অনুমতি নিয়ে তারপর ওরা বেরিয়ে পড়ে।

পৌষকুলাঙ আর চৈত-দাণ্ডার উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে সদ্ভাব রাখা, ভাবের আদান-প্রদান করা। মুরিয়া সমাজের বাইরে থেকে কোন আক্রমণ এলে যাতে ওরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করতে পারে, তাই এভাবে ছেলেমেয়েরা আত্মনির্ভর হতে শেখে।

পৌষকুলাঙ উৎসবের সঙ্গে চৈত-দাণ্ডারের সবচেয়ে বড় বৈসাদৃশ্য হচ্ছে, প্রথমটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তাতে শুধু ছেলেরাই অংশ নিতে পারে, মেয়েরা নয়। অপর পক্ষে চৈত-দাণ্ডার হচ্ছে অনেকটা আমাদের রঙ-দোলের মতো। মূলসূরটা ধর্মের হলেও আনন্দ উৎসবটা গৌণ নয়। তাই চৈত-দাণ্ডারে শুধু ছেলেরা নয়, ছেলেমেয়ে একই দলে অভিযানে বের হয়। পৌষকুলাঙ উৎসবের সাতদিন কোন চেলিক কোন মোটিয়ারীর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না। ধর্মের নিষেধ। চৈত-দাণ্ডারে সে নিষেধ নেই। চৈত-দাণ্ডারে শুধু নিজ দলের নয়, ভিন গাঁয়ের কোন মোটিয়ারীর সঙ্গেও ওরা মিতালী করে, মন দেওয়া-নেওয়া করে, সুযোগ হলে হয়তো আরও কিছু করে। বাধা নেই। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আমরা যেমন স্বল্প পরিচিতা কিংবা সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ের মুখে রঙ লাগাতে পারি, তাতে, অন্তত একবেলার মত সামাজিক অনুশাসন চোখ বুজে থাকে — ওদেরও তেমনি এ উৎসবটা বাঁধনছেঁড়া! তফাত শুধু যে, আমরা রঙ-দোলের পরদিন খবরের কাগজ খুলে দেখি, সভ্য শহরে মানুষ এই উৎসবের সুযোগে একাধিক ক্ষেত্রে শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। জোর করে রঙ দিতে গিয়ে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, তাদের ব্লাউজ টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের কাঁদানো হয়েছে। অসভ্য মুরিয়াদের মধ্যে সেটা দেখা যায় না। মোটিয়ারীদের ওরা কাঁদায় না — বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজনই হয় না। মেয়েরা স্বেচ্ছায় ধরা দেয় — যেখানে না দেয় ওরা সেখান থেকে সরে আসে অন্য কারও কাছে। শৃঙ্খল যদি না থাকে তা হলে উচ্ছৃঙ্খলতা শব্দটা অভিধানে ঠাই পায় না যে। ভদ্রতার মুখোশ যারা পরে নেই দিবারাত্র, মনের আদিম পশুটাকে যাদের আড়াল করে রাখতে হয় না দৈত্য হাতির পদার আড়ালে, তাদের আবার স্বরূপ বেড়িয়ে পড়ার ভয় কিসের? প্রকৃতি নিত্য সাজে নানান সাজে — সে সাজে আর যাই থাক, ন্যাংটো হয়ে পড়ার ভয় অন্তত নেই।

পৌষকুলাঙ আর চৈতদাণ্ডারের আর এক রূপান্তর হচ্ছে দেওয়ালী উৎসব। আশ্বিন-কার্তিক মাসে হলেও এর সঙ্গে হিন্দু উৎসব দেওয়ালীর কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। দেওয়ালী সচরাচর শুক্লপক্ষেই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শুধু মেয়েরাই দল বেঁধে বার হয় অভিযানে। ছেলেরা পড়ে থাকে গ্রামে। অর্থাৎ ব্যবস্থাটা পৌষকুলাঙের বিপরীত অবস্থা। যাত্রার পূর্বদিন গাঁয়ের চেলিকদল মেয়েদের একটা ভোজ দেয়। সান্ধ্য খানা-পিনার পরদিন গাইতার অনুমতি নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ে পিকনিকে — কিংবা বলা যেতে পারে হাইকিঙে। বেলোসার নেতৃত্বে। বেলোসা হচ্ছে মোটিয়ারীদের নেত্রী। ঘটুনের মক্ষিরানী। পৌষ-কুলাঙে ছেলেদের যত বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়,

দেওয়ালী উৎসবে মেয়েদের অতটা মানতে হয় না। পৌষকুলাঙে মাদকদ্রব্যের ব্যবহারটা কম, ক্ষেত্রবিশেষে একেবারে বারণ। চৈত-দাণ্ডার অথবা দেওয়ালীতে সান্ধ্য মজলিশে রঙের নেশায় ওরা রঙিন হয়। অজানা গাঁয়ে অচেনা মেয়ের সঙ্গে মিতালী করতে হলে মধুকের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করবে? অপরিচয়ের রুদ্ধ-দুয়ার খুলবার ঐটিই তো চাবিকাঠি।

মুরিয়া রাজ্যের পূর্বসীমান্তে, অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ের পূর্বদিকে যে অভিযান-উৎসব প্রচলিত তার নাম ‘হুলকী’। এর সঙ্গে চৈতদাণ্ডার উৎসবের খুব একটা ফারাক নেই। এক্ষেত্রেও ছেলেমেয়েরা একদলে—

আমার এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। বাধা দিয়ে বলি : গুপ্তেশাহেব, এবার আপনার ব্যাখ্যা থামান। সঙ্গে হয়ে এল যে, চলুন গ্রামটা দেখে আসি অন্তত। রাত্রে থাকব কোথায়? এখানে?

গুপ্তেশাহী বললেন, এই ঘটলেই রাত কাটার ভেবে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তা হবে না। চলুন নারানপুরেই ফিরে যাওয়া যাক। ডাকবাঙলোতে জায়গা না হলেও সেখানে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে।

বললাম, কেন এখানে অসুবিধাটা কী?

—আহ্ ভারি মুশকিলে ফেললেন তো আপনি। এখানে শুনছেন কারাংমেটা থেকে দল আসছে। এখানে থাকব কোথায়?

সভ্যজগতের অতিথি গ্রামে এলে তাকে থাকতে দেওয়া হয় ঘটলে। সে রাত্রে মেয়েরা ঘটলে শোয় না। নাচ-গান সেরে যে যার বাড়ি যায় রাত দশটা নাগাদ। কিন্তু আজ এখানে তিনগাঁয়ের ছেলেমেয়েরা আসছে। আমাদের থাকা মানেই মেয়েদের অন্যত্র থাকতে হবে। সেটা অভ্যন্ত অন্যায় হয়। সুতরাং স্থির হল আমরা আরও মাইল দশেক ভাঁটিয়ে নারানপুরে ফিরে গিয়ে রাত কাটার। আমি কিন্তু প্রথমেই বলে রাখলাম, গেলেও রাত দশটার আগে নয়। চৈতদাণ্ডার নাচ না দেখে পাদমেকং ন গচ্ছামি।

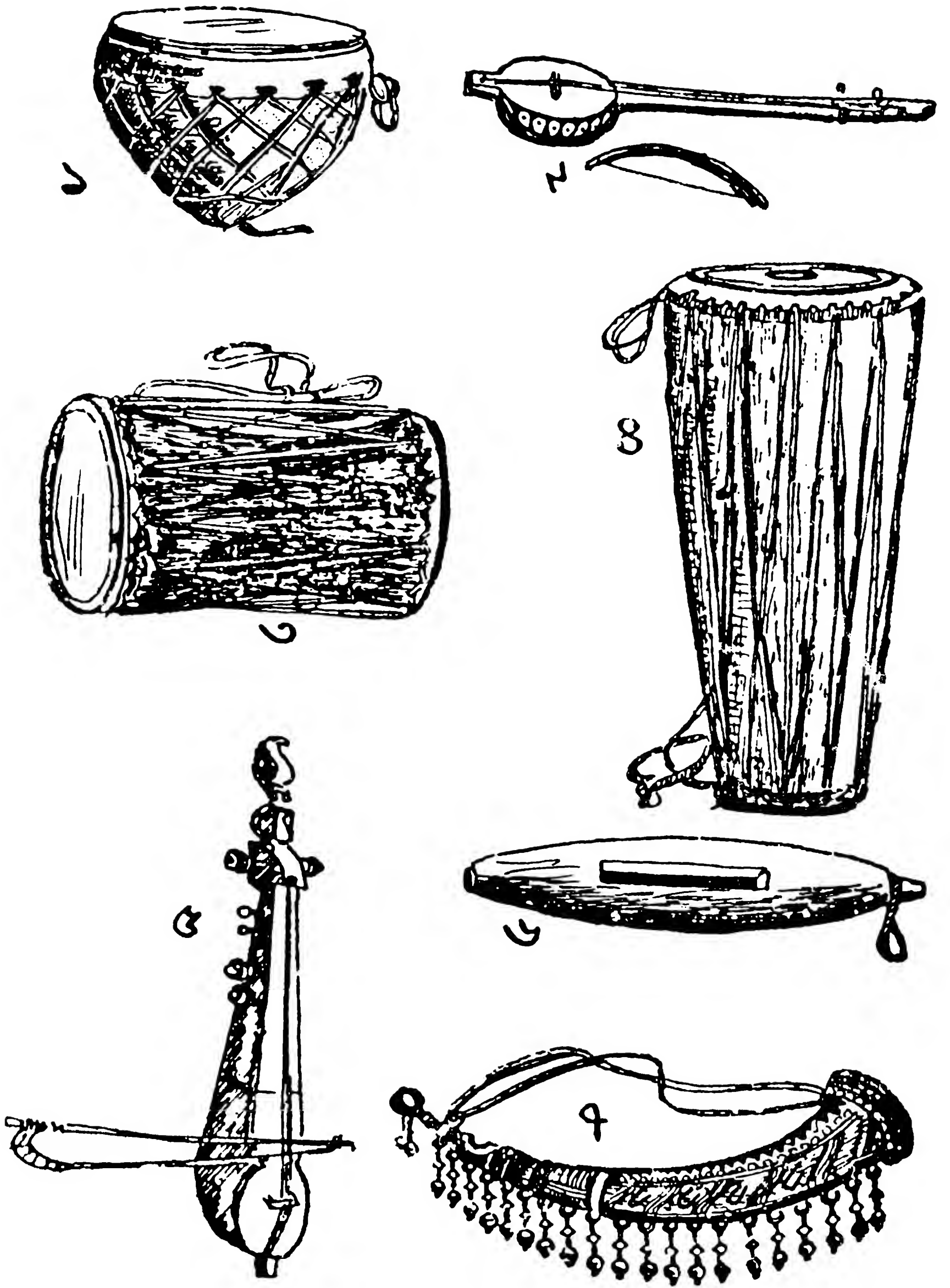
গুপ্তেশাহী বললেন : অগত্যা।

এই সময় কয়েকটি মুরিয়া ছেলেমেয়ে দল বেঁধে এল ঘটলে। দুর্বোধ্য ভাষায় কী-সব আলাপচারী শুরু হয়ে গেল।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি ঘটল ঘরখানাকে। লম্বায় চৌদ্দ হাত, চওড়ায় আট-নয় হাত। বেশ বড়। মোটা শালখুঁটির বেড়া দেওয়া প্রাঙ্গণ। ঘরের চালসাঙা থেকে ঝুলছে নানা বাদ্যযন্ত্র। সদ্য চিনতে শিখেছি সেগুলি। স্কেচ বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম। বৃহদায়তন মান্দ্রি ঢোল, টুড্রা ঢোল, পারাং ঢোল, গোলা ঢোল। এ ছাড়া আরও কত বাদ্যযন্ত্র। পিটাকোঁ, কেকরে, ধুশীর। একদিকে সার দেওয়া তীরডুর বা দাণ্ডার, ঝুমুর লাগানো।

কোথাও কিছু নেই, একটা ন্যাংটো বাচ্চা ছেলে এসে ইরিং-বিরিং করে কী যেন বললে। মনে হল খুব উত্তেজিত সে। বলেই বেরিয়ে গেল ছুটে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে সবাই পিছু নিল তার।

আমি বলি, কী ব্যাপার?



মাড়িয়া ও মুরিয়াদের বাদ্যযন্ত্র

(১) গোগো ঢোল, (২) ধুলীর, (৩) পারাং ঢোল, (৪) মান্দ্রি ঢোল, (৫) সারেঙ্গি, (৬) পিটাকো, (৭) টোরি।

—শিগগির বাইরে আসুন।

অগত্যা দলের পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম আমরাও। ঘট্টলের পাশেই তালাও। তার ধারে একটা সাবুগাছ। তার উপর উঠেছে একটা নেংটিসার ছেলে। গাছের ওপর থেকেই হাত পা নেড়ে কী যেন বলছে উত্তেজিত হয়ে।

আবার বলি, কী বলছে ও?

—গাছের উপর থেকে ও দেখতে পেয়েছে কারাংমেটার দল এগিয়ে আসছে। ওরা এসে গেল।

আমি বলি, তা আসুক। কিন্তু ও হতভাগাকে নেমে আসতে বলুন। গাছের উপর থেকে যেভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে, পড়ে মরবে এম্ফুনি।

গুপ্তে বলেন, বাঁদরের বাচ্চা কখনও গাছ থেকে পড়ে মরে না!

একটু পরেই দেখা গেল ওদের। কারাংমেটার চেলিক মোটিয়ারীদের। জনাদশেক চেলিক আর জনা-আষ্টেক মোটিয়ারী। চেলিকদের মাথায় পাগড়ির উপর পাখির পালক, গলায় চিক, কাঁধে টাঙি — কারও হাতে তীরধনুক, কেউ বয়ে আনছে বাদ্যযন্ত্র। মোটিয়ারীরাও সেজেছে। খোঁপায় জড়িয়েছে কড়ির মালা, মাথায় দিয়েছে পুঁতির টায়রা, হাতে তীরডুরি, গলায় নানান জাতের মালা — তিয়া-মালা, সুটা-মালা, মায় রূপেয়া-মালা! এরা মাড়িয়াদের মতো আকাটমুখ্য নয়, টাকা চেনে। টাকা আবার তিনজাতের তা জান'তো? বেলোসা-টাকা, টেকো-টাকা আর দাড়ি-আলা টাকা! টাকার এই শ্রেণী বিভাগ যে লোকটি আমাকে শিখিয়েছিল সেই অর্থশাস্ত্রের সুপণ্ডিত মুরিয়া বৃদ্ধটি তিনজাতের টাকার মুরিয়া প্রতিশব্দও বলেছিল আমাকে। নোটবইতে টুকে রাখতে ভুলেছি। একমাত্র বেলোসো-টাকা নামটা মনে আছে — মহারাণী ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার এবস্থিধ নামকরণ বিচিত্র মনে হয়েছিল বলে। লোকটি বলেছিল, এ ছাড়াও অবশ্য টাকা আছে—কিন্তু তার আভিজাত্য নেই — তা গাঁথে কেউ গলায় পরে না — সেগুলি নেহাৎ দিশি টাকা!

এ ছাড়া লক্ষ্য করলাম, মেয়েদের মাথায় নানান জাতের কাঠের কাঁকুই। আমাদের দেশে আগেকার দিনে মেয়েরা খোঁপার মাঝখানে চিরুনি দিত। সোনার চিরুনি। দেড়ভরির গুরুভার সে চিরুনির উপর লেখা থাকত গুরুতর উপদেশ — ‘পতি পরম গুরু’। ভেবেছিলাম যে, চিরুনির যুগ গেছে বৃষ্টি। কিন্তু আধুনিকারা দেখি অনেক কিছু প্রাচীন প্রসাধনকে চেঁছেছুলে নতুন করে চালু করছেন। খোঁপায় চিরুনি দেবার হাল-ফ্যাশান্ চালু হয়েছে। সোনার দাম হয়েছে গুরু, পরমগুরুর পকেটের ভার হয়েছে লঘু — ফলে দেড়ভরি দাঁড়িয়েছে স-পাঁচ আনায়। সাতদিনেই সে চিরুনি তুবড়ে যায়! ‘পতি পরম লঘু’ কথাটা সত্য হলেও শ্রুতিকটু — তাই হাল ফ্যাশানের চিরুনিতে কিছুই লেখা হয় না দেখি।

মুরিয়া মেয়েদের চিরুনি সোনার নয়, রূপার নয়, কাঠের। বিচিত্র তার গড়ন। আর সবচেয়ে মজা একখানা চিরুনি কেউ পরে না। এক একজনে পাঁচ-সাতখানা কাঠের কাঁকুই গুঁজেছে মাথায়।

এইখানে জনান্তিকে একটা গুড় সংবাদ দিয়ে রাখি। মোটিয়ারীরা কাঠের কাঁকুই

পরে, কিন্তু তারা সেগুলি হাটে-বাজারে কেনে না। নিজেরাও বানায় না। অথচ কাঁকুই হচ্ছে কুমারীত্বের চিহ্ন। বিবাহিত মেয়েরা কাঁকুই দেয় না মাথায়। সিঁদুর যদি হয় বাঙালী হিন্দু মেয়ের বিবাহিত-জীবনের পরিচায়ক, তবে মুরিয়া জনপদবধূর তা হচ্ছে না-কাঁকুই মাথা। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কুমারী মেয়েরা কাঁকুই পায় কোথায়? এ প্রশ্নটা অবৈধ। সেই অবৈধ প্রশ্নের গোপন উত্তরটা শুনেছিলাম একজনের কাছে। কুমারী মেয়েকে ঘটুল-বন্ধু কাঠের কাঁকুই উপহার দেয়। যার মাথায় যত কাঁকুই, বুঝতে হবে তার তত প্রেমিক! ঠিক তা নয় অবশ্য। একই চেলিক তার প্রিয় মোটিয়ারীকে একাধিক কাঁকুই উপহার দিতে পারে। উৎসবের দিনে সেগুলি ওরা মাথায় পরে। বিয়ে স্থির হলে ঘটুল-বন্ধুকে কাঁকুই ফেরত দিয়ে যাবার রেওয়াজ আছে। কাঁকুইগুলি অধিকাংশই সাধারণ কাঠ চেঁছে বানানো। দু-একটাতে কিছু কারুকার্যও আছে। কিন্তু কারুকার্যটা এখানে বড় কথা নয়, বড় কথা আন্তরিকতা। তার উপকরণ সামান্য, পাখির বাসায় খড়কুটোর মতোই অকিঞ্চিৎকর — ‘চলতি মুহূর্তের খসে-পড়া উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা! তার মূল্য ছিল তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে’।

শুনলুম কোন কোন মোটিয়ারী আবার কুমারী-জীবনের ঐ স্মৃতিটুকু লুকিয়ে নিয়ে যায় স্বশুরঘরে। আধুনিকারা যেমন প্রাক-বিবাহ জীবনের দু-একটি দরদভরা চিঠি প্রাণেধরে ছিঁড়ে ফেলতে নারাজ। স্বামী যখন যায় শিকারে, কিম্বা খেতে-খামারে, প্রৌঢ়া মোটিয়ারী তখন ঝাঁপি খুলে বার করে সেই নগণ্য কাঠের কাঁকুই। জল আসে চোখে। ওরাও কি ভাবে — ‘এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের প্রথম দরদ, এর মধ্যে আছে তার জাদু। এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে। এর মধ্যে আছে তার বেগ। আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন তোমার নাম পড়বে বাঁধা তার হঠাৎ তানে’?

আগন্তুক দল কাছাকাছি এলে এরা সবাই ‘জোহার’ করে। ওরাও প্রতিজোহার করে। কাবোঙ্গার শিরদার ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ওরা প্রথমেই যাবে গাইতার বাড়ি। সেটাই নিয়ম। কাবোঙ্গা গাঁয়ের গাইতা গাদরু গোণ্ডের বাড়ি ঘটুলের অদূরে। বেশি দূর যেতে হল না। সাড়া পেয়ে গাদরু বেরিয়ে আসে। ওরা আবার অভিবাদন করে, অর্থাৎ জোহার করে। নামিয়ে রাখে ওদের সব সম্পদ গাদরুর সামনে। শরণ নেবার ভঙ্গিতে। তারপর শুরু হয় আগন্তুক দলের নাচ। এটাও নিয়ম। প্রথম নাচ গাইতার বাড়ি, দ্বিতীয় নাচ গাঁওদেবীর ছাপরায়, তৃতীয় নাচ ঘটুলে। ওরা নাচলে রেলো-রেলো নাচ:

মুলির মুলির ইন্টোনি কারি গুতি।

আগা বাগা দা মুলির কারি গুতি॥

গাদরুর বাড়ির সামনেটায় সারা গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে। গাদরুকে খুব গম্ভীর দেখায়। ভাবখানা, যেন সমস্ত দায়িত্বটা এখন তার। কোমরে হাত দিয়ে লক্ষ্য করে ঠিকমতো ওদের তালে তালে পা পড়ছে কি না। না, নিখুঁত ওদের নৃত্যভঙ্গি। বেশিক্ষণ ওরা নাচল না, পথশ্রমে এমনিতেই সকলে ক্লান্ত ছিল। গাদরু ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গাঁওদেবীর ছাপরায় — তাল্লুর-মুটাই মন্দিরে। সেখানে দেবী প্রণাম সেরে

ওরা এল ঘট্টলে। গাদরু বিবাহিত — ঘট্টলে সে ঢুকল না। ঘট্টলের দরজায় ওদের পৌঁছে দিয়ে, স্থানীয় শিরদার চ্যনের উপর দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

এবার শুরু হল পরিচয়। কারাংমেটার শিরদার তার ঘট্টলের চেলিক, মোটিয়ারী দলের প্রত্যেকের নাম বলল, গোত্র জানাল। পৈত্রিক নাম নয়, ঘট্টল-দত্ত উপাধি। ঘট্টলে পিতৃদত্ত নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ নেই। সেখানে প্রত্যেকে একটা করে নাম পায়। ঘট্টলের বাইরে সে নামে ডাকা বারণ। গোত্র উল্লেখ করার একটা গুঢ় তাৎপর্য আছে। আগন্তুক দলের কেউ যদি এই মওকায় জীবন-সঙ্গিনী বেছে নিতে চায় তবে তারা এই সুযোগে চিনে রাখুক কে কে তার ‘আকোমামা’ আর কে ‘দাদাভাই’। যে গোত্রের সঙ্গে বিবাহ সম্ভব তারা হচ্ছে আকোমামা, আর যারা সগোত্র তারা দাদাভাই।

কারাংমেটার শিরদারও বলিষ্ঠগঠন তবে চ্যন-শিরদারের মতো সুন্দর নয়। কাবোঙ্গা ঘট্টলে শুনলাম বেলোসা নেই, কিন্তু আগন্তুক দলের ঘট্টলরাজ্যে রাজা-রানী দুই-ই আছে। ওদের বেলোসাকে দেখে কেমন যেন খট্কা লাগল। এমন মেয়েও থাকে নাকি মুরিয়া গ্রামে?

গুপ্তেজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্বযুদ্ধে এসব অঞ্চলে কোন মিলিটারী ছাউনি পড়েছিল?

গুপ্তেজী একটু অবাক হয়ে বললেন, হঠাৎ এ কথা কেন?

বললাম, গত বিশ্বযুদ্ধের শেষাশেষি যদি কোন মেয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে আজ সে সপ্তদশী বা অষ্টাদশী। কারাংমেটার ঐ বেলোসার বয়স কত হবে আন্দাজ করেন আপনি?

গুপ্তেজীর অদ্ভুত ভাবান্তর হল একথায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মেয়েটির দিকে। তার রেশমের মতো চুল, পিঙ্গল-চোখ আর কটা রঙের তনুদেহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি যা ইঙ্গিত করতে চাইছেন তা খুবই স্বাভাবিক হত, কিন্তু আমি যতদূর জানি এ তল্লাটের দু’তিনশ মাইলের মধ্যে কোন মিলিটারী ছাউনি ছিল না।

বললাম, তাহলে?

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন উনি: তাহলেই বা কী! সভ্য জগতের মানুষের অসাধ্য কাজ আছে? আমরা সাগরের তলায় যেতে পারি মুক্তোর খোঁজে, এভারেস্ট চড়তে পারি অহেতুক, মহাকাশের রহস্য ভেদ করতে পারি — আর জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে পারব না?

চমকে উঠলাম ধমক খেয়ে। যেন আমিই অপরাধী!

উনি বলে চলেন, এখান থেকে অনেক আদিবাসী মেয়েকে আসামের চা বাগানে চালান করেছে আড়কাঠিরা। এমন হতে পারে ঐ মেয়েটির মাও অমনি একজন হতভাগী। চা বাগানের কোন সাহেবের কুকীর্তি বয়ে এনেছে এ অরণ্যে!

হঠাৎ সকলে সমন্বরে হেসে ওঠায় আমরা এ আলাপ বন্ধ রেখে ঘনিয়ে আসি। এতক্ষণে দুপক্ষই আত্মপরিচয় দেওয়া শেষ করেছে। কী কথায় হাস্যরোল উঠেছিল

বুঝলাম না। চয়ন জবাবে বললে, না, বেলোসা নেই আমাদের ঘট্টলে।

ওর ঠিক সামনেই দাঁড়িয়েছিল সেই মেয়েটি। কারাংমেটার বেলোসা। রঙিনা। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল আবার। তারপর হঠাৎ হাত দুটি মাজায় রেখে গান গেয়ে উঠল সুরেলা কণ্ঠে :

বারাং সারপার্শ্বে উদিতম সায়দার
বাদেঙ্কে ইসে উদিতন ?
বেলোসাকে ইসে উদিতন,
হা দাদা সায়দার ॥

হাহা করে হেসে উঠল কারাংমেটা গাঁয়ের ছেলেমেয়ের দল।

চয়ন শিরদারের উজ্জ্বল সপ্রতিভতা একফুঁয়ে নিভে গেল যেন। মুখটা বেগুণী হয়ে উঠল। উচিত মতো জবাব জোগালো না তার কণ্ঠে। বসে পড়ল বেচারি। আবার হাস্যরোল উঠল ও-পক্ষে। হাসবেই তো! এক নম্বর হার হল যে কাবোঙ্গার।

কারাংমেটার শিরদার বললে, হায় হায়। তা আমরা আর কী করতে পারি বল? একরাতের জন্য এসেছি তোদের ঘট্টলে, একটি রাতের জন্য আমার বেলোসাকে ধার দিতে পারি — দেখ, যদি তোর পছন্দ হয়!

বলে, রঙিনাকে ঠেলে দিলে চয়নের দিকে। চয়ন সসঙ্কোচে সরে বসল। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল কারাংমেটার বেলোসা সেই ফর্সা মেয়েটি, রঙিনা যার নাম। চয়নকে বললে, রাজি হোসনে সায়দার! আমি বড্ড ঝাল! দেখছিস না ধানি-লঙ্কার মতো টুকটুকে গায়ের রঙ। আমাদের সায়দারের এ বদান্যতা কেন জানিস? এক রাতের জন্য তোদের গাঁয়ের কোন মিষ্টি মেয়েকে চেখে দেখতে চায়। তাই আমাকে চাপাতে চাইছে তোর ঘাড়ে। কিন্তু তোর অনভ্যাসের জিব — এ ঝাঁজ সহ্য হবে কেন? তার চেয়ে বরং দেখ, আমাদের মধ্যেও কিছু মিষ্টি মছয়া আছে — হয়তো সহ্য হবে —

বলে, কোথাও কিছু নেই আচম্কা ঠেলে দিলে নিজ দলের একটি ষোড়শীকে চয়নের দিকে। মেয়েটি অপ্রস্তুত ছিল—হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেত হয়তো। হঠাৎ তাকে হাত বাড়িয়ে লুফে নিল চয়ন।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল আবার। রঙিনা আবার কী-যেন বলল, কিন্তু গুপ্তেজী তার আর অনুবাদ করবার সময় পেলেন না। তার আগেই চয়ন বললে, লাগলো নাকি?

মেয়েটি সলজ্জ বললে : না, না!

এতক্ষণে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে দেখলাম। রঙিনা ঠাট্টা করে বলেছিল মছয়ার ফুল। কথাটা সত্যি। তারি মিষ্টি চাউনি তার। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, যৌবনপুষ্ট তনুদেহ। গলায় মাথায় একসার করে পুঁতির মালা। খোঁপায় খানকয়েক চিরুনি, একটা ময়ূরের পালক। মেয়েটিকে সবাই মালকো বলে ডাকছে। ভেবেছিলাম, ওর নাম বুঝি মালকো। পরে শুনলাম সেটা ঘট্টলদত্ত উপাধি।

ঘট্টলের প্রত্যেকটি পূর্ণ-সত্যের একটা করে উপাধি থাকে। চার-ছয় বছর বয়সে

যখন প্রবেশার্থী হিসাবে আসে, তখন তাকে বাবা-মায়ের দেওয়া নামেই সবাই ডাকে। দু'তিন বছর তাদের ব্যাগার দিতে হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অন্তত একখানা করে শুকনো গাছের ডাল তাকে নিয়ে আসতে হয়। কাজাঞ্জিকে দেখিয়ে সেটা জমা দেয় ঘটুলের কাঠের ভাঁড়ারে। শীতকালে সেগুলি কাজে লাগে, প্রয়োজনে লাগে ভোজের সময়। তারপর একদিন উপাধিদান উৎসবের আয়োজন হয়। আগেকার দিনে হবু রায়সাহেব, রায়-বাহাদুরেরা যেমন কম্পিত হস্তে পয়লা জানুয়ারীর খবরের কাগজ খুলতেন, তেমনি কম্পিতবক্ষে হাজির হয় বালখিল্য বাহিনী। শিরদার কাউকে উপাধি দেয় 'বেলদার' কাউকে 'চৌকিদার'। ক্রমশ তাদের পদোন্নতি হয়। 'কাজাঞ্জি' তামাকের সরবরাহ করে। ঘটুলে কোন অতিথি এলে তাঁকে তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করার দায়িত্বও কাজাঞ্জির। 'দাফেদার' আর 'বৈদার' ঘটুলঘর সংস্কার আর পরিচ্ছন্নতার জন্য দায়ী। 'কাণ্ডকীর' কাজ হচ্ছে অতিথি-অভ্যাগতদের তদবির-তদারক করা। 'মুন্সি' খরচপত্রের হিসাব রাখে। খোদায় মালুম, কীভাবে। যাদের লিখিত বর্ণমালা নেই, সংখ্যার লিখিতরূপ নেই, তাদের সমবায় সংস্থার ট্রেজারার থাকতে পারে এটা ধারণাই ছিল না। অথচ মুন্সি হচ্ছে কোষাধ্যক্ষ। কোতোয়ারের কাজটা মধুর। মোটিয়ারীদের উপস্থিতি এবং তদারক করার কাজ তার। আমাদের মেয়ে-হস্টেলের পুরুষ সুপারিন্টেন্ডেন্টের যতো সর্বদাই ব্যস্ত! আর সমস্ত ঘটুলের সব চেলিক-মোটিয়ারীর উপর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন শিরদার। বা স্থানভেদে সাইদার। প্রেসিডেন্ট নয়, ফুহরার! শিরদার সম্ভবত হিন্দি শব্দ 'সদার'-এর অপভ্রংশ। মেয়েদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হচ্ছে দুলোসা, আর গম্ফিরালী বেলোসা।

ক্ষেত্রবিশেষে শিরদারের চেয়ে কোতোয়ারের দাপট বেশী। এস-পি সাহেবের চেয়ে যেমন দারোগা-বাবার! ঘটুল, দু'জাতের। জোড়িদার ঘটুল আর নয়া ঘটুল। জোড়িদার ঘটুলে চেলিক আর মোটিয়ারী মোটামুটি জোড় বেঁধে থাকে। যতদিন না একপক্ষের বিয়ে হয়ে যায়, অথবা কোন বিশেষ কারণে জোড় ভাঙার প্রয়োজন হয়। শিরদারের সঙ্গে বেলোসা, কোতোয়ারের সঙ্গে দুলোসা, ইত্যাদি। নয়া ঘটুলে তিনদিন অন্তর জোড় ভাঙে, নতুন জোড় বাঁধে। সচরাচর বেলোসা কোতোয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে কার সঙ্গে কে জোড় বাঁধবে। তবে চেলিক-মোটিয়ারীদের স্ব-ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করা হয় সব ক্ষেত্রে। শুধু দেখতে হবে, সকলের সমান অধিকার বজায় থাকল কি না। যেখানে দুটি চেলিক একই মোটিয়ারীকে চাইছে সেখানে মোটিয়ারীর নির্বাচনকেই গ্রহণ করা হয়। আবার যেখানে দুটি মোটিয়ারী একই চেলিকের প্রতি অনুরক্ত সেখানে চেলিকের নির্বাচনই চূড়ান্ত। শুধু এক বিষয়ে ওদের নজর খুব কড়া। লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন চেলিক অথবা মোটিয়ারী যেন রূপহীনতার জন্য সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। ইন্টার্নাল ট্রায়েন্সেল বলে যে সমস্যার উপর গড়ে উঠেছে সভ্য দুনিয়ার সহস্রাব্দির সাহিত্য তাকে ভাবে অতি সহজেই নস্যাত করে ফেলেছে মুরিয়া ছেলেমেয়ের দল। কিন্তু প্রেমের গতি বড় বিচিত্র। ত্রিকোণ যদি 'হিডিয়াস হেঙ্গাগনের' রূপ নিতে চায় তখন সে প্রেমচক্রের চক্রান্ত ধূলিসাৎ করবার উদ্দেশ্যে বসে সুপ্রীম কাউন্সিলের সভা। দেওয়ান, শিরদার, বেলোসা,

কোতোয়ারের গোপন সভায় চূড়ান্ত বিচারে নির্ধারিত হয় সমাধান।

বিকালে খেলাধুলা হওয়ার কথা — কিন্তু কারাংমেটার দল পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় সেটা মুলতুবি থাকল। কাল সকালে হবে সেটা। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। ঘট্টল প্রাঙ্গণে আগুন জ্বালানো হল। গোল হয়ে বসল সবাই। বৃত্তের আধখানা কাবোঙ্গা, আধখানা কারাংমেটা। আমরাও বসে পড়লাম আসন-পিঁড়ি হয়ে। একটা আনন্দের কথা, আমাদের উপস্থিতিটাকে ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। না হলে ওদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসবের অনেকখানি ব্যাহত হত। কাজাঞ্জি সবাইকে একটিপ করে গুঁড়ো তামাক পাতা দিয়ে গেল। আমাদেরও নিতে হল। প্রত্যাখ্যান করা সৌজন্যের আইনে বারণ। আর একজন প্রত্যেকের হাতে একটা করে বিচিত্রগঠন ঠোঙা দিয়ে গেল। শুনলাম সেগুলি সিয়ারি পাতায় বোনা ঠোঙা। তার পর পরিবেশক যেমনভাবে নিমন্ত্রিতদের এক এক হাতা ডাল দিয়ে যায়, তেমনভাবে মধু পরিবেশন করা হল। লক্ষ্য করে দেখলাম, হাতাটা কাঠের নয়, লাউয়ের শুকনো খোলা। একজন সের দুয়েক ওজনের একটা পাথর এনে রাখল বৃত্তের মাঝখানে।

গুপ্তেজীকে বললাম, ওটা কী? কোন দেবতা নাকি?

গুপ্তেজী বললেন, আরে না মশাই। ওটা হচ্ছে ট্রফি। এবার শুরু হচ্ছে ধাঁধার খেলা। যে পক্ষ জিতবে তারা পাবে ঐ পাথরটা।

শুনলাম ধাঁধার খেলা মুরিয়া-সমাজের একটা প্রিয় খেলা। এ গাঁয়ের একজন একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করবে — ও গাঁয়ের যে কেউ তার জবাব দিতে পারে। তারপর ওগাঁয়ের যে কেউ একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করবে। জবাব দেবার দায় এবারে এ গাঁয়ের। যে গ্রাম জবাব দিতে পারবে না, তারা হারবে। অপরপক্ষ পাবে ঐ ট্রফিটা।

বললুম, ঐ আড়াইসেরি পাথরটা দিয়ে কী করবে ওরা?

—কিছুই করবে না। তুলে নিয়ে যাবে। ফেলে দেবে। সোনার মেডেল পেলে আপনারা আলমারিতে জমিয়ে রাখেন, কিন্তু অলিভ-পাতার লরেল নিশ্চয়ই শুকিয়ে যেত বিজয়ী রোমান জেনারেলের মাথায়! ফেলে দিত পরে।

কাবোঙ্গার একটি ছেলে, কোতোয়ার, সর্বপ্রথম ছুঁড়ে দিল হাটের মাঝে প্রথম ধাঁধাটা।

তামুর ইরুরা লোখু জোতে মান্তা।

মাটি ওয়ারুরো ওয়াররোনা লোটে

হরিওর

অর্থাৎ :

দু-ভায়ের গলাগলিভাব —

তবু দেখ আড়াআড়ি।

পাশাপাশি বাস করে তবু —

এ ঢোকেনা কভু ওর বাড়ি ॥

ধাঁধাটা আমি ভালো করে বুঝে উঠবার আগেই কারাংমেটার পাঁচসাত জন এক পাথে বলে ওঠে : জুতা, জুতা।

অবাক হয়ে বলি, আরে, এতগুলো লোক ধাঁধার জবাবটা করে ফেলল কী করে

এত তাড়াতাড়ি ?

গুপ্তেজী বললেন, জবাব তো আমারও তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, আশ্চর্য! আমার তো মাথাতেই আসেনি।

বললেন, আমি কি ভেবে বার করেছি? জানা ছিল। অন্তত গোটা পঞ্চাশ ধাঁধা আমি জানি। এরা এক একজন দেড়শ দু'শ ধাঁধার জবাব মুখস্থ করে রেখেছে। এরা যে প্রতিদিন ধাঁধা-চর্চা করে। ভিন গাঁয়ের কাছে ঠকতে না হয়। নতুন ধাঁধা তৈরী করা ভারি শক্ত। দেখুন না কতক্ষণ চলে খেলা।

ততক্ষণে কারাংমেটা প্রশ্ন করে বসেছে। মূল ধাঁধাটা টুকে রাখার সময় পাইনি, বঙ্গানুবাদটা হচ্ছে :

সবার বাইরে হাড়

মাংস ভিতর তার।

সবার নিচে সর ॥ বল কী ?

কাবোঙ্গাও কম যায় না। মুহূর্তমধ্যে সমস্তরে বলে ওঠে : ডাব ! ডাব !

হারজিত সমান-সমান।

কাবোঙ্গা গাঁয়ের ছেলেমেয়ের দল কানাকানি করে। কী প্রশ্ন করা যায় ? কোন্ ধাঁধাটায় কারু করা যাবে প্রতিপক্ষকে ? শেষে কাবোঙ্গার কোতোয়ার আবার উঠে দাঁড়ায়। কারাংমেটার বেলোসার মুখের সামনে এসে হাত নেড়ে বলে :

পথে ঘাটে কাঁধে চড়ে।

জল খায় সে পাথরে ॥

গাছে চড়ে, নয় পক্ষী।

মুরিয়ার ঘরে লক্ষ্মী ॥

বেলোসা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, মাক্সু।

বললুম, মাক্সু কী ?

—চুপ করে দেখুন না মশাই। বুঝতে পারবেন সব।

সত্যিই তাই। বেলোসা জবাবটা বলেই ক্ষান্ত হয়নি। পাশে পড়ে থাকা টাঙিখানা তুলে নিয়ে কোতোয়ারকে কোপ মারার ভঙ্গি করে। হো হো করে হেসে উঠে কারাংমেটা। কাবোঙ্গার কোতোয়ার বেচারি হতাশ হয়ে বসে পড়ে।

আবার সুযোগ ঘুরে এসেছে কারাংমেটার। মাল্কো এবার উঠে দাঁড়ায়। ওদের কোতোয়ার যখন কারাংমেটার বেলোসার নাকের কাছে আঙুল নাচিয়ে প্রশ্ন করেছে, তখন মাল্কোই বা ছেড়ে কথা বলবে কেন ? মাল্কো উঠে এল চয়ন শিরদারের সামনে। সর্দারের নাকের সামনে আঙুল নাচিয়ে বলল :

ঝিলিমিলি তারাই।

রাই রতন বা-রি।

ইয়ে ধাক্কারি নিজান্‌বি

বাইলো চো নাককি কাটি ॥

হো হো করে হেসে উঠল সবাই মাল্কোর অঙ্গভঙ্গিতে। পাদপুরণের শেষ পংক্তি

দুটিই এ হাসির উৎস, ‘এ খাঁধার জবাব যদি না দিতে পারিস, তবে তোর বউয়ের নাক কাটি।’

তা তো হল। কিন্তু খাঁধার জবাবটা কী। বেশ বোঝা গেল চয়ন বিপদে পড়েছে। শুধু চয়ন নয়, কাবোজ্ঞা গাঁয়ের সবাই। বুঝলাম খাঁধাটা নূতন। কেউ জানে না জবাব। ওরা মাথা নিচু করে ভাবতে থাকে। গুপ্তে বললেন, এটার জবাব আমিও জানি না।

বললাম, জবাব না জানলেও অন্তত প্রশ্নটা জানান।

গুপ্তে বললেন, ঝিলিমিলি তারাই—রাইরতন বারি। তারার মতো ঝিক্‌মিক্‌ করে সুন্দর এ রাজ্য, রাজ্যসীমার চারিদিকে সুন্দর কাঠের বেড়া। কী হতে পারে সেটা?

চয়ন বললে, রাজাও সুন্দর, তার বেড়াও সুন্দর? কোন্‌টা বেশী সুন্দর?

রাঙিলা বললে, সেটা যে দেখছে তার পর নির্ভর করে।

চয়ন বলে, যদি আমি দেখি? আমি কাকে বেশী সুন্দর দেখব?

রাঙিলা মুখ টিপে বলে, তুই কাকে বেশী সুন্দর দেখছিস তা আমি কেমন করে জানব। তোদের ঘট্টলে বেলোসা নেই, আমার তো মনে হয় আমাদের সবাইকেই তুই সুন্দর দেখছিস। কালো মাল্‌কো, ধলো বেলোসা সবই তোর চোখে সমান সুন্দর।

আবার উচ্চ হাস্যরোল ওঠে।

চয়ন অপ্রস্তুত হয় ফের। ছেলেটি মুখচোরা। খরজিহু রাঙিলার মুখে মুখে জবাব দেবার ক্ষমতা তার নেই। বলে, সে কথা তো হচ্ছে না, বলছি আমার চোখে বেড়াটা বেশী সুন্দর লাগবে না রাজ্যটা?

রাঙিলা বলে, অতশত জানি না। চটপট জবাব দে। না পারলে ঐ পাথরটা তুলে মনে দে। অত ভারী পাথর কি আমরা বইতে পারি? গাধার মোট গাধাতে বইলেই মানায়।

হারই স্বীকার করতে হল কাবোজ্ঞাকে। হৈ হৈ করে উঠল কারাংমেটা। অনেকে ছুটে গেল পাথরটা নিয়ে আনতে। বাধা দিয়ে চয়ন বলে, বারে! আগে জবাবটা বল?

রাঙিলা চট করে চয়নের পাগড়ি থেকে টেনে নেয় হাত-আয়নাটা। কাঠের ফ্রেমে গাঁগানো ছোট আয়না। চয়নের মুখের সামনে ধরে বলে, দেখে নে এবার — ঝিলিমিলি তারাই, রাইরতন বা-রি। তোর তো বউ নেই, আয় তোর নাকটাই কাটি!

গাঁধার পরে শুরু হল নাচ। কারাংমেটা নাচলো প্রথমে। রাঙিলা ধুয়ো ধরলে। আর সবাই ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করল:

কারাং সারপাঠে উদিতন সায়দার

বাদেঙ্গে ইসে উদিতন?

বেলোসাকে ইসে উদিতন?

...হা দাদা সায়দার ॥

ক্যাদি আকা পোৎসি হেংকে ইসে হাঙু।

তাতাৎ হুমার কিশুন হেংকে ইসে হাণ্ডু

...হা দাদা সায়দার ॥

সাপারি তাহে হাণ্ডু

তানে ইসে পোয়াণ্ডু

“আয়ো আয়ো”—হাণ্ডু

তুনা তানে ওস্তি সায়দার,

...হা দাদা সায়দার ॥

এই গানেরই প্রথম দুটি চরণ গেয়েছিল রঙিলা সর্বপ্রথম সাক্ষাতে। যখন চয়ন বলেছিল তাদের ঘটলে বেলোসো নেই। সবাই হেসে উঠেছিল। গানের অর্থ শুনে এতক্ষণে বুঝলাম সে হাসির উৎস কোথায় :

পথের মাঝে উদাস পারা

বসেছ কেন তুমি !

কেন বল না খোলসা ?

আছ কাহার পথ চাহি ?

সে কি মোদের বেলোসা ?

...হায় দাদা সায়দার ॥

সে যে গাগরি শিরে গিয়াছে ধীরে

নদীর কিনারায়

হেথায় সে তো নাই,

আছ বৃথাই পথ চাহি।

...হায় দাদা সায়দার ॥

সে এলে বিজন পথে

তুমি ধরিবে তাহারে হাতে

কহিবে সে — “না, না,

আমি যাব না তোমার সাথে”

...হায় দাদা সায়দার ॥

গান শেষ হলে আবার ওঠে উচ্চ হাস্যরোল। রঙিলা প্রতিবার গানের ধুয়েয় ফিরে এসে চয়নের সামনে হাত নাড়ছিল। শেষবারের মতো ‘হায় দাদা সায়দার’ বলবার সময় ওর চিবুকে একটু নাড়াও দিয়ে দিল। চয়ন হাসে, বোকার হাসি।

ভিনগাঁয়ের স্বল্প পরিচিত কোন তরুণের প্রতি একটু অনুঢ়া যুবতীর এ রকম অদ্ভুত আচরণ আপনার কাছে হয়তো ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না। মনে হচ্ছে রঙিলা শুধু প্রগলভ নয়, সে যেন শালীনতার মাত্রাটাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু গানের মধ্যে নয়, তার নাচের ভঙ্গিমায় একটা ইঙ্গিত ছিল। তার কটাক্ষে, তার দেহ-হিন্দোলে একটা কী

যেন ছিল যা ভদ্র মনের কাছে রুচিবর্জিত মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ওদের সামাজিক রীতিনীতিতে তৌল করলে এ আচরণের মধ্যে অশালীনতার সন্ধান পাওয়া গােন না। এ যেন খুবই একটা স্বাভাবিক আচরণ।

এবার উঠে দাঁড়ালো কাবোঙ্গার ছেলে-মেয়ের দল। নেতৃত্ব দিল চয়ন। আশ্চর্য, মণা ও লাস্যময়ী রমণীর কৌতুকনৃত্যের জবাব দেবার কোন চেষ্টাই করল না। কাবোঙ্গা গায়ের নিঃসঙ্গ নায়ক যখন উঠে দাঁড়ালো তার অনিন্দ্যসুন্দর সুগঠিত তনু-দেহটি নিয়ে, তুলে নিল তার বাঁশের বাঁশীটি—সুর চড়ালো তাতে, তখন মনে হল, গােলা বেলোসার ব্যঙ্গকৌতুক যেন ওরা গায়ে লাগেনি। যেন পঙ্কশ্রোত থেকে পাড়ে দড়ে এসে দাঁড়াল শুভ্র রাজহংস। তার দরাজ মনের সাদা পালকে কাদা-গোলা জল যেন কোন দাগই কাটতে পারেনি। একবিন্দু মালিন্য নেই তার বাঁশীর তানে। কাবোঙ্গা গায়ের প্রকৃতির সন্তান গাইল প্রকৃতিদেবীর বন্দনা-গান। তার মধ্যে লালসা-বাসনার নামগন্ধও নেই। সে গান যেন নিকষিত হেম। কী জানি কেন এই ফাল্গুনী সন্ধ্যায় চয়নের মনে পড়ে গেল শ্রাবণ রাত্রির ধারাপতনের গান। শালমহুয়ার বনাঞ্চলে অশান্ত গারিপতনের একটানা রিমঝিম শব্দটা যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম। অনুবাদ শোনার আগেই। মুগ্ধ হয়ে গেলাম তারপর অনুবাদ শুনে! টিমে-তালে শুরু হল বাদল দিনের গান :



বেলো বেলো নাচ

‘বেলো বেলো’ কোন নাচের নাম নয়, তালের নাম। মাড়িয়া ও মুরিয়ারা অনেক নাচ নাচে যা বেলো-বেলো তালে বাঁধা।

আরিং বোরিং বাদের...রা—য়ে।
 পেরোন বাদের পয়েণ্ড...রা—য়ে॥
 দর্কা পির্ক দর্দর্...রা—য়ে।
 ঝিম্টি পির্ক রিম্ঝিম্...রা—য়ে।
 ডোরি উশা হাণ্ড...রা—য়ে।
 ডাক্কা পিছর হাণ্ড...রা—য়ে॥

স্বরলিপি ছাড়া সে গানের অনুবাদ হয় না। তাই সে চেষ্টা করিনি। মানেটা মোটামুটি
 এইরকম :

বাদল-মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।
 কখনও দরদর ধারে ভেঙে পড়ছে আকাশ,
 কখনও একটানা রিম্ঝিম্ বিলম্বিত লয়ে
 উদাসী অরণ্য-বাউল বাজিয়ে চলেছে তার একতারা।
 মসীকৃষ্ণ অন্ধকার ভেদ করে
 সন্ধ্যার মুহূর্তটিতে পশ্চিম আকাশ থেকে
 সোনার তীর ছুঁড়ে মারলেন সূর্যদেব, —
 কিন্তু ধারাপতনের অশ্রান্ত জলপ্লাবনে
 কোথায় ভেসে গেল সে সোনার তীর
 অন্ধকার তমিস্রায় আত্মবলি দিতে ॥

স্বীকার করি, ঠিক ঐ শব্দগুলি ওদের গানে হয়তো ছিল না — ভাবটা ছিল
 আরও নিষ্পেষ্ট হয়ে। উপনিষদের সূক্তের মধ্যে ঠাসা থাকে যেমন নিরেট ভাবনা।
 ব্যাখ্যা করলে, বিস্তার করলে তবেই তার রস গ্রহণ করা যায়। ওদের ঐ গানের
 যে ইংরেজি অনুবাদ গুপ্তেন্দ্রী আমাকে শুনিয়েছিলেন, তার বঙ্গানুবাদের ভাবার্থটা
 ঐ রকমই দাঁড়ায়।

সূরের মুর্ছনাটা হারিয়ে গেল কাবোঙ্গার আকাশে বাতাসে — কিন্তু ঐ দুর্বোধ্য
 শব্দগুলি আজও যখন পড়ি আমার মস্তিষ্কের কোন রক্তকোষে বেজে ওঠে সেই রিম্ঝিম্
 সঙ্গীত। গোগা ঢোলের ডুগুডুগুর মেঘডম্বর, ধুশীরের করুণ আর্ত-বিলাপ! আমি
 আজও অবাক হয়ে ভাবি, ঐ অসভ্য নিরক্ষর মানুষগুলো কোন্ মন্ত্রবলে লাভ করল
 এমন মধুর সঙ্গীত, এমন অপূর্ব কাব্য? যে ভাষায় ব্যাকরণ নেই তার কি রৈটরিক
 থাকতে পারে?

অমন অপার্থিব সঙ্গীত শুনে আমার কিন্তু মনে পড়েছিল একটা স্থূল টাকা-আনা
 পাইয়ের হিসাব! মনে হল, ক্যামেরার পিছনে টাকার শ্রাদ্ধ না করে বুদ্ধি খরচ করে
 যদি একটা টেপ-রেকর্ডার কিনতুম!

বেশ বুঝতে পারি — কারাংমেটা একটু ভাবনায় পড়েছে। রঙিলার প্রগল্ভতার জ্ঞান দেয়নি চয়ন। কৌতুক-সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা থেকে সে নিঃশব্দে সরে গিয়েছে। নিঃশব্দে কিন্তু সসম্মানে। কারাংমেটা অনুভব করতে শুরু করেছে কোথায় যেন কাবোঙ্গারই জিত শুরু হয়েছে। সে জয় বিজয়-উৎসব করে ঘোষণা করতে যায় না — সে জয় মনে মনে অনুভব করা যায়। চৈত-দাঙার উৎসব শুধু ভোগের উৎসব নয়, শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারে অন্ধের মত মাথা খোঁড়ার জন্য এ আনন্দ উৎসবের আয়োজন নয়। চৈতদাঙারে দেবতার স্তবগান করতে হয়। প্রকৃতির বন্দনা-গান গাইতে হয়। তাই হচ্ছে দেব লিঙ্গোপেনের নির্দেশ। এ গাঁয়ের মানুষ ও গাঁয়ের মানুষ এক হয়ে প্রণাম জানাবে সেই বড়া-পেনকে, তাল্লুর-মুটাইকে, জোডি-মাঙ্গিকে — যিনি তোমার আমার আর সকলের কাছেই এক। আদিপুরুষ লিঙ্গোপেন চৈতদাঙার উৎসবের প্রচলন কেন করেছিলেন জান? ভিনগাঁয়ের অচেনা মেয়ের দেহের পেয়ালায় শূলপী খেতে নয়, লালসা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে নয়। লিঙ্গোপেন চেয়েছিলেন এইভাবে গাঁয়ে গাঁয়ে সমঝোতোয়া বেড়ে উঠুক। বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হোক। ভাবের আদান-প্রদানে মুরিয়া সংহতির বনিয়াদ দৃঢ়তর হয়ে উঠুক — এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আমরা প্রকৃতিকে কী চোখে দেখেছি, বসন্ত সমাগমকে, বর্ষার ধারাপতনকে, শীতের প্রিমেল হাওয়াকে কেমনভাবে বন্দনা জানিয়েছি, সে-কথাই আমরা শোনাব গানে গানে, বিনিময়ে তোমরাও জানাবে কেমন করে তোমরা ফসল বুনেছ, কেটেছ, শিকার করেছ। জীবনকে কেমনভাবে উপভোগ করেছি তাই না আমরা পরস্পরকে জানাব নাচে আর গানে — তাই না মিলিত হয়েছি চৈত-দাঙারে ?



হলকি নাচ — পিছন থেকে

এই কথাগুলিই যেন গানে গানে বুঝিয়ে দিল চয়ন শিরদার কারাংমেটার চঞ্চলমতি চেলিক-মোটিয়ারীদের।

রঙিলা উঠে দাঁড়াল। লাস্যময়ী পূর্ণযৌবনা নারী। চোখের কোণে তার শানিত কটাক্ষ, দেহের স্তবকে স্তবকে তার মাদকতার হিন্দোল। চোখ দুটো স্থলছে। কাব্যিক

আবহাওয়াটাকে নিমেষে নস্যাত্ন করে দিতে চাইল লালসাদীপ্ত অঙ্গভঙ্গিতে। বেশ বুঝলাম, রঙিলার মন বলছে গোপনে গোপনে হার শুরু হয়েছে তার। কারাংমেটার চেলিক-মোটিয়ারী দলের নায়িকা রঙিলা বেলোসা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল এই শান্ত পরিবেশটিকে। কাকচক্ষু হৃদের জল যেমন ঘুলিয়ে তোলে মদমত্ত মাতঙ্গ, শালবনের ধ্যানস্তিমিত গান্ধীর্ষ যেমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে তোলে হঠাৎ-ওঠা কালবৈশাখী ঝড়। অশ্লীলতর অঙ্গভঙ্গি করে বেলোসা গান ধরল :

ও হো ম্যয়না হো লালসাই, ব্যয়ঠো ডাণ্ডা হো
 ও হো কাহেন কি ডাণ্ডা হো লালসাই ম্যয়না
 কাহেন কি ডাণ্ডা হো তারি ?
 ইয়ে বাটে পালটু হো রাজা
 ম্যয়না হো লালসাই
 ইয়ে বাটে পালটু হো !
 ও হো চৈত দাণ্ডার হো রাজা ম্যয়না
 হো লালসাই, হো তারি।
 উঁঠু, ডাকু হো রাজা লালসাই হো ম্যয়না
 হো তারি ॥

কাবোঙ্গা গাঁয়ের ছেলেমেয়ের দল উশ্খুশ করে ওঠে। চয়ন উদাস দৃষ্টি মেলে বসে থাকে। কী ভাবছে সে, তা সেই জানে। কিন্তু কাবোঙ্গার অন্যান্য চেলিকদল তো আর চয়নের মত অন্ধ নয়, তারা যে দু চোখ মেলে দেখেছে আগন্তুক মোটিয়ারীদের যৌবনপুষ্ট দেহ। রঙিলা বেলোসা, ওদের মালকো, ওদের দুলোসা যে গানে গানে বলছে ‘উঁঠু ডাকু হো রাজা লালসাই’ — ওঠো রাজপুত্রের দল, লুটেরার মত লুট করে নাও আমাদের উথলে ওঠা যৌবন। ওদের রক্তের তালে তালে মান্দ্রিটোলের দ্রিমিদ্ৰিমি বোল বাজতে থাকে।

কাবোঙ্গার মোটিয়ারীরাও তো আর চয়নের মতো বধির নয়। তারা যে দু কান পেতে শুনেছে — কারাংমেটার ছেলের দল তাদের গানে গানে ডেকেছে, বলেছে — ‘ইয়ে বাটে পালটু হো রাজা ম্যয়না হো তারি’, ওগো আমার টুকটুকে ময়নার দল, এস আমাদের কোল ঘেঁষে দাঁড়াও ; চৈতদাণ্ডার উৎসবে পোষা ময়নার মতো আমাদের বাহুবন্ধের খাঁচায় ধরা দাও। ওদের মনের তার কেকুরেও যন্ত্রের তারের মতো কাঁপতে থাকে সে গানের স্পর্শে।

চয়ন হঠাৎ মুখ তুলে তাকায়। কাকে যেন খুঁজতে থাকে এদিক ওদিক তাকিয়ে। লক্ষ্য করে দেখি, রঙিলা বেলোসা ঘরে নেই। শুধু রঙিলা নয় মালকোও কখন বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেল ওরা ? গেল কখন ? চয়ন নিশ্চয় ওদের দুজনের মধ্যে একজনকে খুঁজছে। কিন্তু কাকে ? একটু আগে কাবোঙ্গার একটি ছেলে, কোতোয়ার নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, লক্ষ্য করেছিলাম। এবার দেখলাম চয়নও উঠে বেরিয়ে গেল,

খটল থেকে।

গুপ্তেজী ঘড়ি দেখে বললেন, রাত দশটা হল। চলুন এবার ওঠা যাক। আর দেরী করলে নারানপুরে কোন দোকান খোলা পাওয়া যাবে না। শোবার জায়গা পাওয়াও মুশকিল হবে।

কিন্তু নাটক সবে জমেছে, এখন উঠে যাওয়ার ইচ্ছা আদৌ নেই। চয়ন-রঙিলা নাটকের মাঝখানে যবনিকা টেনে চলে যাওয়াটা পছন্দ হচ্ছিল না। তবু উঠতেই গেল। গুপ্তেজী বুঝিয়ে দেন, এরপর আমাদের থাকটা নাকি আর বাঞ্ছনীয় নয়। সে কথা জানা ছিল না আমার।

এমনি উৎসব রজনীতে চোখে চোখে কথা হয় এদলে ওদলে। তারপর কোন ছুতায় একজন উঠে যায় বাইরে। অপরজন সকলের অগোচরে তাকে অনুসরণ করে চুপিসারে। উৎসব-মগ্ন ছেলেমেয়ের দল খেয়াল করে না। করলেও সে কথা গোপন করার রেওয়াজ আছে। নাচ-গান-খেলা-ধাঁধা চলতেই থাকে সমান তালে। তারপর আবার কখন পা টিপে টিপে ফিরে আসে ওরা। একসাথে ফেরে না, আগে-পিছে এসে নিঃশব্দে মিশে যায় ভিড়ে। পরস্পরের দিকে আর তাকায় না। লক্ষ্য করলে হয়তো দেখা যাবে সেই মেয়েটির মাথায় উঠেছে একটা নতুন কাঁকুই, দৃষ্টি হয়েছে নত — সেই ছেলেটির ক্লাস্তিতে জড়িয়ে আসছে দু চোখ।

এ সব কথা জানা ছিল না আমার। গুপ্তেজী লক্ষ্য করেছেন, ঘর থেকে চারজন মানুষ বাইরে গেল একে একে। সুতরাং নাটকে আমাদের ভূমিকা খতম।

বিদায় নিয়ে এলাম না। নিঃশব্দে উঠে চলে এলাম দুজনে। ওদের উৎসব যেমন চলছে চলুক। বাইরে হরীতকী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে বিমন্ত জীপটা। ড্রাইভার গুড়িসুড়ি মেরে ঘুমোচ্ছে তার গর্ভে। আমাদের সাড়া পেয়ে উঠে বসল। আমরাও উঠে বসলাম। কেলেঙ্কারী হল আড়মোড়া ভেঙে জীপটা চোখ মেলতেই। যে অবাঞ্ছনীয় দৃশ্যটা এড়াবার জন্যে নিঃশব্দে পালিয়ে এলাম আমরা দুজন, সেই দৃশ্যটাই ফুটে উঠল হেডলাইট স্বলামাত্র। নিকষকালো যবনিকা খান্ খান্ করে ছিঁড়ে ফেলল জীপের আলোটা। দেখলাম নাটকের শেষ দৃশ্য। কমেডি নয়, চরম ট্রাজেডি সেটা। ধড়মড় করে উঠে বসল দুজন গাছতলার ভূ-শয্যা ছেড়ে। রঙিলা-বেলোসা আর — না চয়ন নয়—কাবোঙ্গার কোতোয়ার। সর্বসমক্ষে টাঙির কোপ মারার ভঙ্গি করলেও জনান্তিকে তাকেই বরণ করেছে আগুন-বরণ মেয়েটি। কাবোঙ্গার চয়ন শিরদারকে নয়।

জীপটা ব্যাক করল। মোড় ঘোরার সময় আলোর ধূমকেতু সমস্ত তল্লাটটার উপর ঝাঁটা বুলিয়ে গেল যেন। সেই চকিত আলোয় দেখলাম তালাওয়ার ধারে সাবুগাছতলায় এসে আছে চয়ন। একা। কাবোঙ্গার নিঃসঙ্গ নায়ক।



॥ সাত ॥

নারানপুরে যখন এসে পৌঁছলাম রাত প্রায় এগারোটো। ভেবেছিলাম এত রাতে কোন দোকানপাট খোলা পাব না। ভুল ধারণা আমাদের। কাল মাড়াই বসবে। তারই তোড়জোড় চলেছে। হাটতলার পিছনেই সার্কাসের তাঁবু পড়েছে একটা। সেখানে সবাই জেগে আছে। দোকানপাটও খোলা আছে অনেকের। রাস্তার ধারে সেই মারবার-তনয়ের চায়ের দোকানটি খোলা আছে। সেখানেই গিয়ে ওঠা গেল। দোকানদার ছোকরা বেশ চটপটে। দেখতেও বেশ সুপুরুষ, বছর বিশেক বয়স। আপ্যায়ন করে আমাদের বসাল। বললে, একটু বসে যান স্যার, গরম গরম পুরি ভাজিয়ে দিচ্ছি। মাংসও আছে, কিন্তু সে কি আপনারা খেতে পারবেন? তারপর মুখটা কানের কাছে এনে বললে—ও মাংস ঐ জানোয়ারগুলোই গিলতে পারে, ও কি ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়? বরং আলু-কপির একটা তরকারিও চড়িয়ে দিই। দুটো উনুনেই আঁচ আছে, বিশ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে।

গুপ্তেজী বললেন, বেশ, আমরা ততক্ষণ রাতে শোবার একটা ব্যবস্থা করে আসি। ডাকবাংলোতে কিংবা ফরেস্ট রেস্ট-হাউসে সিট পাওয়া যায় কি না দেখি।

ছোকরা বললে, বৃথা চেষ্টা স্যার। সব ভর্তি। হরেক রকমের মানুষ এই মওকায় নারানপুরে আসে মজা লুটতে। হজুরের উচিত ছিল আগে থেকে ডাকবাংলো বুক করে রাখা।

গুপ্তেজী বললেন, তা তো ছিলই। কিন্তু আজ রাতে যে আমাদের কাবোজাতে থাকার কথা ছিল।

ছোকরা বলে, হজুর যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা কথা বলতাম।

—বল।

—আপনাদের যদি নেহাৎ অসুবিধা না হয়, তাহলে আমার গরিব-খানাতেই আজ রাতটা কাটিয়ে যান। এ ঘরের পেছনেই আমার আড়ৎ। নেয়ারের খাটিয়া পেতে দিচ্ছি। খটমল নেই। এই রাতে কোথায় খুঁজতে যাবেন আশ্রয়?

ছোকরা আমাদের পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। ও হরি, চায়ের দোকান এটা আদৌ নয়। ভিতরে ছোকরার ধানচালের আড়ৎ। একপাশে গাদা দেওয়া আছে ধানের বস্তা। তিসি, মশ্নে, সরষের স্তুপ। ওপাশে বিরাট ওজন-কাঁটা, বাটখারা, মায় কুলুঙ্গিতে সিন্দুরচর্চিত সিদ্ধিদাতা গণপতি। কী নেই? চায়ের দোকানটা আসলে আড়ৎঘরের বারান্দা। মাড়াই উপলক্ষে অস্থায়ী দোকান খুলেছে ছোকরা। ব্যবসায়ী বুদ্ধি ওর রক্তে। মেলায় কদিনে যা পারে দু পয়সা লুটে নিতে চায়।

গুপ্তেজীকে বলি, আর ইতস্তত করে লাভ নেই। এখানেই আতিথ্য নেওয়া যাক।

ছোকরা আমাদের দেখিয়ে গুপ্তেজীকে বললে, ঐকে তো চিনলাম না স্যার?

গুপ্তেজী প্রতিপ্রশ্ন করেন, আমাদের চেন?

—আপনাকে চিনব না স্যার? আদিবাসীদের মধ্যে কারবার ফেঁদেছি, আপনাকে চিনব না?

গুপ্তেন্দ্রী সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিলেন। ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে ওঠে। হিন্দি ছেড়ে এবার বাংলায় বলে : হ্যাঁ! আপনি বাংলায় গল্পো লিখেন? হামি বাংলা ভি পড়তে পারি। কলকাতায় হামার চাচাজির আড়ৎ আছে। বড়বাজারমে। আপনাদের বাংলা গল্পো হামার খুব ভালো লাগে। অনেক পড়িয়েছি। সবসে সেরা कहানিয়া হল মোহন। আপনি মোহনের কেচ্ছা পড়িয়েছেন?

গুপ্তেন্দ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, মোহন কি কোন উদীয়মান বাঙালী কথাসাহিত্যিক? সংক্ষেপে বললুম—না!

ছোকরা-চাকরটা এসে খবর দিল— খাবার তৈরি হয়ে গেছে।

সে রাত্রে সেখানেই আতিথ্য নেওয়া গেল। এ কাহিনীতে এই দোকানদারটির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। নারানপুর ছোট জায়গা। তাই দোকানদারের প্রকৃত নামটা প্রকাশ করা উচিত হবে না। তার প্রিয় চরিত্রের নামটাই আপাতত তার অভিধা হোক। মোহন কিছুতেই খাবারের দাম নিল না। বললে, রাতে আপনারা আমার অতিথি। কাল সকালে যা খাবেন তার দাম নেব। আজ রাত্রে জন্ম আমাকে মাপ করতে হবে।

বললাম, মোহন পাকা ব্যবসাদার। গুপ্তেন্দ্রীকে হাতে রাখতে চায়। আমি বাংলায় গল্প লিখি বলে নয়, গুপ্তেন্দ্রীর দোস্ত হিসাবেই আমাকেও আহ্বার, আশ্রয় দিল সে। আদিবাসীদের সে নেহাৎ জানোয়ার মনে করে, কিন্তু আদিবাসী এফিসারদের খাতির করতে পরাভুখ নয়।

পরদিন ঘুম ভাঙতে বেশ একটু বেলা হল। গুপ্তেন্দ্রী আগেই উঠেছেন। মোহনের সঙ্গে দেখা হতেই বললে, রাশিয়া আবার একটা মেগাটন বোমা খাটাইয়েসে।

বললাম, সে কী!

বললে, হ্যাঁ! সকালের নিউস যে শুনলাম যে!

মোহনের একটি ব্যাটারি সেট রেডিও আছে।

হবেও বা। হয়তো সত্যিই সাইবেরিয়ার আকাশ এতক্ষণে বোম্বার কানো হয়ে গেছে। নারানপুরের আকাশে বাতাসে তার চিহ্নমাত্র নেই। বললে বোদ এসে পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে। টাকা-টাকা ছোপধরা রোদদুর। জেগে উঠেছে নারানপুরের ছাটতলা। লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

মোহনের দোকানেই প্রাতরাশ সারা গেল। দাম নিতে আর আপত্তি করল না। বিচিত্রদর্শন আদিবাসীরা দোকানের সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আমরা বসেই আছি। একটু পরে মোহন বললে, আপনাদের জন্যে ভিতরে আরাম কেদারা পেতে দিয়েছি। এখানে কেন কষ্ট করছেন? আসুন, ভিতরে এসে আরাম করে বসুন।

খেয়াল হল। সাহেবি পোশাক-পরা আমাদের দুজনকে দেখে ওর দোকানে খদ্দের আসছে না। অথচ আমাদের উঠে যেতেও বলতে পারে না বেচারি। তাই এই সুবন্দোবস্ত।

বললাম, এখন একটু বেড়িয়ে আসি বরং। একাই ঘুরব একটু।

গুপ্তেন্দ্রী বলেন, ফটো যদি নিতে চান তাহলে একাই যান। দুজনে একসাথে গেলে ওদের 'ক্যান্ডিড' ছবি পাবেন না।

এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! ভয়ে ভয়ে বলি, ফটো তুলব? আপত্তি নেই তো কিছু?

হা হা করে হেসে ওঠেন গুপ্তেজী, ও হরি। আপনি বুঝি তাই এতক্ষণ ক্যামেরাটাকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন? কে বলেছে? মেহরা-সাহেব বুঝি?

আম্ভা আম্ভা করে বলি, হ্যাঁ, কে যেন সেদিন বলছিল, আপনি মেহরাজির শালার ক্যামেরা কেড়ে নিয়েছিলেন।

—ক্যামেরা নয়, এক্সপোজড স্পুলটা। তাকে রসিদ দিতে চেয়েছিলাম।

—আর নাকি বলেছিলেন তার জামাইবাবুর কোর্টে নালিশ করতে?

—ঠিক তাই।

—তাহলে আমাকে ফটো তুলতে দিচ্ছেন যে?

—সে আর এ?

শুনলাম ঘটনাটা। একদল আদিবাসী মেয়ে নাকি নদীতে স্নান করছিল। ওরা সাধারণত ঘাটে কাপড় ছেড়ে জলে নামে। মেহরার শ্যালক ঝোপের আড়াল থেকে কয়েকটা স্ন্যাপ নেয়। মেয়েরা টের পায়নি, পেয়েছিলেন গুপ্তেজী। জোর করে কেড়ে নিয়েছিলেন ফিল্মটা। ছোকরা বলেছিল, আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন? ফটো তোলা কি সরকারি আইনে বারণ?

—সরকারি আইনে নয়, শালীনতার আইনে— বলেছিলেন গুপ্তেজী।

ছেলেটি বলেছিল, আপনি জানেন আমি কে? মিস্টার জে মেহরা আমার ভগ্নিপতি।

জবাবে গুপ্তেজী বলেছিলেন, তবে আর ভয় কী? তোমার জামাইবাবুর কোর্টে আমার নামে নালিশ কর। সাক্ষী-সাবুদ লাগবে না, কাগজ দাও, আমি লিখে দিচ্ছি তোমার কাছ থেকে শ্রেফ গায়ের জোরে তোমার একটা এক্সপোজড ফিল্ম কেড়ে নিয়েছি।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, ডেভলপ করিয়েছিলেন স্পুলটা?

—অত নোংরা মন আমার নয়।

একাই ষের হয়ে পড়লাম। হাটতলার পিছনে ফাঁকা মাঠটায় এসে বসেছে নিরাবরণ মাড়িয়ার দল, যাদের কোকামেটায় দেখছি। কে জানে, সেই ‘মুয়ে আগুন’ মেয়েটিও এসেছে কি না। দেখলে তাকে নিশ্চয় চিনতে পারব, সেও পারবে আমাকে। রাস্তার উত্তর দিকে গাছের ছায়ায় বসেছে মুরিয়ার দল। এক দলে পনের-বিশজন। ওরা ওই গাছতলাতেই ছিল রাত্রে। নিবে যাওয়া ধুনি থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে এখনও।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। হাটতলার গুঞ্জন ক্রমে কমে এল। হাটতলার দক্ষিণে বিরাট বড় তালো। তার ঊঁচু পাড়ে গিয়ে উঠলাম। লালে লাল হয়ে আছে একটা পলাশ গাছ। ফিরতে হল সেখানে থেকে। মেয়েরা স্নান করছে তালোওয়ে। ফেরার পথে দেখি দুজন লোক। আমার পিছু পিছুই আসছে তারা। অস্ফুটে কী যেন আলোচনা করছে। কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি না, তবে মনে হল আলোচ্য বস্তু বুঝি আমি নিজেই। কৌতূহল হল। গতি প্লথ করলাম। দূরত্বটা কমে গেল। হ্যাঁ, আমার সম্বন্ধেই ওরা

নানা বলছে। হয় ওরা ছত্রিশগড়িয়া, না হলে রাজগোণ্ড। ওদের ভাষায় হিন্দি শব্দই বেশী। একটু কান করতেই দেখি ওদের কথাবার্তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

একজন বলছে, কিন্তু তাহলে লোকটা কে ?

দ্বিতীয়জন বলছে, আমি যা বলছি তাই ঠিক—ও নিশ্চয় দণ্ডকারণ্যের লোক। মজা লুটতে এসেছে।

হা ঈশ্বর ! আমি হলুম খাস কলকাতাইয়া। এমন স্যুটেড-বুটেড হয়ে চালের মাথায় পুরে বেড়াচ্ছি, আর সেই আমি হলুম দণ্ডকারণ্যের মানুষ ? কার চোখে ? না, যারা খাস দণ্ডকারণ্যের অসভ্য অধিবাসী ! একটু পরেই ভুলটা ভাঙলো। প্রথমজন বললে, কিন্তু দণ্ডকারণ্যের লোক হলে পায়ে হেঁটে বেড়াবে কেন ? দণ্ডকারণ্যের লোকেরা তো শুধু গাড়ি চড়ে।

তাই বল। ‘দণ্ডকারণ্যের লোক’ মানে দণ্ডকারণ্য-উন্নয়ন-সংস্থার রাজকর্মচারী।

দ্বিতীয়জন বললে, তুই একটা মুখ্য। দণ্ডকারণ্যের সব লোকই কি গাড়ি চড়ে ? এই তো আমাদের টুডু, সে তো দণ্ডকারণ্যের চাকরি পেয়েছে। পিয়ন হয়েছে। সে কি গাড়ি চড়ে ? ও বোধহয় দণ্ডকারণ্যের উপরতলার লোক নয়। গাড়ি পায়নি এখনও।

আর সহ্য হল না। এরা ভেবেছে কী ? আমাকে টুডুর সঙ্গে তুলনা করবে, আর তাই মুখ বুজে সয়ে যাব ? নাঃ। আলাপ করতে হবে ওদের সঙ্গে। ভালো করে। আত্মপরিচয় দিতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। পিছন ফিরে দাঁড়াতেই লোক দুটি চোঁচা দৌড় মারল। একবার ভাবলাম চেষ্টা করে বলি, আমি দণ্ডকারণ্যের মানুষ বটে, তবে টুডু পিয়নের স্বগোত্র নই। তারপর ভাবলাম—যাক্ গে। ভয় পেয়ে পালিয়েই গেল যারা, তাদের কাছে আত্মপরিচয় নাই বা জানালাম।

বেলা বারোটা নাগাদ একটা সোরগোল শুনলাম। কী ব্যাপার ? না ‘আঙ্গোপেন’ আসছেন।

—আঙ্গোপেন ? কে তিনি ?

উত্তর হলো, কোথাকার ভূত এটা ? আঙ্গোপেনকে চেনে না !

সাড়ম্বরে এসে পড়লেন আঙ্গোপেন। হাঁ, চিনি বটে। সেই যাঁকে সোনপুরে বলেছিল ঝুংঝুং। শাল কাঠের একটা চৌদোলা। কালো কুচকুচে রঙ। তেল মাখান। তার গায়ে রূপালি পাতের চোখ আঁকা। চারজনে সেটা বয়ে নিয়ে আসছে। সঙ্গে অন্তত ‘শ’ পাঁচেক লোকের মিছিল। কেউ বয়ে নিয়ে চলেছে নিশান, কেউ আস্ত একটা গাছের ডাল। মাদক রসে সকলেই কম বেশি বেসামাল। পরে শুনলাম শুধু মাদকরসে নয়, ওদের উপর দেবতার ভর হয়েছে। তাই ওরা অমন করছে। আঙ্গোপেনকে যারা বয়ে নিয়ে চলেছে তাদের বাহ্যজ্ঞান আছে বলে মনে হল না। আঙ্গোপেন নাকি চলেছেন স্বইচ্ছায়। বাহকরা তাঁর নির্দেশে কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে—কখনও বা পাশের ভিড় ঠেলে চলেছে পাশের দিকে। শেষ পর্যন্ত আঙ্গোপেন এসে পৌঁছলেন হাটতলায়। শিঙে বাজলো, টোরি বাজল, বাজল কত বাদ্যযন্ত্র। উলুধ্বনি দিল মেয়েরা। খইয়ের মতো কী যেন ছড়িয়ে দিল বারে বারে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম, না, খই নয়—ঐ রকম দেখতে কোন শস্য। আঙ্গোপেন হাটতলায় দাঁড়ালেন না

কোথাও। যেমন হুড়মুড় করে ঢুকলেন একদিক দিয়ে তেমনিই হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন আর একদিক দিয়ে। যাদের উপর দেবতার ভর হয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ পড়ে রইল। কাটা মাছের মতো লাফাতে লাগলো। কেউ দু'ঘটি জল ঢাললো মাথায়, কেউ হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। কোথায় কে জানে।

মেলার পূর্ব দিকে একটা বড় জমায়েত। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। মোরগের লড়াই হচ্ছে। আর হচ্ছে রণপায়ের লড়াই। মোরগ-লড়াই আগেও দেখেছি, রণপায়ের লড়াইটা নতুন। সেটাই দেখলাম খানিকক্ষণ। মনে পড়ল মুরভেন্দে দেখা রণপা নাচ। মুরভেন্দে একটা ওয়ার্ক-সেন্টার তৈরি করার কাজ ছিল। মাঝে মাঝে যেতে হত সেখানে। সেখানেই দেখেছিলাম একবার রণপা নাচ। রণপা কিছু নতুন জিনিস নয়। বাংলাদেশেও দেখেছি। গল্প শুনেছি, সে যুগে ডাকাতেরা রণপার উপর চড়ে রাতারাতি এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ডাকাতি করতে যেত। কিন্তু রণপার উপর চড়ে যে তালে তালে নাচা যায় এটা জানা ছিল না। সেবার তাই দেখেছিলাম মুরভেন্দে। এবার দেখলাম রণপায়ের লড়াই। দু-জনেই রণপায় চড়েছে—চেঁটা করছে অপরজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে। কিন্তু দুজনেরই এমন ব্যালেন্স, পড়িপড়ি করেও শেষ পর্যন্ত পড়ে না। সামলে নিয়ে আবার তেড়ে আসে।

হাটের পিছনে দুটো নাগরদোলা খাটিয়েছে যেন কারা। প্রচণ্ড ভিড় সেখানটায়। আদিবাসীদের খুব লোভ দেখলাম নাগরদোলায় চড়তে। দল বেঁধে উঠছে আর হো হো করে হাসছে। কেউ কেউ আবার অনেক উৎসাহ নিয়ে উঠেই মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে বসে পড়ছে। মাথা ঘুরছে আর কি। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম সেখানে। না দাঁড়ালেই বোধ করি ভালো করতাম। দূর থেকে এ আনন্দের উৎসটিকে একনজর দেখেই যদি চলে যেতাম তাহলে মনটা এমন বিষিয়ে উঠত না—কেন মরতে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলাম! একটু দাঁড়াতেই নজরে পড়ল শুধু আদিবাসীরাই নয়, নাগরদোলায় উঠছে একদল সভ্য জগতের নাগরিকও। স্থানীয় লোক নয়। চাকরি-সূত্রে যারা নারানপুরের কাছেপিঠে থাকে তারা এসে জুটেছে মেলায়। তাদেরই একটা দল। কাল রাত্রে মোহন বলেছিল—‘হরেক রকমের মানুষ এই মণ্ডকায় মেলায় আসে মজা লুটতে।’ আজ সকালে সেই রাজগোণ্ড লোকদুটিও কথা প্রসঙ্গে বলে ছিল আমি মেলায় এসেছি—মজা লুটতে। ‘মজা লোটা’ বস্তুটার অর্থ তখন বুঝিনি, এতক্ষণে দিব্যদৃষ্টি খুলছে।

আওয়ারা বুশ শার্ট গায়ে গগল্‌স্ চোখে সিগারেট ঠোঁটে ঐ কজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। নাগরদোলার মালিক তা জানে। আদিবাসীদের কাছ থেকে সে নিচ্ছে এক পয়সা আর আওয়ারাবাবুদের কাছ থেকে নিচ্ছে চার আশা। তাই তার আপত্তি নেই। তাছাড়া দেখার মধ্যেও তো কিছুটা মজা আছে! সেটা তো যুফৎ। এক এক দোলনায় চারটি আসন। দুটি বা তিনটি মেয়ে কোন দোলনায় উঠলেই আওয়ারা দলের একজনের ডাক পড়ে। তারপর নাগর-দোলা যখন ঘুরতে থাকে তখন নাগর কী করেন কে আর দেখতে যাচ্ছে? নাগর-দোলা থামলে বিপর্যস্ত কাপড়-চোপড় সামলে মেয়েগুলো পালাবার পথ খোঁজে আর আওয়ারাবাবু খাঁকখাঁক করে হাসতে হাসতে বন্ধুদের কাছে এসে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পূর্ববর্তী

নাগরের চেয়ে তিনি যে আরও একধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছেন এটা প্রমাণ করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। মনে হল বাধা দেওয়া উচিত। মেলা অথরিটির কাছে গিয়ে কমপ্লেন করা উচিত। কিন্তু অনেক উচিত কাজ আমরা করি না নোংরামি এড়াবার জন্যেই। তবু কথা প্রসঙ্গে গুপ্তেজীকে বললাম। ভেবে দেখলাম, ব্যবস্থা যা করার তা ঠাঁর মারফতেই হওয়া উচিত। শুনে গুপ্তেজী তো একেবারে ক্ষেপে আগুন। তৎক্ষণাৎ ছুটলেন নাগর-দোলা মুখো। আমি পিছু পিছু। একটা বিদ্রী়ী সিন হবে মনে করে আমি সেখান থেকে সঙ্কোচে সরে এসেছি, উনি বুনোমোষের মতো ভিড় ঠেলে ছুটলেন সেদিকে। ভেবেছিলাম, খুব কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করবেন উনি। কোথায় কী! উনি সোজা গিয়ে চেপে ধরলেন নাগরদোলা মালিকের শার্টের কলার। লোকটা তো ভ্যাচাকা।

অপরাধটা কী, তা বুঝবার আগেই ওর গলার বোতামটা ছিঁড়ল পট করে। অপরাধটা শুনে স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে কিংবা অস্বীকার করে বিচার চাইবে তা স্থির করার আগেই গালে পড়ল প্রচণ্ড চড়। দেখলাম, আওয়ারাবাবুর দল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে যে যেদিকে পারে। শেষ পর্যন্ত নাগরদোলার মালিক জড়িয়ে ধরল ঠাঁর পা! রুদ্রনাটকের পড়ল যবনিকা!

মনে মনে বললুম—ছি ছি ছি! এই কি অফিসারোচিত ব্যবহার! অফিসার তো আমরাও। আমরা কি অভিযোগ পাই না? তদন্ত করি না? কিন্তু তার একটা নিয়ম তো আছে। অভিযোগ এলেই প্রথম কাজ হল—একটা নতুন ফাইল খোলা। তারপর এনকোয়ারি অফিসার নির্বাচন। তৃতীয়ত তাকে তদন্তের কতকগুলো ডেফিনিট পয়েন্ট-অফ-রেফারেন্স দেওয়া। চতুর্থ কাজ অধীন কর্মচারীর রিপোর্ট যতদিন না টেবিলে ‘পুট-আপ’ করা হচ্ছে ততদিন সে কথা ভুলে থাকা। আর এ ভদ্রলোক প্রথমেই বাঁ হাতে ধরলেন জামার কলার, দ্বিতীয়ত ডান হাতে চালালেন চড়! এ আবার কোন জাতের অফিসারি?

মনে হল ঠিকই বলেছিলেন ত্রিবেদী। এ লোক জংলীদের মধ্যে দিনরাত মেলামেশা করতে গিয়ে শ্রেফ জংলী হয়ে গেছে।

বিকালবেলা ঘুরতে ঘুরতে দেখি, কারাংমেটার দলও এসে গেছে। মেলাতলার পূর্বদিকে আসর জমিয়ে বসেছে ওরা। আমাদের দেখে জোহার করল সবাই। আমিও প্রতি-জোহার করলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু শুনলাম, রাত্রে নাচ হবে। কাল রবিবার। নেহাত আমার অনুরোধেই গুপ্তেজী আর-একটা রাত থেকে যেতে রাজি হলেন। মোহন এ বেলায় মাংস খাওয়াল। মুরগির মাংস আর পরোটা। শীতের আমেজটা কাটেনি, তবু মোহন দেখছি এবেলা গায়ে চড়িয়েছে ঘিয়ে রঙের ফিনফিনে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি। সাজগোজও বেশ একটু করেছে মনে হল। স্বাভাবিক। এ-বেলায় সাহেবসুবোধের আসবার কথা। মেমসাহেব আর মিসিবাবার দলও আসতে শুরু করেছেন মেলা দেখতে। আজ একটু পাউডার একটু সেন্ট চাই বইকি। জেলার বড়কর্তারা অনেকেই এসেছেন। কোকামেটার মতো দুর্গম নয় নারানপুর। মেলাতলার সামনে

সারি সারি মটোর গাড়ি। তার চৌদ্দ আনা সরকারি। মহিলারাও অনেকে এসেছেন কর্তাদের সঙ্গদান করতে। আলাপ ছিল দু-একজনের সঙ্গে। তাঁদেরই একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল হঠাৎ। দেখা হতে ঘাড় কাৎ করে ‘নড্’ করে বললেন, এটু টু বুটে।

বুঝলাম, জগদলপুর থেকে জঙ্গলে এসে ওঁর আর এক ধাপ উন্নতি হয়েছে! ইংরেজি ছেড়ে এবার ল্যাটিন-ফ্রেঞ্চ শুরু করছেন। ভদ্রমহিলার মাতৃভূমি ভারতবর্ষেই, মাতৃভাষা হিন্দি। এতদিন ধারণা ছিল, উনি বুঝি মৌলানা আজাদ সাহেবের উল্টো প্রতিজ্ঞাটা করে রেখেছেন। বরাবর হিন্দিতে প্রশ্ন করে ইংরেজিতে জবাব পেয়েছি। এই প্রথম ওঁর মুখে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা শোনা গেল।

বললুম : ‘দাউ টু বুটাস্’ কেন ?

—আপনার কিছু রুচিজ্ঞান আছে মনে হয়েছিল। নরকে শেষ পর্যন্ত আপনিও এসে জুটেছেন ?

এটা যে নরক এই মতামতটা মেনে নিয়ে সায় দিয়ে যাওয়াই বোধকরি ভদ্রতা। কিন্তু দুদিন গুপ্তেজীর সঙ্গে মেশামেশির পাপে ফস্ করে বলে বসলুম, ঠিক ঐ কথাই যে আমি বলতে যাচ্ছিলুম।

ভদ্রমহিলা অপ্রতিভ হলেন না একতিল। বললেন, এসেছি কি সাধে ? জয়দীপকে তো জানেন ? যা ঝাঁক ধরবে, তাই করবে। ধরে নিয়ে এসেছে জোর করে। বউ সাথে নিয়ে ট্যারে যাওয়া জি-ও করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

কিছু ভাষ্য প্রয়োজন। প্রথমত জয়দীপ মেহুরা ওঁর স্বামী ; দ্বিতীয়ত, ‘জি-ও’র অর্থ গভর্নমেন্ট অডার। সরকারি কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলেন, এঁরাও সেই ভাষাটা নকল করতে চান। প্রমাণ দিতে চান সহধর্মিণী কথার অর্থ কত ব্যাপক। মাসের শেষ সপ্তাহে যখন দেখেন মাসকাবারি টাকা ফুঁকে দেওয়া গেছে, দৈনিক বাজারের টাকায় ঘাটতি পড়েছে, তখন কর্তার কাছে হাত-পাতাকে বলেন, রিভাইসড বাজেট-ডিমান্ড! শাশুড়ি ঠাকরুণ যখন পত্রযোগে অভিযোগ করেন—‘তোমাদের এর আগেও দু-দুখানা চিঠি লিখে জবাব পাইনি, কেমন আছ জানিয়ে বুড়ো-বুড়িকে নিশ্চিত কর,’ তখন সে পত্রকে বলেন, ‘থার্ড-রিমাইন্ডার’ ; এবং যতদিন ক্লাব পার্টি-সোস্যালের ফাঁকে তার জবাব লিখে উঠতে না পারেন, ততদিন সে পত্রখানির অভিধা ‘পি.ইউ.ডি’! এঁরা চলনে অফিসারনি, বলনে আই-এ-এসনি !

বললাম, জোর করে যখন ধরে এনেছেন, তখন গাড়িতেই বসে থাকুন। নামবেন না। যা ধুলো !

নিরীহের মতো বললেও এটা যে বক্রোক্তি, তা অনুমান করেছেন উনি। বলেন, কিন্তু আপনাকে তো কেউ ধরে আনেনি, আপনি এ-নরকে মরতে এসেছেন কেন ?

মনে ভাবি রমানাথের যুক্তিটা এক্ষেত্রে প্রয়োগ না করাই বিধেয়। ‘মানবিকতার উৎস সন্ধানে এসেছি’—এ কথা আর যাকে হোক ঐ নাইলন-ভূষিতাকে বলার আগে, হে ঈশ্বর, তুমি আমার বাকরোধ কর। বলি, এসেছি গুপ্তেজীর পাল্লায় পড়ে। মিস্টার

মেহরার চেয়ে কম নাছোড়বান্দা নন উনি !

ভাগ্য ভালো। দেখলাম উনিও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। বলেন, তা আর নয়! বদ্ধ পাগল আপনাদের ঐ গুপ্তে। না হলে তহশীলদারের চাকরি ছেড়ে এই চাকরির জন্যে অপশান্ দেয়? তহশীলদার হলে তবু দু পয়সা নাড়াচাড়া করতে পারত। দুই-ডিসবাসি-এর ক্ষমতা থাকত। অবশ্য টাইবাল ওয়েলফেয়ারেও অনেক টাকা গাজেট-প্রভিশন আছে এবার।

নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে সাড়া দিলাম : যা—ই!

কেউ ডাকেনি। ভদ্রমহিলাকে বলি, গুপ্তেজী ডাকছেন, পাগল মানুষ তো। যাই গুনে আসি।

হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ওঁর উদ্দেশ্যে একটা গোঁজামিল নমস্কার ছুঁড়ে দিয়ে যবনিকা টানলাম এ আলাপের। নেপথ্যের যেদিক থেকে কাল্পনিক আহ্বান গুনে সাড়া দিয়েছিলাম, সেদিকে রওনা হয়ে পড়ি দ্রুতপদে।



বাইসন হর্ন নাচ

অদ্ভুত জীব ঐরা। মাড়াই দেখতে এসেছেন হাত-পা-মুখ-ঘাড় চুনকাম করে। চানভঙ্গী যদিও ষোড়শীসুলভ, কিন্তু খাটো চোলীর অবরোহে প্রকাশমান উদর-উর্মিমাল্য দেখে মনে হয়, অন্তত বছর ত্রিশেক ঘি-দুধ দিয়ে যত্ন না নিলে

খাঁজে খাঁজে এত 'স্নেহের' লহরী সঞ্চিত হত না। হাটতলায় কার্পেট পাতা নেই, এ কথা অনুমান করা শক্ত নয়। তাহলে ঐ সোনালী কাজ করা ভেলভেটের চপ্পল পরে মাড়াই দেখতে আসবার অর্থ? আমার অনেক অর্থ, দু-এক জোড়া নষ্ট হলে ক্রম্পেপ করি না, এটা প্রমাণ করা? দেখবার এত জিনিস থাকতে মাড়াইয়ে এসে উনি দেখলেন মিস্ মেয়োর মতো শুধু নরকটাকেই। আলাপ করবার এত বিষয় থাকতে উনি এনে ফেললেন সরকারি চাকুরিয়াদের ধ্যান-জ্ঞান-মোক্ষের প্রসঙ্গকে—চাকরির সুবিধা ও উন্নতি। আর কী নগ্ন, কী অশ্লীল! নাইলনের স্বচ্ছতায় অ্যাশ্বিনাস মেইডেন — ফর্মের ঔদ্ধত্য সুপ্রকট — যেন আবরণ নয়, উদ্ঘাটনই ওঁর সাজের বীজমন্ত্র! মেলাতলায় হাজারটা নিরাবরণ মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায়—কিন্তু ওঁর ঐ আভারলাইন করা সাজের দিকে তাকালেই দৃষ্টি নত হয়ে আসে। তবু যেন ওঁর তৃপ্তি নেই, আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনেক টাকার ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে—এ কথা বলার মধ্যে দেহ নয়, ওঁর মনের যে নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল, তারপর কাল্পনিক আহ্বান শোনা ছাড়া আমার গতান্তর ছিল না।

সন্ধ্যার পর কোথায় মেলাটা জমবে, তা নয় বিমিয়ে এল। ব্যাপার কী? শুনলাম আদিবাসীরা যে-যার দলে চলে গেছে। রান্নাবান্না করছে, আহ্বারাদি সারছে। ঘুরে ফিরে আবার বসলাম মোহনের দোকানে। মোহন নেই, ওর ছোকরা চাকর চা দিয়ে গেল—সেই অনবদ্য স্পেশাল চা। গুপ্তেজীর বড়কর্তা এসেছেন। তিনি ব্যস্ত। একাই ঘুরতে থাকি উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। অন্ধকার হয়ে গেছে। মেলাতলায় তবু আলো আছে। হাজারক, পেট্রোমাক্স, কারবাইড....বাইরে অন্ধকার। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে। রান্না হচ্ছে। কেউ কেউ আহ্বারে বসেছে। ছেলেমেয়েদের মিলিত দল হৈ-হুল্লোড় করছে। কারাংমেটা দলের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। আট-দশজন ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে। পা টলছে অনেকের। নেশা হয়েছে আর কি। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, আমাকে ঘেরাও করে ফেললে। সবাই একসাথে হাত পেতে কী যেন চাইছে। কী আবার চাইবে, পয়সা নিশ্চয়। খুচরা পয়সা কিছু দিলাম ওদের শিরদারের হাতে। রীতিমত নেশা হয়েছে তার। ইচ্ছিত করে বললাম, ভাগ করে নাও সকলে!

নিল না। আমার বুকপকেটেই পয়সাগুলো ফেলে দিল ফের। বুঝতে পারি, এত অল্প পয়সায় ওরা খুশি নয়। একটা টাকা দেব কিনা ভাবছি হঠাৎ একটি ছেলে ফস করে আমার হাত থেকে কেড়ে নিল জ্বলন্ত সিগারেটটা। হুস হুস করে টানতে শুরু করে। বাকি কজন রইল হাত পেতে। এবার বুঝলাম। ক্যাপস্টানের প্যাকেটটা বার করতেই ফুঁয়ে উড়ে গেল যেন! ওরা জোহার করে বিদায় নিল। ঠেকে শিখছি ক্রমশ। এবার সস্তা সিগারেট কিছু কিনে রাখলাম ভবিষ্যতের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ বসল নাচের আসর। মাঠের এখানে-ওখানে বাজছে বাদ্যযন্ত্র—কিন্তু নীরঞ্জ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। নাচ জমল না। মনে হল বৃথাই থেকে গেলাম রাতটা। সন্ধ্যাবেলা ফিরে গেলেই ভাল হত। গাছতলায় ঝোপে-ঝোড়ে অনেকে-জোড়ায়-জোড়ায় গল্প করছে, হাসি মস্করা করছে। শানিত

কণ্ঠের শীৎকার শোনা যাচ্ছে এ-ঝোপে ও-ঝোপে — খিলখিল হাসি। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। অধিকাংশ চেলিকই গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়েছে প্রিয় মোটিয়ারীদের। কোথাও বা নিরালায় শয্যা পেতেছে কেউ কেউ। টর্চের আলোয় পথ দেখে নেবার সময় সতর্ক থাকতে হচ্ছিল। অতর্কিতে আলো ফেলে কোন কপোত-কপোতীকে না বিব্রত করে ফেলি।

মনে হল, এভাবে ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। তার চেয়ে গুপ্তেশ্বরসাহেবকে ডেকে নিয়ে ফেরার আয়োজন করা যাক। এখন রওনা দিলে রাত বারোটা নাগাদ জগদলপুর পৌঁছানো যাবে।

গুপ্তেশ্বরী আছেন তাঁর বড়কর্তার কাছে ডাকবাংলোতে। মেলাতলা থেকে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে-চলা শর্টকাট পথ আছে ডাকবাংলোতে যাবার। পথটা নির্জন। সেই পায়ে-চলা পথ ধরেই এগিয়ে চললাম টর্চের আলোয় সাবধানে পথ দেখে। শীতের শেষ। সাপের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়। ক্রমে মেলাতলার কলগুঞ্জন স্তিমিত হয়ে এল। সার্কাসের তাঁবুর সামনে খাটানো মাইকটার কর্কশ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু। কখনও গোণ্ডি, কখনও হালবি, কখনও বা মাড়িয়া ভাষায় ঘোষিত হচ্ছে: চলে আসুন, এফুনি খেল শুরু হবে আমাদের। বাঁদরের খেলা, ঘোড়ার খেলা, এক মানুষের দুটো মাথা। এই শেষ হয়ে গেল। চলে আসুন।

ক্রমে সে শব্দও ক্ষীণ হয়ে এল। অন্যমনস্কের মত পথ চলছি আর ভাবছি, আজকের সারাদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

হঠাৎ পাশের জঙ্গলের মধ্যে থেকে শুধু একটা গোঙানি নয়, একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ। টর্চ ফেললাম সেদিকে। না, কিছু দেখা যায় না। কিন্তু না, একটা কিছু হচ্ছে ঝোপের পিছনটায়। কুড়িয়ে নিলাম একটা ভারী পাথর। একটু জঙ্গলের ভিতর এগিয়ে যেতেই বৃষ্টি, মানুষ আছে ওখানে। সাদা বাংলায় বলি, কে ওখানে?

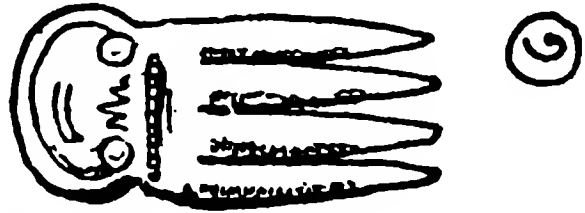
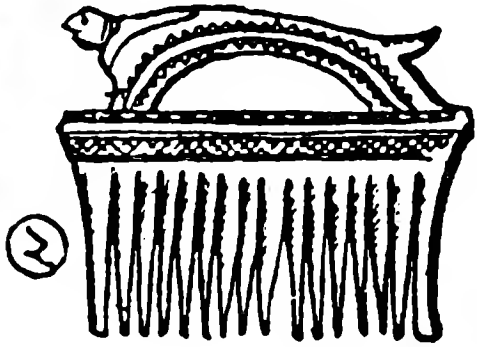
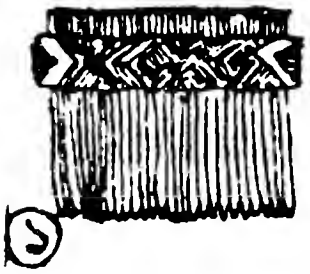
থেমে গেল ধস্তাধস্তিটা।

সেদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, কে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা মারল আমাকে। আক্রমণের জন্যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক ছিল, না হলে উল্টে পড়ে যেতাম সে অতর্কিত ধাক্কায়। শুধু হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ল। পর পর দুটো লোক ছুটে বেরিয়ে গেল আমার গায়ের উপর দিয়ে। ওরা কোন জানোয়ার নয়। মেলার এত কাছাকাছি কোন বন্য জন্তু আসবে না। আমার ডান হাতে তখনও আছে সেই ভারী পাথরটা। অন্ধকারের মধ্যেই ছুঁড়ে মারলাম সেটা। লাগলো না। দু-জোড়া পদধ্বনি মিলিয়ে গেল বনবাদাড় ভেঙে মেলাতলার দিকে। টর্চটা তুলে নিলাম। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। নিজের পথ ধরব, হঠাৎ কানে গেল ঝোপের ভিতর কে যেন কাঁদছে। সেদিকে আলো ফেলতেই দেখতে পেলাম একটা বীভৎস দৃশ্য। সম্পূর্ণ নিরাবরণ একটি মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াচ্ছে—খুঁজছে তার পরিধেয় বস্ত্র।

আলোটা নিভিয়ে দিলাম। মিনিট-দুয়েক অপেক্ষা করে আবার বাতি জ্বালাতে দেখি মেয়েটি সামলে নিয়েছে নিজেকে। কাপড়টা পরেছে। একটু আগে সে কাঁদছিল, চোখের কোলে চিক্ চিক্ করছে জল। এই মুহূর্তটিতে সে কিষ্ট আর কাঁদছে না।

একট গাছ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত হয়ে। দুহাতে দুটি পাথর। চোখ দুটো স্থলছে তার বাঘিনীর মতো। বুঝলাম, আমাকে সে প্রতিপক্ষ মনে করছে। আমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে মুহূর্ত গুনছে।

দূরে সরে আসি। টর্চের আলো দিয়ে ইঙ্গিত করলাম আমাকে অনুসরণ করতে। আমার পিছু পিছু সে টলতে টলতে বেরিয়ে এল জঙ্গল ছেড়ে, পায়ে-চলা পথে। সেখানে দাঁড়ালাম চূপ করে। মেয়েটি নিজের পথ চিনে নিক—আমি শুধু আলো ছেলে ওকে অনুসরণ করব। মেলাতলায় পৌঁছে দেব। ইঙ্গিত করলাম ওকে আগে যেতে। আমি দাঁড়িয়ে পড়তেই ও থমকে দাঁড়ালো। আবার সেই কঠিন ভঙ্গিতে গাছের গায়ে সঁটে গেল। আমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ার কদর্থ করেছে মেয়েটি। ভাষা জানি না, কেমন করে একে বোঝাব যে আমাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশের পল্লীবালা সে নয়। পুরুষমানুষের সঙ্গে সে মিশতে অভ্যস্ত। তাহলে আমাকে এতটা ভয় পাচ্ছে কেন? নির্জনতার জন্যে? অন্ধকারের জন্যে? নাকি আমার ভদ্রপোশাকের জন্যে? আমি বিজাতীয় বলে? অথবা যারা ওকে এই জঙ্গলে ধরে এনেছিল, যারা ছুটে পালিয়ে গেল, তাদের অত্যাচারে ওর মন এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই! আবার টর্চের আলোয় ইঙ্গিত করলাম ওকে আগে যেতে। মেয়েটি কী ভাবছে, তা অনুমান করবার জন্যে আলো ফেললাম ওর মুখে। আরে, এ যে রঙিলা। কারাংমেটার বেলোসা। যন্ত্রণায় সুন্দর মুখটা বিকৃত।

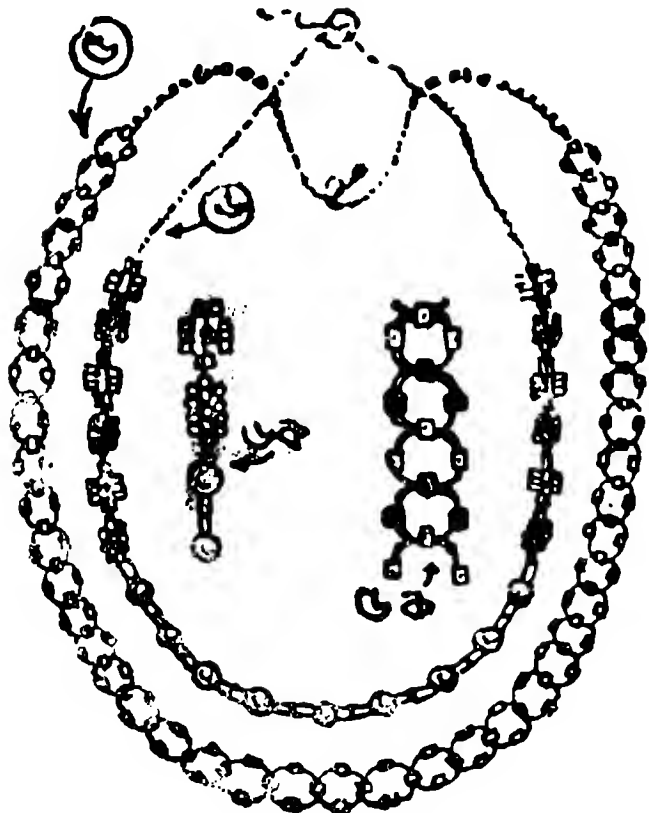
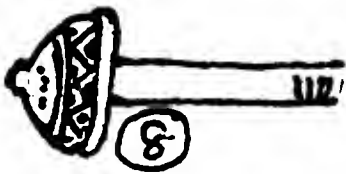
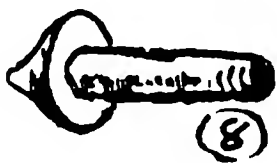
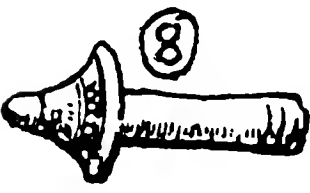


(১) কাঁকুই — বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী

(২) ঐ কাঠের

(৩) ঐ সৌখিন

(৪) ধাতব কণাভরণ



(৫) পুঁথির মালা

(৬ ক) ঐ বিস্তারিত

(৬) পুঁথির মালা

(৬ ক) ঐ বিস্তারিত

(৭) চুলের কাঁটা

আগে আলোয় চোখ মুদেছিল মেয়েটি। নাম ধরে ডাকতেই সম্বিত ফিরে পেল। সোজা বাংলায় বললুম : ভয় নেই, তুমি আগে আগে যাও। তোমাকে মেলায় শীঘ্র দেব।

মানুষ-মানুষে একটা অন্তরের যোগ আছে। রঙিলা চিনতে পারল আমাকে। মান হাসল। এগিয়ে গেল আমাকে অতিক্রম করে। অনুসরণ করলাম আমি। দু-এক পা তলতেই দেখি, বিপরীত দিক থেকে কে যেন আসছে। আমাকে ধাক্কা মেরে যারা দল গিয়েছিল, তাদেরই একজন বোধ হয়। আমি সতর্ক হই! প্রয়োজন ছিল না। তা গিরে তল, সে কারাংমেটার শিরদার। আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রঙিলা তাকে কী যেন বলল। আমার পরিচয় দিল বোধ হয়। শিরদার নিশ্চিত্ত হল। আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রঙিলাকে টেনে নিল বুকে।

চিঠি নিয়ে দিলাম। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী। ভাবছিলাম কখন কথাই। আমার সম্মুখেই ও যে রঙিলাকে অসংকোচে বুকে টেনে নিল তার দাঁড়ী? বিপদমুক্ত প্রেমিকযুগলের মিলনানন্দের প্লাবনে আমার উপস্থিতির সঙ্কোচ কি তোসে গেল? নাকি ওরা অপরের উপস্থিতিতে এরকম আচরণ করতে অভ্যস্ত? তা হলে ওক, ওর আলিঙ্গনের ভঙ্গিটা দেখে মনে হল, মানুষের হৃদয়বৃত্তির প্রকাশভঙ্গি কখন কখন শিক্ষা-সভ্যতার অতিরিক্ত একটা কিছু। শিরদারের দুই বাহু প্রসারিত করে সামনে আসা আর বেলোসার পক্ষে বাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে আশ্রয় খোঁজার মধ্যে সে মিলনের দৃশ্যটি ফুটে উঠল, তা সর্বকালের জিনিস। তা এত নিখুঁত যে, দুনিয়ার মানবীয় স্তম্ভযুতে পরিচালকও এ-দৃশ্য দেখলে বলতেন : ফাইনাল শট! নো রিটেকিং!

একটু আগে বেলোসাকে সাদা বাংলায় শুনিয়েছিলাম অভয়বাণী—অনায়াসে গুলি নিয়েছিল মেয়েটি। আর্ত, ভীত কাউকে অভয় দেওয়ার যে ভঙ্গি, তাও তাহলে পার্বতীনা। মনে পড়ল, মুরভেন্দে দেখা একটা মায়ের মূর্তি। হাটতলার প্রান্তে তার শিশুগুলিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। কোলে নয়, একফালি ন্যাকড়া দিয়ে ন্যাকড়াটিকে বেঁধে নিয়েছে বুকের সঙ্গে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে স্তন্যপানরত শিশুর। সে গাউনের মধ্যে যে মাতৃস্নেহের ব্যঞ্জনা দেখেছিলাম, তার সঙ্গে যশোদামাতা, মেরীমাতার পার্থক্য কোথায়? মানুষের যে আদিম বৃত্তি, তা নিশ্চয় দেশকালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে না।

একটু অপেক্ষা করে ফের আলো জ্বাললাম। নির্লজ্জ। ওরা তখনও অলিঙ্গনাবদ্ধ। শিরদার মেয়েটির গায়ে-মাথায় হাত বুলাচ্ছে আর বেলোসা কী যেন বলছে। একটু ভাববে। বুঝলাম, এরপর আমি অনাবশ্যক। শিরদারও হাতের ইঙ্গিতে আমাকে অপেক্ষা বললে। অন্ধকারের মধ্যেই ওরা মিলিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

কি এ কী? আমার বাঁ হাতে এটা কী? একটুকরো ন্যাকড়া! এতক্ষণে মনে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে আমি অন্ধকারের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমার বাঁ হাত, এটা হস্তচ্যুত হতেই। হ্যাঁ, কিছু একটা ধরেওছিলাম, কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি। অতক্ষণে টর্চের আলোয় দেখি সেটা একটা সিল্কের টুকরো। ঘিয়ে রঙের দামি সিল্কের কাটা ছোট্ট টুকরো।

ফিরে চললাম মেলাতলায়। মোহনের দোকানে গিয়ে দেখি, মোহন নেই। ছোকরা চাকরটাকে প্রশ্ন করলাম, মোহনবাবু কোথায় ?

বললে—ভিতরে।

—ডেকে দাও। বল আমি ডাকছি।

ছোকরা ভিতরে গেল। ফিরে এসে বললে, বাবুর তবীয়ৎ খারাপ। এখন দেখা হবে না।

খুন চেপে গেল আমার মাথায়। বললাম, আমিই ভিতরে যাব। পথ দেখিয়ে নিয়ে চল আমাকে।

ছোকরা কিন্তু রাজি হল না। সে আবার ভিতরে গেল প্রভুকে সে কথা জানাতে। একটু পরেই বেরিয়ে এল মোহন। তার পরিধানে একটা হাফশাট। ভ্রুকুটি করে কঠিন কণ্ঠে বললে, কী চাই ?

সিঙ্কের টুকরোটা তার চোখের সামনে মেলে ধরে বললাম, এই কোয়ালিটির সিঙ্ক কোথায় পাওয়া যায় জান ?

মোহন একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। মনে হল তার চোখ দুটো জ্বলছে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললে, জগদলপুরে পেতে পারেন।

—তোমাকে এই রঙের একটা পাঞ্জাবি পরতে দেখেছিলাম বিকালে, সেটা তুমি কোথায় কিনেছিলে ?

মোহন কঠিনতর স্বরে বললে, ঠিক মনে নেই।

—সেই পাঞ্জাবিটা একবার নিয়ে আসবে ?

মোহনের মুখ থেকে একটা মুখোশ খুলে পড়ল এবার। নিম্নস্বরে বললে, বাবুজি, মেলায় মজা লুটতে এসেছেন, পরের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। যদি নিজের মঙ্গল চান, তাহলে চুপচাপ সরে পড়ুন।

বুঝলাম, এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলে কোন ফল হবে না। অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন। মোহন এখানকার বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী, আর তাছাড়া একা মোহনই কি এসেছে ‘মজা লুটতে’ ? সভ্যজগতের আমরা অনেকে তো এসেছি এইসব অসভ্য মাড়িয়া-মুরিয়া-ভাত্রা-পরজাদের সভ্য করে তুলতে।

বললাম, বেশ চলেই যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা। ঐ ক্যালেন্ডারখানা রাখার কোন অধিকার তোমার নেই। ওটা আমি নিয়ে যাব।

মোহন প্রতিবাদ করল না।

ওর দেওয়াল থেকে দেওয়াল-পঞ্জিটাকে আমি নামিয়ে নিলাম।

ফেরার পথে গুপ্তেজী বলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কী হল বলুন তো ? আর একটা রাত মোহনের আড়তে কাটিয়ে এলে কী ক্ষতি হত ?

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, ক্ষতি হত। সে কথা জগদলপুরে ফিরে বলব।

গাড়িতে আর কোন কথা হয়নি। গাড়ির দোলানিতে দিব্যি ঘুমিয়ে নিলেন গুপ্তে সাহেব, আমার কিন্তু ঘুম এল না। চোখ বুঁজলেই চোখের উপর ভেসে উঠছিল সম্পূর্ণ নিরাবরণ সেই মেয়েটির অসহায় মূর্তি—অন্ধকারের মধ্যে তার পরিধেয় বস্ত্রের উদ্দেশ্যে

আর্ত অন্বেষণ। আমরা, সভ্যজগতের মানুষেরা, সাধুর ভেক ধরে ওদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছি, হোয়াইট মেন্‌স্‌ বোর্ডেনের নবতম সংস্করণ। বিদেশী ইংরাজ-ফরাসি পর্তুগিজরা একদিন যেমন অসীম ত্যাগ স্বীকার করে সভ্যতার আলোক-বর্তিকা হাতে এসেছিল এ ভারত অরণ্যে, আমাদের শিশু-বিবাহ, আমাদের সতীদাহ প্রথা, আমাদের ঠগীর হাত থেকে ত্রাণ করতে—আজ তেমনি পাঞ্জাবি-গুজরাতি-বাঙালির দল জ্ঞানাজ্ঞানশলাকা হাতে আসছে দণ্ডকারণ্যে! আমরা ওদের সুসভ্য করে তুলবার ব্রত নিয়েছি! কোন্‌ দুর্মুখ বলে আমরা কেড়ে নিতে এসেছি সুখ শান্তি, ওদের অভাব-বোধের অভাব, মায় ওদের মেয়েদের কটিদেশের স্বল্পতম পরিধেয় বস্ত্র!

জগদলপুরে পৌঁছে গুপ্তে-সাহেব বললেন, রাত্রে আপনি থাকবেন কোথায়?

—ধরমপুরা কলোনিতে—আমাদের সার্কিট হাউসে।

—কিন্তু রাত যে এদিকে দেড়টা। যদি সব ঘর ভর্তি থাকে?

আমি জবাব দেবার আগেই ফের বললেন, তার চেয়ে এক কাজ করুন। চলুন আমার সাথে। আমার ঘরেই রাতের বাকি ক’ঘণ্টা কাটিয়ে দেবেন।

গুপ্তেজী ব্যাচেলার। কনফার্মড ব্যাচেলার বলা চলে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। ছোট্ট বাড়ি। দু কামরার। বাইরের ঘরে খানকয়েক ফটো। আদিবাসী জীবনের। কয়েকটি মুখোশ রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো। কাঁসা-পিতলের কয়েকটি মূর্তি টেবিলে সাজানো। সবই আদিবাসীদের! মায় দেওয়ালের পেরেক থেকে ঝুলছে মাড়িয়া ধনুক।

বাড়তি খাটিয়া ছিল। ঘুম-ঘুম-চোখে চাকরে পেতে দিল সেটা। গুপ্তেজী আমাকে হাত লাগাতে দিলেন না। চাকরের সঙ্গে ধরাধরি করে তার উপর আমার বিছানাটা পাততে থাকেন। আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম দেওয়ালের ফটোগুলিকে। হংস-মধ্যে-বক-যথা এক আলখাল্লাধারী সাহেবের ফটো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—এটি কার?

চাদরটা বিছনায় পেতে দিয়ে চোখ তুলে গুপ্তেজী বলেন, রেভারেন্ড আর্নেস্ট স্টোনের। তারপর বললেন—এই দণ্ডকারণ্যেই আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতেন। ছোট্ট একটি হাসপাতাল ছিল, চার্চ ছিল, আর ছিল রেভারেন্ড-সাহেবের খড়ো-চাল ঘর। উনিশ শ’চল্লিশে চুরাশি বছরের বৃদ্ধ মারা গেছেন।

বললাম, বিশ বছর আগে মারা গেছেন? আপনি তাহলে তাঁর ফটো পেলেন কোথায়? আর তাঁর ছবিই বা টাঙিয়ে রেখেছেন কেন?

একটু দেরি হল জবাবটা দিতে। তারপর বলেন, আদিবাসী উন্নয়নের কাজে উনি হচ্ছেন আমাদের পূর্বসূরী, কিন্তু সেকথা যাক। আপনার প্রতিশ্রুতিটা কি কাল সকালে পালন করবেন?

—কোন্‌ প্রতিশ্রুতি? ও, সেই কেন অমন করে চলে এলাম?

—হ্যাঁ। যদি না খুব ক্লান্ত বোধ করেন।

বললাম, না। বরং ঘটনাটা বলে মনটা হালকা করে ফেলতে পারলেই বোধহয় ঘুমটা আসবে।

—বলুন তাহলে।

আনুপূর্বিক বলে গেলাম মোহন-বেলোসা উপাখ্যান। টেবিলের উপর রাখলাম রবীন্দ্রনাথের ক্যালন্ডারখানা। বললাম, আর কিছু করতে পারিনি, এই ছবিখানা শুধু আমি কেড়ে নিয়ে এসেছি ওর ঘর থেকে। বলেছি, এটা রাখার অধিকার তোমার নেই।

গল্প শেষ হতেই খাট থেকে উঠে পড়েছিলেন উনি। নিঃশব্দে পায়চারি করছিলেন খাটিয়ার পিছনের সঙ্কীর্ণ ফালিটুকুতে। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ, চোয়ালের হনুটা উঁচু হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে পায়চারী করছেন ক্রমাগত। হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, কিন্তু তখন আমাকে বললেন না কেন ?

—বললে আপনি একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন তখনই। নাগরদোলার ব্যাপার দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

—না-হয় বাধতোই কুরুক্ষেত্র। সে-দায়িত্ব তো আমার।

কী জবাব দেব ? একরোখা মানুষ গুপ্তেজী। সোজা পথে চলেন বলে লোক তাঁকে পাগল বলে। তহশীলদারের চাকরির অনেক সুবিধা, অনেক প্রলোভন সত্ত্বেও সখ করে আদিবাসীদের স্পেশ্যাল-অফিসার না ওয়েলফেয়ার অফিসার, কী-যেন হয়েছেন। শুভানুধ্যায়ীরা বারণ করেছিল— কর্ণপাত করেননি। এই একরোখা স্বভাবের জন্য অফিসার মহলে ওঁর বদনাম আছে। তাই ওঁর কোন বন্ধু নেই। বস্তুত সেই ভয়েই আমি ওঁকে নারানপুরে কিছু বলিনি। বললে, সেই মধ্যরাত্রে থানা-পুলিস হৈ-হাঙ্গামা শুরু করে দিতেন উনি। যার অনিবার্য ফল মামলা-মোকদ্দমা, কোর্ট-কাছারি। নারী-ধর্ষণের মামলায় সাক্ষী দিতে হত। আসামী পক্ষের উকিল হয়তো অপমানকর প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে বিব্রত করে তুলতো আমাকে। জঙ্গলের ভিতর নির্জনে একটি নিরাবরণ যুবতী মেয়েকে দেখতে পেয়ে আমি কী করেছি না করেছি, তার হাজারো জেরায় জেরবার করে দিত আমাকে।

কিন্তু এমন কথা সিধে-মানুষ গুপ্তেজীকে বলে লাভ নেই। তাই ঘুরিয়ে বললাম, মহাভারতের আদর্শ চরিত্র হচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম। দুর্যোধনের আশ্রয় আর অন্ন গ্রহণ করায় তিনি অন্যায়ের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল, তখন চোখ বুজে ছিলেন তিনি। আমরাও মোহনের বাড়িতে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কাঠখোঁটা মানুষটি বললেন, এইজন্যেই আপনাদের হিন্দুধর্মটা গোপনীয় যেতে বসেছে।

আমি হেসে বলি, আমাদের হিন্দুধর্ম বলছেন কেন ? আপনিও তো হিন্দু।

—নো অয়্যাম নট্। ধর্মকে ওঠেন উনি,—আর হিন্দুধর্মের যে আদর্শ শোনালেন, তারপর বলব—সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !

আমি অবাক হয়ে বলি, আপনি হিন্দু নন ? তবে আপনি কী ?

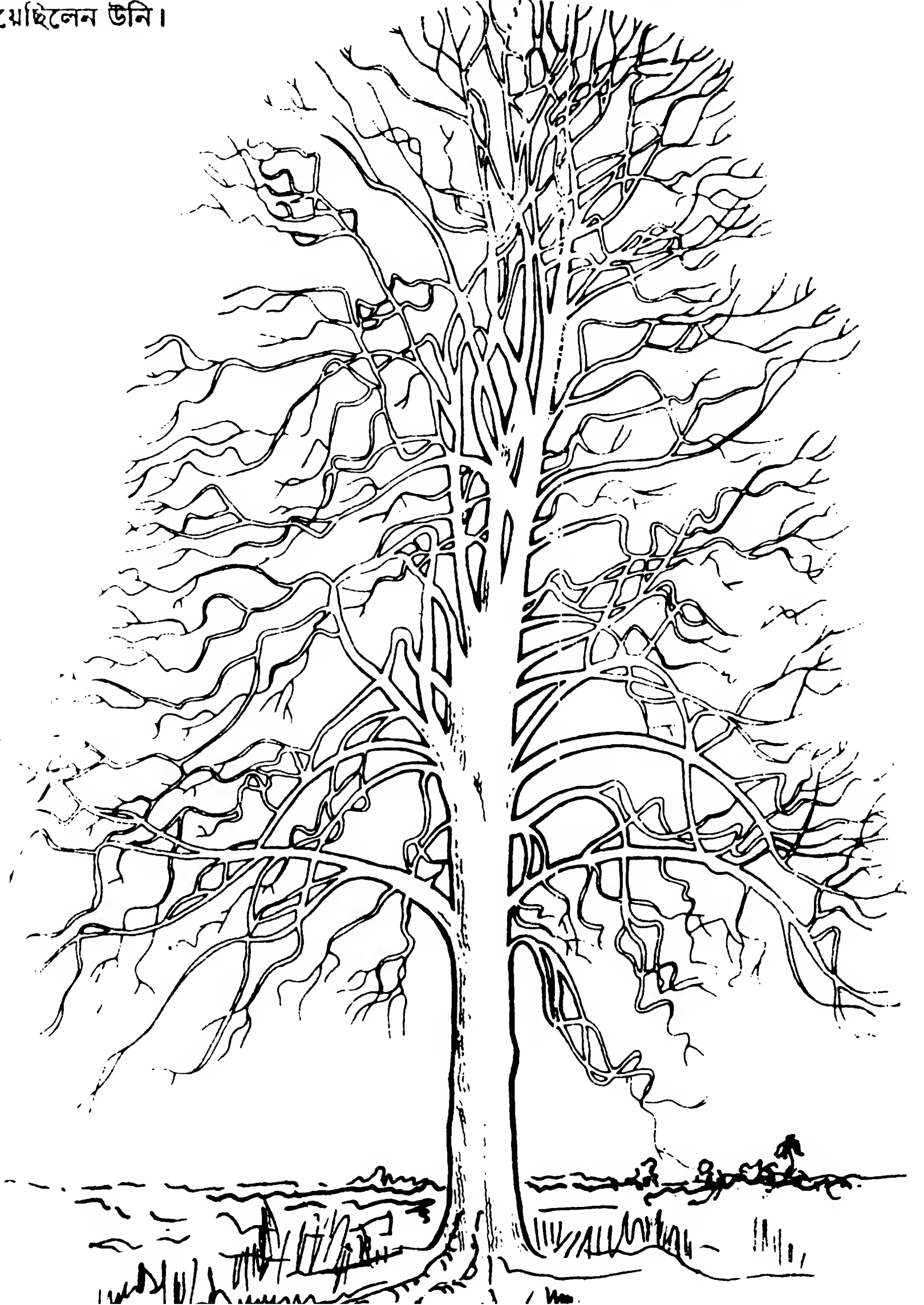
সে কথায় কর্ণপাত করলেন না গুপ্তেজী। চোখ দুটো স্থলছে তাঁর। বললেন, আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন খবরটা আমার কাছে গোপন করে।

একরোখা জেদী মানুষটা কী করে বসে ঠিক কী ? আমি শান্তিপ্ৰিয় জীব ! অভিযোগটা মেনে নিয়ে বলি—অপরাধ স্বীকার করছি। এবার শুয়ে পড়ুন। ঘুম পাচ্ছে, বাতিটা

নাগয়ে দিন।

শুপেজী হাসলেন। বিচিত্র সে হাসি। তারপর গোটানো ক্যালেন্ডারখানা খুলতে খুলতে বললেন, তা দিচ্ছি। এ ছবিখানা কেড়ে এনে আপনি ঠিকই করেছেন। মোহনের মাঝে এটা আর রাখা যায় না, কিন্তু মাপ করবেন এঞ্জিনিয়ার সাহেব—এটা কি আপনার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে? অন্যায়ের প্রতি এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ চিত্র? এটা নগ্ন এখানেই থাক?

দেওয়ালের হুকে ক্যালেন্ডারখানা টাঙিয়ে দিলেন। মমাস্তিক লজ্জায় মাথাটা আর তুলতে পারিনি। তুললেও ক্ষতি ছিল না। চাবুকটা চালানোর পরমুহূর্তেই বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছিলেন উনি।



॥ আট ॥

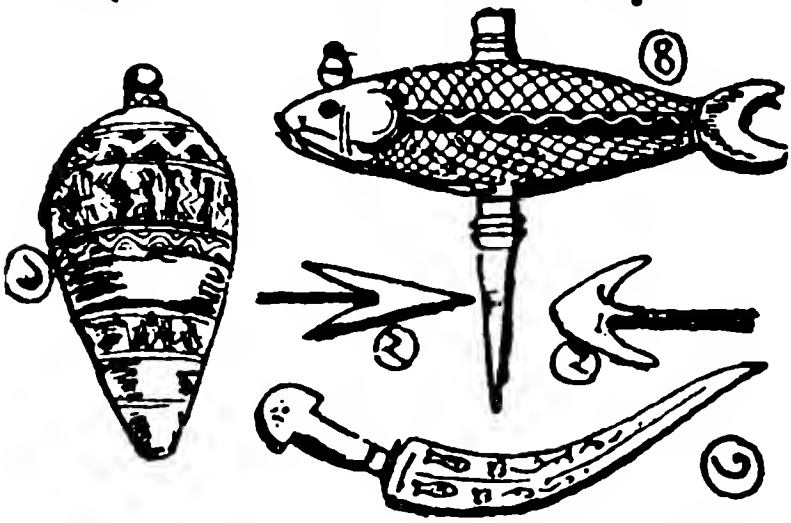
প্রায় বছরখানেক পরের কথা। ইতিমধ্যে বদলি হয়েছি মধ্যপ্রদেশ থেকে উড়িষ্যা। শৈলনগরী কোরাপুটে গিয়ে ডেরা-ডাঙা গেড়েছি। কোরাপুটও জেলা-সদর। সার্কিট হাউস আছে, ডি.এম.-এর বাংলো আছে, ট্রেজারি আছে। আছে জেলখানা, পার্ক, ক্রিকেট খেলার মাঠ। নেই কলেজ, নেই সিনেমা হাউস। পাহাড়ের উপর ছবির গ্যালারির মত থাকে থাকে সাজানো বাড়ি। টিনের, টালির, খাপরার। অনেক বাড়ির চালে আবার মাটি ছড়িয়ে ফুলের গাছ লাগানো আছে। প্রাচীন ব্যাবিলনের সঙ্গে এ সূত্রে কোরাপুটের কিছু আত্মীয়তা আছে। জয়পুর থেকে কোরাপুটের ন্যাশনাল হাইওয়ের এই চৌদ্দ মাইলের পথের দৃশ্য ভুলবার নয়। জয়পুরে ছেলেমেয়েদের কলেজ আছে, সিনেমা হাউসও আছে। জয়পুর থেকে রওনা হলেই ডানহাতি ছোট টিলার গায়ে দেখতে পাবেন সারি সারি খাটো গাছ। কৌতূহলী হয়ে আপনি গাড়ি থামিয়ে নেমে যান, ওর একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে হয়তো দেখতে চান অচেনা গাছটাকে সনাক্ত করা যায় কি না। হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসবে গ্রহরী। আপনি অবাক হয়ে যাবেন, ফল পাড়েননি, ফুল তোলেননি — তবে এমনভাবে তেড়ে আসবার মানে? মানে আছে; ঐ শুকনো ডালটাই শুঁকে দেখুন। মানেটা বুঝতে পারবেন। দণ্ডকবন মর্ত্যের নন্দন বন কি না জানি না, তবে চন্দন বন আছে এর ভিতর। শ্বেত-চন্দনের বন ওটা। অত্যন্ত দামী গাছ। ওর কোন ঝরে পড়া ডাল কুড়িয়ে নেওয়াও মানা।

চন্দন বনকে ডাইনে রেখে একটু এগিয়ে গেলেই দেখবেন পাহাড়ের গায়ে রাস্তাটা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে উপরে, যেন রাজা রামমোহনের আমলের পাগড়ি। আবার কতগুলি অচেনা গাছ নজরে পড়ল আপনার। অনেকটা ঘেঁটু ফলের মতো পাতা, ফুলগুলি কুঁড়ি অবস্থায় ধপধপে সাদা, ফুটলে খয়েরি আভা দেখা যায়, ক্রমে হয় জমাট রক্তের মতো কালচে লাল। এ গাছগুলিকে আপনি চেনেন না। যদিও আপনার বাড়ির প্রতিটি উৎসবে আপনি ওর সাহায্য নিয়েছেন। আপনার বাড়ির দৈনন্দিন সাদা-ভাতের আয়োজনকে উৎসব-রজনীতে ঐ গাছই করে তুলেছে রঙিন পোলাও। জাফরান গাছ ওগুলো।

দিনের বেলা যদি এপথে আসেন তাহলে পাকদণ্ডী ঘুরে উঠবার সময় সমতলের অপূর্ব দৃশ্যে অভিভূত হয়ে যাবেন আপনি। ছোট ছোট আদিবাসী গ্রামগুলিকে মনে হবে খেলাঘরের আয়োজন। ধানের গোলা, চাষের ক্ষেত, ক্ষুদ্রে পিপড়ের মত মানুষজন, গরু মোষ। আর যদি রাতের বেলা আসেন এ পথে চোখদুটো মেলে রাখবেন সামনের দিকে! বাঁকের মুখে হঠাৎ দেখা পেয়ে যেতে পারেন অরণ্যচারীদের। ডানদিকের পাহাড় থেকে নেমে বড় রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকের খাদে জল খেতে যায় বন্যজন্তুর দল। বার দুই বাঘ আর একবার ভালুকের দেখা পেয়েছিলাম আমি। হরিণ আর খরগোশ তো বছবার।

গাড়ির ভিতর থেকে ওঁদের দেখার মধ্যে বেশ একটা থ্রিল আছে, কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে এঁদের সঙ্গে মোলাকাত করা ভিন্ন জিনিস। কোটা-মালকানগিরি সড়কে আমার

একটি জনমজুরের অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। মাতিলিতে একটা হাসপাতাল তৈরির কাজ তদারক করতে গেছি। সন্ধ্যা হব হব। একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল সাত মাইল আগে রাস্তার ধারে একজন মজুরকে ভালুকে আক্রমণ করেছে। জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম তখনই। অদ্ভুত লোকটার ক্ষমতা। রাস্তার দিকে মুখ করে পাথর ভাঙছিল সে আপন মনে। পিছন থেকে আচমকা ভালুকে আক্রমণ করে তাকে। লোকটা আত্মরক্ষার প্রেরণায় বাঁহাতটা ঠেসে দেয় ওর মুখে। আর ডান হাতে ক্রমাগত চালিয়ে যায় হাতুড়ির বাড়ি ভালুকের মাথায়। যতই শক্ত হ'ক, গ্র্যানাইট পাথরের চেয়ে তো আর শক্ত নয় ভালুকের মাথার খুলি! শেষ পর্যন্ত ভালুকটা নেতিয়ে পড়ে। এতক্ষণে লোকটা তাকিয়ে দেখে ভালুকও ছেড়ে কথা বলেনি। আখ-চিবোনোর মতো বাঁ-হাতটাকে চিবিয়েছে এতক্ষণ চরম আক্রোশে। অদ্ভুত মনের জোর লোকটার। সে বুঝতে পেরেছিল ঐ বাঁ-হাতখানাই তাকে রেখেছে ভালুকের আলিঙ্গন থেকে নিরাপদ দূরত্বে। যন্ত্রণায় যদি সে এক লহমার জন্য হাতটা টেনে নিত অমনি ভালুকটা নাগাল পেত তার চোখ-মুখ-নাড়ি-ভুড়ির! তাই মরণান্তিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে বাঁ হাতটা টেনে নেয়নি।



- (১) 'গুতা'— কাঠের ভ্রামক কৌটা
(২) 'কারিণ'— তীরের ফলা
(৩) 'বাণ্ডাল'— সৌখিন ছোরা
(৪) 'গুডা'— সৌখিন ভ্রামক কৌটা, পাগড়িতে গুঁজে রাখা যায়।

- (৫) 'মাকসু'—টাঙির ফলা
(৬) 'আঙ্গোপেন', স্থান ভেদে 'কুরুং-ভুলা'— শালকাঠের দেবমূর্তি, গলায় পুঁথির মালা, চারকোণে ময়ূর পালকের ঝুঁটি। সাধারণত চৌদোলার মত দেবস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়। উৎসবের দিনে বাহকেরা চারজনে কাঁধে করে নিয়ে যায়।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন তার জ্ঞান নেই। শকে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কনুই থেকে বাঁ হাতখানার কয়েক টুকরা চর্বিত অংশ ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। যেন মৃত ভালুকটার কিছু টুকি!

লোকটাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। গরুড়ের উপর দেবরাজ ইন্দ্র একবার নাকি রাগ করে বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন। নারায়ণ তখন গরুড়কে বলেছিলেন বজ্রের আঘাত সহ্য করবার শক্তি তোমার আছে জানি, কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হলে দধীচির অপমান হয়! শুনে, গরুড় তাঁর একটি পালক খুলে দিয়েছিলেন — বজ্র সেই পালকটিকে দখল করে ফিরে গিয়েছিল ইন্দ্রের তুণে। দশাসই চেহারার এ মানুষটাকে দেখে মনে হল হাতুড়ি-পেটা করে ভালুককে বধ করলে পাছে অরণ্য-রাজ্যে ভালুকের অপমান হয় তাই বাঁ-হাতখানা খুলে দিয়েছিল শুধু! প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল লোকটা,

প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে, আদিবাসী বলেই।

যাক যা বলছিলাম। ছোট্ট শহর কোরাপুটে বদলি হয়ে এসেছি। কোরাপুটের একটি নাম ‘পুয়োর ম্যানস উটি’। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের যে সব মানুষের উটাকামান্ড বেড়াতে যাবার সামর্থ্য নেই তারা অবসর যাপন করতে আসে কোরাপুটে। উটি দুধ হলে কোরাপুট পিটুলি-গোলা।

হঠাৎ একটা কাজের মতো কাজ পেয়ে গেলাম একদিন। কর্তৃপক্ষ নতুন এক অঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্য জমি পাচ্ছেন প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে। তাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী আসছেন জমিটা পরখ করতে। — দেখতে, এই নতুন এলাকায় জঙ্গল সাফ করে যে জমি পাওয়া যাবে সেটা চাষের পক্ষে কতটা উপযোগী। আমার উপর আদেশ হল ভদ্রলোককে সেই জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া—তাঁর প্রয়োজনমত মজুর সরবরাহ করে মাটির স্যাম্পেল যোগাড় করা!

আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। বছর ত্রিশেক বয়স। সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারা — দিলদরাজ অটুহাস্য কথায় কথায় স্বতই উৎসারিত হয়ে আসে। বললাম, জঙ্গলে ক্যাম্প খাটিয়ে থাকা-খাওয়াদাওয়ার তো বটেই, নানানরকম অসুবিধা হবে কিন্তু আপনার — অপরাধ নেবেন না।

বললেন, সেজন্য তৈরি হয়েই এসেছি। ওতে আমি অভ্যস্ত।

শহরের দোকান থেকে কিনে নিলাম — পাউরুটি, টিনের জ্যাম, বিস্কুট, মাখন, সিগারেট টিন, দেশলাই — তিনদিনের সংসারের যা-কিছু প্রয়োজন। মালপত্র বোঝাই দিয়ে আদালি নন্দু থাপা বেরিয়ে গেল জিপে — অ্যাডভান্স পাটি। কিছু পরে আমরাও রওনা হয়ে পড়লাম স্টেশন ওয়াগনে।

এলাকাটার নাম মালকানগিরি। গিরি তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে — ধ্যানস্তিমিত নীলাভ-সবুজ পাহাড়ের সারি মাইলের পর মাইল — কিন্তু তার মালিকানা কার? সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার জরিপ হয়নি এ অঞ্চলে, মৌজা-ম্যাপ বলতে যা বুঝি তাও নেই। বিরাট অঞ্চল পড়ে আছে প্রায় অনাবিষ্কৃত। সভ্য জগতের মানুষ এ অরণ্যে, এ গিরিতে মালিকানার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়নি আজ পর্যন্ত। পাহাড়ের মাথায় আছে অসভ্য বোণোদের গ্রাম। সমতলে ওরা সচরাচর আসে না, সমতলের মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। তবু ওদের কেউ কেউ নেমে আসে পাহাড়তলির হাটে। দিয়ে যায় হাতে বোনা চটাই, হরিণের শিং, মছয়া আর নিয়ে যায় শুধু লবণ। ওরা কেরোসিন নেয় না — রাতে জ্বালায় কাঠ, দেশলাই নেয় না — চকমকি ঠোকে আজও; কলাই করা বাসন, সস্তা জামা বা অন্য কিছুই ওরা চায় না, চায় শুধু নুন। শিকারেই ওদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা — যদিও চাষবাসও করে আদিমতম পদ্ধতিতে। ধান রুইতে জানে না — ছিটিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে, মই দেয় না, নিড়ায় না, সার দেয় না জমিতে। পুরুষ-রমণীর বেশে বিশেষ ফারাক নেই — উভয়েই কপনিসার। বিশেষ বয়সের মেয়েরা তার উপর জড়িয়ে নেয় কটিদেশ থেকে জানু পর্যন্ত একটা আবরণ — গাছের পাতা, বাকল অথবা হাতে বোনা এক টুকরো নেকড়া। নারী-পুরুষ উভয়েরই মাথা কামানো। উভয়ের হাতে যা-হোক একটা

হাতিয়ার।

স্টেশন-ওয়াগান চলেছে রাঙামাটির বন্য সড়ক ধরে — শাল-মহুয়া-হরতকির যোজন-বিস্তৃত বন। অর্জুন-আমলিক-বয়ড়া, বট-অশ্বথও আছে। আর আছে কদমগাছ — বিরাটাকার। পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে রাস্তা কখনও উঠেছে উপরে — কখনও নামছে নিচে। সারা দিন গাড়ি চালালেও হয়তো বিপরীতগামী কোন গাড়ির দর্শন মেলে না। দিনে দুখানি বাস যায় এ পথে, দুখানি আসে। তাও প্রথম পঞ্চাশ মাইল — তারপর বোধ করি 'নো ম্যান্স ল্যান্ড'! পথে খরশ্রোতা উপল-বন্ধুর নদীর উপর একটি ব্রিজ পেলাম। 'থ্রি-স্প্যান ল্যাটিস গার্ডার ব্রিজ' — অর্থাৎ বাংলা পরিভাষায় যাকে বলা যায় 'ঝকঝকে সুন্দর সাঁকো'!

মিত্রমশাই গাড়িটি দাঁড় করালেন। ম্যাপ খোলা হল। নদীটিকে সনাক্ত করা দরকার। কোলাব। ঐক্যবৈক্য শেষ পর্যন্ত গোদাবরীতে গিয়ে মিশেছে। কোলাবের একটি শাখানদী 'সপ্তধারা' আমাদের সমান্তরালে চলল অনেকটা পথ। 'ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াই' বইটির শ্রুটিং এখানে অনায়াসে করা চলত। সৌন্দর্যে রিভার কোয়াইও সপ্তধারাকে হারাতে পারবে না।

মিত্রমশাই বললেন, এ জঙ্গলে বন্য জন্তু দেখেছেন?

বললাম, বহুবার। হরিণ আর খরগোশই বেশি দেখেছি। ভালুক দুবার আর বাঘ মাত্র একবার।

তারপর বাঘের গল্পই চলল অনেকটা রাস্তা। বাঘের গল্প ওঠায় স্টেশন ওয়াগানের ড্রাইভার পাঁড়েজি দেখলাম উশ্খুশ করছে। দেব-দ্বিজে বড় ভক্তি পাঁড়েজির, এখনই হয়তো দক্ষিণরায়ের গল্প ফেঁদে বসবে — কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত পাঁড়েজি মুখ খুলল না আর।

সন্ধ্যাবেলায় এসে পৌঁছালাম একটি গণ্ডগ্রামে। নন্দুরা আগেই এসে টেন্ট খাটিয়ে ফেলেছে। তাঁবুর ভিতরে পেট্রোম্যাক্স-বাতি জ্বলছে — আলোর ছোপ পড়েছে জঙ্গলের গায়ে। গাছপালার মাঝখানে বেশ ফাঁকা জায়গাটা। মহুয়া গাছতলায় পোর্টেবল চেয়ার-টেবিল পাতা। গাড়ির আওয়াজ হতেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল নন্দু থাপা — গরম পানি তৈয়ার।

মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে বসতেই এসে গেল দু পেয়ালা গরম চা আর খাবার। মিত্রমশাই বললেন, তবে যে বললেন, জঙ্গল জায়গায় কিছু পাওয়া যাবে না?

টেবিলের উপর ম্যাপটা পাতা গেল। যে জমিটা প্রাদেশিক সরকার আমাদের দিতে চাইছেন — তার আনুমানিক নকশা, প্ল্যান নয় কিন্তু। যাকে বলে, রাফ-ইন্ডেক্স ম্যাপ। জরিপই হয়নি এখনও। একটু পরেই এসে গেলেন মিস্টার কাণ্ডারি আর মুখার্জি-সাহেব। পরিকল্পনার নিজস্ব মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী। শুরু হয়ে গেল মৃত্তিকা-রসায়নের আলোচনা। অশ্রাব্য! উঠে এলাম সেখান থেকে।

বাইরে এক-আকাশ তারা। সূর্য এখন কন্যা রাশিতে। দক্ষিণায়নের পথে সবে যাত্রা শুরু করেছেন। সূর্যাস্তের পর এক প্রহরও হয়নি। পশ্চিম দিগ্বলয়ে — ঐ নাম-না-হওয়া পাহাড়ের মাথায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বৃশ্চিক রাশির চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

পিতৃপক্ষ চলছে — সন্ধ্যা আকাশে চাঁদ নেই।

আকাশ আর অরণ্য আলিঙ্গন করেছে পরস্পরকে — কোনটা জোনাকি আর কোনটা তারা তা চিনবার উপায় নেই। গাছতলায় তিন-পাথরের কাঠের উনানে রান্না চাপিয়েছে নন্দু। এ পাশের ছোলদারী তাঁবুটায় পাঁড়েজি সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে: গাছপালা পশুপক্ষী কাঁদছে, অযোধ্যার নরনারী চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে—আজ নবদুর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র ভাইয়ের হাত ধরে পতিব্রতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলেছেন!

মনে পড়ল: সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে!

চুপচাপ বসে পড়লাম একটা বড় পাথরের উপর। অযোধ্যা থেকে শ্রীরামচন্দ্র নাকি এই অরণ্যের দিকেই এসেছিলেন। চিত্রকূট পর্বতে ভরত-মিলনের পরে তিনি দক্ষিণাভিমুখে আসেন। গোদাবরী নদীর তীরে কুটির বেঁধে বাস করেন। এখান থেকে গোদাবরী বেশি দূর নয়। কে জানে যে পাথরটার উপর বিংশ শতাব্দীতে আমি এসে বসেছি আজ, এই বৃহদায়তন পাথরটার উপরেই একদিন পথশ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র এসে বসেছিলেন কি না!

এই অনাবিকৃত দেশের কোন সন্ধানই আমরা রাখি না। এখানে মাটির নিচে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কে বলতে পারে খুঁড়তে খুঁড়তে হয়তো একদিন মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসবে জটায়ু রাজার প্রাসাদ!

পরদিন জিপে যেতে কথাটা বলেছিলাম মিত্রমশাইকে, সয়েলস্যাম্পল নিতে গিয়ে ধরুন যদি কোদালের মুখে উঠে আসে একটা তাম্রশাসন — যাতে লেখা আছে সীতাদেবীর সংবাদ দেওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে রাজা জটায়ুর বংশধরকে একটা সনদ দিচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র?

মিত্রমশাই হেসে বলেন, অতটা আশা করি না। এতটা পথ এলাম একটা রামগড়, লক্ষ্মণপুর অথবা সীতাগাঁও দেখলাম না — তার তাম্রশাসন! রামসীতা যে এ পাড়া কখনও মাড়িয়েছিলেন তার কোন সুদূর-প্রসারী কল্পনা করবারও সুযোগ পাচ্ছি না।

পাঁড়েজি কী কথা বলতে যাচ্ছিল: কিন্তু তার আগেই মিত্রমশায় বললেন, রোখকে।

বনপথ দু-দিকে ভাগ হয়ে গেছে। নামলাম জিপ থেকে। ফ্লাস্ক থেকে একটু চা পান করা গেল। ম্যাপটা খুলে পাতলাম জিপের বনেটের উপর। কম্পাস বের করে ওরিয়েন্ট করা গেল ম্যাপখানা। বৃথাই। এ দুটি বনপথের কোন অস্তিত্বই নেই ম্যাপে। যে গ্রামে কাল রাত্রিবাস করেছি সেটা অবশ্য ম্যাপে সনাক্ত করা যায়। তারপর আমরা বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এসেছি। জিপের মাইলো-মিটার বলছে আট-মাইল। স্কেল দিয়ে নকশায় চিহ্নিত করলাম জায়গাটা। বললাম ডান দিকের জংলা-পথ ধরে মাইলতিনেক গেলেই আশা করছি একটা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছাব।

—কী নদী?

ম্যাপ পড়ে বললাম, তামাশা!

হো হো করে হেসে উঠলেন মিত্রমশাই, তামাশা করছেন না তো মশাই?

বললাম, বিশ্বাস না হয় নিজে দেখুন...TAMASA — তামাশা।

পাঁড়েজি লম্বা সেলাম করে বললে, লেকিন সাব্ —

—কী হল ? পেট্রল ফুরিয়েছে ?

—নেহি সাব — পেট্রল তো কাফি হয়, পুরা টাঙ্কি।

—তবে আর ফালতু বাত নয়... এই ডান দিকের পথটা ধরেই ছোটোও তোমার পুষ্পকরথ — দেখি তামাশা কত দূর গড়ায়।

পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলল জিপ। দু-পাশে বন আর বন—একটি মানুষের সন্ধান পেলাম না পথে! মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল সারসের মতো দেখতে অদ্ভুতদর্শন একটা পাখি—বিচিত্র কাঁ কাঁ কাঁ ডাক দিয়ে। বিকটাকার এই জিপ-জন্তটাকে দেখে ভয় পেয়েছে আর কি। ঘড়িতে দেখলাম পনের মিনিট চলেছি আমরা। যে গতিতে চলেছি তাতে মাইল পাঁচেক এসেছি নিশ্চয়—কিন্তু কোথায় নদী ?

মিত্রমশাই ঠাটা করে বললেন, নদী আমাদের সঙ্গে সাত-সকালে একি লুকোচুরির তামাশা শুরু করল বলুন তো ?

আমি কোন জবাব দিলাম না। গণ্ডুষ করে ভাতে হাত দিয়েই শুধু নয়, স্টিয়ারিঙে হাত দিলেও পাঁড়েজি বাক-সংযম করে থাকে। কোন কথা নেই তার মুখে। অবশেষে এসে পৌঁছলাম নদীর কিনারে। ছোট খরশ্রোতা পাহাড়ে নদী। ঝরনাই বলা চলে। ভারি মনোরম পরিবেশ। অসংখ্য ছোট বড় পাথরে নদীর ঘাট যেন বাঁধানো। নদীতে নগ্ন-স্নান করছিল দুটি আদিবাসী মেয়ে। উর্ধ্বাঙ্গে শুধু কড়ির মালা ঝুলছে গলা থেকে। মাটি, মার্বেল বা ক্যানভাস নয়...কেমন যেন বিস্ত্রী লাগলো, সরে এলাম জিপের আড়ালে। আশ্চর্য, স্নানরতা মেয়ে দুটির কোন চাঞ্চল্য নেই — কৌতূহল আছে কিন্তু সঙ্কোচ লজ্জার কোন আভাস ফুটে উঠল না তাদের সে বন্য দৃষ্টিতে।

মিত্রমশাই বললেন, সরকার থেকে এদের মধ্যে বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরণ করা উচিত। বিদেশীরা এ দৃশ্য দেখলে কী বলবে ?

বিদেশীরা কী বলবে তা জানি। মিস্ মেয়ো, বিভাল্‌রি নিকল্‌স-এর বই-ও যে না পড়েছি তা নয়। কিন্তু সে কথা নয়, আমি ভাবছিলাম সত্যিই কি বস্ত্র বিতরণ করা মঙ্গলজনক হবে? খাদ্য-জল-বাতাস প্রাণধারণের আবশ্যিক প্রয়োজনীয় উপকরণ। বস্ত্র তো তা নয়। বস্ত্রসমস্যাও আজকের দুনিয়ায় বিরাট এবং ব্যাপক — কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা জান্তব নয়, সামাজিক। সামাজিক মানুষের এ স্বখাত-সলিল। এ সত্য অনুধাবন করেই আজ পশ্চিম ন্যুডিস্ট কলোনি গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। এই আদিবাসী মেয়েরা উর্ধ্বাঙ্গ গোপন করার প্রয়োজন অনুভব করে না — সেটা আমাদের চোখে বিসদৃশ লাগে — কিন্তু ওদের তো কোন বিকার নেই। অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা আজ খাটো চোলি পরে যে বেশে ট্রামে-বাসে অফিসে-আদালতে আমাদের সাথে সমানতালে পা ফেলে চলেছেন তা পঞ্চাশ বছর আগে ছিল অচিন্ত্যনীয়। আজ স্বর্গ থেকে আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ যদি নেমে আসেন তা হলে ডিপ-কাট খাটো চোলি পরা নাইলন-ভূষিতা মিসেস মেহরাকে দেখলে লজ্জায় মুখ লুকাবেন — ঠিক যেমন করে আমি সরে এলাম। উড়ুনি সর্বস্ব খড়মপেয়ে শিখা-ধারী

আমার বুড়ো-ঠাকুরদার বাবাকে দেখে মিসেস্ মেহেরাও নিশ্চয় কৌতূহলী হবেন, লজ্জা পাবেন না! কোন যুগেই কোন সমাজেই নিরাবরণ দেহ বস্তুটা অশ্লীল নয়; — প্রদর্শনবাদী আর দর্শনবাতিকের সচেতনতাই অশ্লীল! চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল পাঁড়েজির কণ্ঠস্বরে: উ নেই চলগা সাব, কাপড়া প্হুন্নেসে ই লোগ সব বিলকুল মর যায়েগা।

আমরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম। মেয়ে দুটি কী বুঝল তা ওরাই জানে। তাড়াতাড়ি উঠে গেল জঙ্গলের পথে। যাবার সময় কঠিন ভ্রুকুটি দেখলাম ওদের চোখে। বোধ করি ওদের অবগাহন-স্নানের মাঝখানে আমরা আসায় বিরক্ত হয়েছে ওরা।

বিনয় প্রকাশ করে পাঁড়েজি এরপর বললে — আমরা যেন তার গোস্তাকি মাফ করি, সে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ, লিখাপড়ি জানে না, থোড়াকুছ তুলসীদাসজীর কিতাব পড়ে, কিন্তু আংরেজি জানে না। তবু গাড়িতে আমরা যেসব কথাবার্তা বলেছি তা থোড়াবহুত ও বুঝতে পেরেছে। তাই এ প্রসঙ্গে ও দু একটি কথা নিবেদন করতে চায়। আমরা যদি অনুমতি দিই। দিলাম।

পাঁড়েজি দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় ডেপুটেশনে এসেছে উড়িষ্যা সরকারের তরফ থেকে। পরিকল্পনা এ অঞ্চলে কাজ করতে এসেছেন আজ মাত্র তিন বছর — পাঁড়েজি এ অঞ্চলে চাকরি করছে গত পয়ত্রিশ বছর। আদিবাসীদের ভাষাও কিছুটা জানে। চাকরির প্রথম যুগে ও ছিল এখানকার একজন ইংরাজ জেলাশাসকের ড্রাইভার। অত্যন্ত সন্ত্রমের সঙ্গে উল্লেখ করলে সেই ইংরাজ আই-সি-এস অফিসারটির নাম। নামটা জানা — আদিবাসীদের মধ্যে অনেক কাজ করেছেন তিনি। সম্ভবত ভদ্রলোক অ্যানথ্রপলজির ছাত্র ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন এদের সভ্য করে তুলতে। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, এদের গান শুনতেন, লিখে নিতেন, নাচ দেখতেন, ফটো নিতেন। অসভ্য সরল মানুষগুলো তাঁকে ভালোবাসতে শিখল। শেষে তিনি আন্দোলন করলেন ওদের কাপড় পরাতে হবে। ছেলেরা না হলেও মেয়েরা, ওদের নিজস্ব গ্রামে না হলেও অন্তত সমতলের হাটে আসার সময়। ওদের গাঁও-বুড়ো বা প্যাটেল বললে: তা হয় না। তোমার ঐ জিনিস গায়ে জড়ালেই গায়ে আমাদের ফোঙ্কা পড়বে — গায়ে জ্বালা ধরবে — চামড়া ফেটে যাবে। অপদেবতা ভর করবে সে দেহে — আমরা মরে যাব!

জেলা শাসনকর্তা ও কুসংস্কারকে আমল দেননি। ওদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আমদানি করলেন পাঁচ-হাতি খাটো শাড়ি, জামা, ইজের। বিতরণ করলেন বিনামূল্যে। বুড়ো সদার যাই বলুক তরুণ-তরুণীর দল খুশী হল কিন্তু। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ব্লাউজ, লালপাড় শাড়ি। পাঁড়েজি বলেনি, আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম পীন-পয়োধরা একটি নারীর মুখে ফুটে উঠেছে সেই রহস্যরেখা — যা একদিন ফুটে উঠেছিল জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের পর আদিমতমা নারী ঈভের ওষ্ঠাধরে। শুধু ওদের গাঁওবুড়ো কেশহীন মুণ্ড নেড়ে বলেছিল: এ তুই ভাল করলি না রে সাহেব, এ তুই ভাল করলি না।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রপলজির ছাত্রটি হেসেছিলেন সে কথায়। কিন্তু সে হাসি স্থায়ী হয়নি। মাস দুয়েকের মধ্যেই খবর এল — অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে

গাঁয়ে। ওদের গায়ে কেমনজানি সব ফোন্স্কা পড়েছে, গায়ে ছালা ধরছে, চামড়া ফেটে যাচ্ছে! দলে দলে মরে যাচ্ছে ওরা! মহামারীরূপে এসেছে বসন্তরোগ। হেলথ ইন্সপেক্টরদের একটি ইউনিট নিয়ে সাহেব স্বয়ং এলেন তদন্তে। আশ্চর্য! গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পাতায় ছাওয়া কুটির জনমানব নেই। ইতস্তত ছড়ানো মাটির হাঁড়ি, কাঠের হাতা, হাতে-বোনা চাটাই—কিন্তু মানুষ নেই। মৃতদেহ আছে, অর্ধভুক্ত বীভৎস দেহ! পাঁড়েজিও ছিল সাহেবের সঙ্গে। লক্ষ্য করেছিল, সাহেব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। একের পর এক শূন্য কুটির পরিদর্শন করে চলেছেন।

অবশেষে মানুষের দেখা মিলল একটা কুটিরে। তখনও জ্ঞান ছিল মানুষটার। গাঁয়ের সেই বৃদ্ধ প্যাটেল। পড়ে আছে একা — ‘বিষাক্ত তার সঙ্গ।’ সাহেব ওয়াটার-বটল খুলে জল দিলেন তার মুখে। হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠল লোকটা। সাহেব স্টেচারে করে নামিয়ে এনেছিলেন পাহাড় থেকে। হাসপাতালে গিয়েও বাঁচেনি সে। তবে একটু সুস্থ হয়ে সাহেবকে শুনিয়েছিল একটি উপাখ্যান। গল্প নয়, উপকথা। বোণ্ডোদেরও কথিত ভাষা আছে, লিখিত বর্ণমালা নেই। ওরা বাপ-পিতামহের কাছ থেকে বংশপরম্পরায় যে কাহিনী শুনে এসেছে সেটাকে ওরা উপকথাও মনে করে না — সেটা ওদের কাছে সত্য ঘটনা।

বহু বহু যুগ আগে — সে কত আগে তা বলতে পারব না — সেই যখন গাছপালা, পশু-পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলতো—তখন এই অরণ্যে একজন মস্ত বড় রাজা ছিলেন। বোণ্ডোদের রাজা। মস্ত বড় রাজার বাড়ি, হাতি-ঘোড়া, লোক-লস্কর—কিছুরই অভাব ছিল না। তুই যেমন রঙিন জামা এনেছিলি আমাদের গাঁয়ের মেয়ে-মরদের জন্য, তার চেয়েও ভাল ভাল জামা কাপড় পরত সেই রাজ্যের মানুষ—না, না, বোণ্ডোরা তখন ন্যাংটো হয়ে থাকত না। একদিন রাজামশাই লোকজন নিয়ে শিকারে বের হলেন। সাত আকাশ পেরিয়ে, সাত পাহাড় ডিঙিয়ে রাজা অবশেষে একদিন সসৈন্য এসে পৌঁছিলেন এই বিজন বনে। পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। একফোঁটা জল নেই কোথাও। হঠাৎ রাজা দেখলেন একটা মহুয়া গাছের ডালে বসে আছে একটা ঝুঁটিওলা বনমোরগ। রাজা বললেন: বনমোরগ, বনমোরগ, এ বনে জল কোথাও আছে?

বনমোরগ গলা ফুলিয়ে বললে: এই ডানহাতি পথ ধরে গেলেই নদী দেখতে পাবে। জল খেয়ো, কিন্তু খবরদার চোখ খুলো না।

ডানহাতি পথে কিছুদূর গিয়েই রাজা একটা জলের আওয়াজ শুনলেন। মোরগের কথামতো চোখ বুজে এগিয়ে চললেন তিনি। কিন্তু জলে ও কিসের আওয়াজ? যেন কোন বন্যজন্তু জল খাচ্ছে! নিশ্চয়ই সুন্দর হরিণ। শিকারি রাজার লোভ হল। চোখ খুলে চাইলেন। দেখলেন, পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে সেই নদীতে অবগাহন-স্নান করছে। তার অঙ্গাবরণ একমাত্র বাকলটি পড়ে আছে নদীর কিনারে। ভোরবেলাকার সূর্যের সিঁদুরে-সোনার মত মেয়েটির গায়ের রঙ! রাজা লজ্জা পেলেন, নিজের উপস্থিতি জানাবার জন্য গাছের আড়ালে গিয়ে কাশলেন। তবু মেয়েটি বিচলিত হল না। বিরক্ত হয়ে রাজা বেরিয়ে এলেন গাছের আড়াল থেকে। মেয়েটি চোখ

তুলে এবার তাকালো তাঁর দিকে—কিন্তু লজ্জা পেল না।

রাজা এবার রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলেন — মেয়েটি যেন তাঁকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করছে না। বললেন : তুমি কী রকম মেয়ে ? এভাবে নির্লজ্জের মতো স্নান করছ আমাদের সামনে ?

মেয়েটি বললে : বনমোরগ তোমাদের বারণ করেনি চোখ খুলতে ?

রাজা সে কথায় কণপাত না করে বললেন : তুমি এত নির্লজ্জ কেন ?

মেয়েটি বললে : আমার লজ্জা পাওয়ার কী আছে ? আমি তোমাদের মায়ের মতো। তোমাদের উচিত মোরগের কথামতো চোখ বুজে জলপান করে চলে যাওয়া।

রাজা হেসে বললেন : মায়ের মতো ? তুমি বয়সে আমার রানীর চেয়ে বড় হবে না — তুমি আমার মায়ের মতো হলে কোন্ হিসাবে ?

মেয়েটি বললে : আমার স্বামী পৃথিবীর পিতা। তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়ে আমি জগজ্জননী হয়েছি — তোমরা সকলেই আমার সন্তান।

শুনে রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন। রাজবয়স্য এই মওকায় একটা আদিরসাত্মক রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলে না। শুনে সকলেই দ্বিগুণ জোরে হেসে ওঠে।

জ্বলে উঠল মেয়েটির দু চোখ। বললে : আমি রাজার কন্যা, রাজার ঘরনী, — ভাগ্যদোষে আজ আমি বঙ্কলধারিণী। আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই — তাই মোরগকে পাহারায় রেখে আমি স্নান করছিলাম। তোমরা সতীনারীর অপমান করেছ, তাই তোমাদের অভিশাপ দিলাম — আমাকে যে অবস্থায় দেখে তোমরা রসিকতা করলে বংশ-পরম্পরায় তোমাদের সেই অবস্থায় থাকতে হবে !

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজা দেখলেন তিনি সসৈন্য বস্ত্রহীন হয়ে পড়েছেন ! পরিধেয় বস্ত্রগুলি উধাও হয়ে গেছে ! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজা। বুঝলেন ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাঁরা সকলে মিলে মেয়েটির স্তবস্ততি শুরু করলেন।

শেষ পর্যন্ত মেয়েটি সন্তুষ্ট হয়ে বললে : তোমাদের অনুশোচনা দেখে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু অভিশাপ খণ্ডাবার উপায় আমার জানা নেই। তবু তোমাদের শুধু নিম্নাঙ্গ আবরিত করবার অনুমতি দিয়ে গেলাম। উর্ধ্বাঙ্গ আবরিত করলে তোমাদের গায়ে ফোঁস্কা পড়বে, চামড়া ফেটে যাবে — তোমরা সবংশে মরে যাবে।

বুড়ো সদার সাহেবকে বলে : তাই তোকে বলেছিলাম সাহেব, আমাদের জামা দিস্ না, কাপড় দিস্ না ! তুই শুনলি না সে কথা। তাই আমাদের গায়ে ফোঁস্কা পড়ল, চামড়া ফেটে ফেটে গেল — আমাদের গাঁও উজাড় হয়ে গেল।

পাঁড়েজির গল্প শুনে বললাম : ভারি মজার গল্প তো ! কে জানে হয়তো এই তামাশা নদীতেই স্নান করছিল সেই মেয়েটি !

মিত্রমশাই বললেন : হিস্টি রিপোর্টস্ ইন্সেলফ্। আমরাও প্রায় মালকানগিরির রাজার মতো আজ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি এই তামাশা নদীর তীরে। আর কী আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন, আমরাও আজ সাক্ষাৎ পেয়েছি স্নানরতা বিবসনার ! তাতে আমরাই লজ্জা পেয়েছি — ওরা পায়নি।

পাঁড়েজি হাত দুটি কচলে বললে : এ রাজ্যের নাম মালকানগিরি নয় সাহেব, মল্লিকামর্দনগিরি, আর নদীর নামও তামাশা নয় — তমসা ! অধীনের গোস্তাকি মাফ করবেন গরিবপরবর — যে মেয়েটি এদের অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং গীতামাঙ্গি !

TAMASA-তামাশা-তমসা ! সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল আমার। কল্কল করে বয়ে চলেছে সম্মুখে খরশোতা বন্য-শ্রোতস্বনী। মাথার উপরে চেয়ে দেখলাম — না, সেই কাঁ-কাঁ-করা ক্রৌঞ্চবকটি মিলিয়ে গেছে দূর নীলাকাশের নিঃসীমায়। আচমকা একটা হাওয়া উঠেছে শালমছয়ার বনে। শিরশির করে কী যেন কানাকানি হচ্ছে, স্পষ্ট বোঝা যায় না। কী জানি, যদি পাঁড়েজির মতো বিশ্বাসের জোর থাকতো তা হলে হয়তো সেই বনমর্মরে কান পেতে শুনতে পেতাম কয়েক সহস্রাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসা আদিমতম শ্লোকের প্রতিধ্বনি :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাস্বতী সমাঃ।



॥ নয় ॥

মৌলানাসাহেব এসেছিলেন কোরাপুটে। অর্থ উপদেষ্টা। কিন্তু সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। সুলেখক আর সুরসিকই শুধু নয়, সজ্জন। বললেন : ও পাড়ায় যাবেন নাকি ? পারলকোট যাচ্ছি দিন তিনেকের জন্য।

বললুম : আলবৎ যাব। পিল্লাইসাহেবের নিমন্ত্রণ তামাদি হয়ে যাবার উপক্রম করছে। গত একবৎসর ধরে তালই ঠুকছি শুধু।

: পিল্লাই? ডাক্তার আর পিল্লাই? সে তো এখন আর পারলকোটে থাকে না। নারানপুরের মোবাইল ইউনিটে বদলি হয়ে এসেছে।

বলি : যাই হোক। নারানপুর তো পারলকোটের পথেই পড়বে। দেখা করে যাব।

: দেখা করে শুধু নয়, রাত্রিবাস করে। একদিনে তো আর অতটা পথ যাওয়া যাবে না। একরাত কোথাও হন্ট করতে হবেই।

: সে তো আরও ভাল।

যে কথা সেই কাজ। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় মৌলানাসাহেবের গাড়িতে হাজির হলাম নারানপুরে। ডাক্তার পিল্লাই তো আমাদের পেয়ে খুব খুশী। নারানপুর শহরের একান্তে তাঁরু খাটিয়েছেন। তাঁবুর সামনে একটা বেতের আরাম-কেদারায় বসে তিনদিনের বাসি খবরের কাগজের টাটকা খবর পড়ছিলেন। কলকাতার কাগজ নারানপুরে পৌঁছাতে দিনতিনেক লাগে। পায়ে চপ্পল, খালি গা, পরিধানে লুঙ্গির মতো করে পরা পাট-ভাঙা ধুতি। আমাদের দেখে উঠে এলেন অভ্যর্থনা করতে। চাকরজাতীয় একজন লোক খানকয় ক্যাম্পচেয়ার এনে পেতে দিল, ক্যাম্প টেবিলও। যাঁরা ক্যাম্প থাকেন, সরকার থেকে তাঁদের ফার্নিচার দেওয়া হয়। পিল্লাই-সাহেব তাঁবুর প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অন্তরমুখী হয়ে হাঁক পাড়েন : কই গো, তোমার দ্যাশের লোকেরা সব এসেছেন যে!

সেই 'কই গো' ডাক আর 'দ্যাশের লোকে'র টান শুনে বুঝলাম ডাক্তার পিল্লাই শুধু বাঙলা ভাষাটাকেই শেখেননি, উনি একেবারেই বাঙালি হয়ে গেছেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন মিসেস পিল্লাই। সাদা খোল লালপাড় একখানা শাড়ি ড্রেস করে পরা। মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা—শুধু কানে যে জড়োয়া দুলটা পরেছেন ওটা বোধকরি স্বশ্রুতবাড়ি থেকে পাওয়া। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। সুন্দরীই বলা চলে। আঁচল ধরে পিছু পিছু এল ফুটফুটে মেয়ে—বছর চারেক বয়স।

বললাম : আরে আরে। এর কথা তো জানি না।

কোলে তুলে নিলাম বাচ্চাটাকে : কী নাম তোমার ?

: খুকু।

মা বললেন : ছি, ভাল নাম বলতে হয়, বল....

মেয়েটি মুখ নিচু করে বললে : শরবরী পিল্লাই।

বললাম : এটা অন্যায় করছেন ডাক্তার সাহেব। মেয়ে আপনার রঙ পায়নি, পেয়েছে মায়ের রঙ! বিয়ের বাজারে পাত্রপক্ষকে মিথ্যা আশঙ্কায় ভোগাবেন অহেতুক। শরবরী ও নয়।

মৌলানা বলেন : ওদের যুগে বাপ-মায়ে বিয়ের ব্যবস্থা করবে না। আগে পরিচয়, তারপর প্রণয় এবং পরিশেষে পরিণয় !

মিসেস পিল্লাই বলেন : শবরী মানেই অমাবস্যা রাত্রি ধরে নিচ্ছেন কেন আপনি ? জ্যোৎস্নামুখরিত রাত্রিকেও তো শবরীই বলব।

আমি বললুম : তা হতে পারে। কিন্তু গোলাপ বললে যেমন ব্ল্যাকপ্রিন্স ব্যতিক্রমের কথা মনে পড়ে না, শবরী বললেও তেমনি মনে পড়ে না জ্যোৎস্নার কথা। না কি বলেন মৌলাসাহেব ?

মৌলানা বলেন : হতে পারে। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কী ? পাত্রপক্ষের কাছে সেটা হবে কনজিউমার্স সারপ্লাস !

আমি আর রমানাথন এক সঙ্গে বলে উঠি : তার মানে ?

: তার মানে বোঝাতে গেলে আপনাদের ইকনমিক্স শেখাতে হয়। একজন এঞ্জিনিয়ার একজন ডাক্তার—অর্থশাস্ত্রের এ গুড় সূত্র বোঝাই কাকে ?

রমানাথন বলেন : শর্মিলাকে বোঝাতে পারেন—বি.এ.'তে ইকনমিক্স ছিল ওর।

মৌলানা ব্যাখ্যা করেন : একটা বিজনেস্ ডিলে যখন কোন ক্রেতা কোন একটা কিছু পূর্বস্বীকৃত মূল্যে কিনতে রাজি হয়, এবং ট্রানজাক্শান শেষ হলে যদি সে দেখে যে সে হিসাবের বাইরে বেশি কিছু পেয়েছে তখন সেই অপ্রত্যাশিত মুনাফাটিকে বলে 'কনজিউমার্স সারপ্লাস'। যে ছেলেটির বাবা শবরীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করবে সে ছাঁদনাতলায় এসে দাঁড়াবে একটি কালো কনের প্রত্যাশায়। শুভদৃষ্টির সময়ে সে চমকে উঠবে। ঐ চমকটুকু হবে খুকুর বরের পক্ষে কনজিউমার্স সারপ্লাস !

সবাই হেসে ওঠে। মায় খুকুও !

আমি বললুম : তা যেন হল, কিন্তু নামটা দিয়েছে কে ? মেয়ের বাবা না মা ?

ডাক্তার পিল্লাই বলেন : দুজনেই।

: সে আবার কী !

: নয় কেন ? একটা মানুষকে সৃষ্টি করতে যদি দুটি ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজন হয় তখন একটা নামকে দুজনে মিলে সৃষ্টি করবে এতে আবার অবাক হবার কী আছে ?

বললুম : ওয়ার্ড-মেকিং খেলার মতো ?

বললেন : প্রায় তাই। নামের কাঠামোটা আমিই তৈরি করেছি। শর্মিলা নিজের মাথার রেফের মুকুটটা খুলে পরিয়েছে মেয়ের মাথায়।

শর্মিলা দেবী বলেন : উনি মেয়ের নাম রেখেছিলেন শবরী। ওঁর দণ্ডকারণ্যে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার যেদিন এল তার ক'দিন পরেই হল খুকুর অন্তপ্রাশন। দণ্ডকবনের এই নামটি পছন্দ করলেন উনি। আমার কিন্তু সে নাম পছন্দ হয়নি। আমি সেটাকে ক'রেছি শবরী। ভাল করিনি ?

ডাক্তার পিল্লাই বলেন : বেশ আপনিই বলুন। একটা দীর্ঘদিনের তর্কের মীমাংসা হোক। আপনাকেই সালিশ মানছি। বলুন রেফ দেওয়াতে কি ভাল হয়েছে ?

বিরত বোধ করি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রায় শুনতে উন্মুখ।

বাঁচিয়ে দিলেন মৌলাসাহেব : পয়েন্ট অফ রেফারেন্স ইজ্ নট সাবজেক্ট

আবিষ্কোশান !

: তার মানে ?

: আহ্। একজন ডাক্তার একজন এঞ্জিনিয়ার। আইনের ধারা বোঝাই কাকে ? ইন্ডিয়ান আবিষ্কোশান অ্যাক্ট অফ নাইটিং ফর্টি খুলে দেখবেন আবিষ্কোটারকে কোন স্কোপ দেওয়া হয়নি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, — দাম্পত্য মতান্তরের ক্ষেত্রে। ল অফ কন্ট্রাক্টের পথ ক্ষুরস্য ধারা — একচুল এদিকে-ওদিক হবার যো নেই !

: তাহলে আমাদের তর্কের মীমাংসা ?

: সেটা এ কোর্টের এঞ্জিনিয়ারের বাইরে ! ও তর্কের মীমাংসা কোর্টের কাঠগড়ায় হয় না—ওর মিটমাট সম্ভব মশারি-ফেলা জনান্তিকে !

ঘাম দিয়ে স্বর ছাড়লো আমার।

খাওয়া-দাওয়া মিটতে বেশ রাত হয়ে গেল। তারপর যে-যার তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ডাকবাংলোতে একটি মাত্র সিট পাওয়া গেছে। মৌলানা সাহেবকে সেখানে চালান করা হল, যদিও পাকাবাড়ির চেয়ে তাঁবুই তাঁর বেশি পছন্দ। সেই ভাল। মৌলানা সাহেবের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হল না এটাই নগদ লাভ। মৌলানা খাফী খান সংযত-জিহ্বা ব্যক্তি। সকাল দশটা থেকে লাঞ্চ ইস্তক আবার দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তাঁকে একনাগাড় মিটিং অ্যাটেন্ড করতে দেখেছি, নির্বাক, নিশ্চুপ। কেউ যদি মিটিং শেষে প্রশ্ন করে : কই স্যার, আপনি তো কোন কথাই বললেন না ? মৌলানা নির্ঘাৎ প্রতিপ্রশ্ন করে বসবেন : কেন, তাতে বাগাড়ম্বরের কিছু খামতি হয়েছে ?

জিহ্বা জাগ্রত-মৌলানার হুকুমে চলে বটে, কিন্তু নাসিকা নিদ্রিত-মৌলানাকে চালায়। আর সেই আধিদৈবিক শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে ঋক্ষ-নিনাদের সাদৃশ্য এত বেশি যে, ভল্লুক-সমাকীর্ণ এ অরণ্যে সে বিভীষিকাকে উপেক্ষা করে পাশের খাটিয়ায় ঘুমাতে পারি—এত বড় বীর আমি নই। তাঁর সঙ্গে ডাকবাংলোয় ঘুমাতে যেতে হল না বলে আমি খুশি। যাক্, ঘুমটা তাহলে হবে।

কিন্তু নাসিকা-গর্জনের মতো নিদ্রাও কারও হাতধরা নয়। ঘুম এল না কিছুতেই। এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকি প্রহরের পর প্রহর। ও-পাশের খাটিয়ায় ডাক্তার পিল্লাইও উশখুশ করছেন মনে হল। ডাক্তার সাহেবের কম্পাউন্ডারবাবু সদরে গেছেন কয়েকটা ওষুধের প্যাকিং কেস আনতে। কম্পাউন্ডার-গৃহিণী একা তাঁবুতে রাত্রিবাস করতে সাহসী হননি। তিনি আছেন পাশের তাঁবুতে মিসেস পিল্লাই-এর সঙ্গে। সন্ধ্যা থেকেই অকালবর্ষণ শুরু হয়েছে। বৃষ্টিটা যদি তাড়াতাড়ি না থামে তাহলে পারলকোট যাবার পথ হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। টেবিলের উপর একটানা বৃষ্টির শব্দ। গাছের ছায়ায় টেবিল খাটানো। গাছের জল ঝরে পড়ছে। ব্যাঙ ডাকছে একনাগাড়ে বাংলাদেশের মতই। অকালবর্ষণে তাদের উল্লাসটা আর চেপে রাখতে পারছে না। লণ্ঠনটা কমানো আছে। ডবল-ফ্লাই তাঁবুর চন্দ্রাতপে চিমনির কালো একটা গোলাকৃতি ভূতুড়ে ছায়া। হাতঘড়িটা মাথার কাছে টেবিলে ছিল — দেখলাম রাত সাড়ে এগারটা।

ডাক্তার পিল্লাই বললেন : আপনারও ঘুম আসছে না বুঝি ?

বললুম : কই আর আসছে ? এমন একটা অদ্ভুত রাত কি ঘুমিয়ে কাটাবার ?

ডাক্তারবাবু কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : সেকি ? এমন রাত বুঝি জেগে কাটাতে হয় ? কিন্তু কি ভাবে নিশি ভোর হবে রাতি জাগিয়া ?

হেসে বললুম : সে কথা কি মুখে বলবার ? বুঝ লোকে যে জান সন্ধান।

ডাক্তারবাবুও হেসে বললেন : তা বটে ! কিন্তু এ অরণ্যে উপযুক্ত অনুপান জোগান দিই কেমন করে বলুন ?

বলি : শাস্ত্রে বলছে, ক্ষেত্র বিশেষে মধুর অভাবে গুড়ও চলতে পারে। অভাবপক্ষে নিদেন প্রেমের গল্পই শোনান বরং একটা —

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বসেন : বলেন কী মশাই ? আমি শোনার প্রেমের গল্প ? আমি ? নারানপুরের মোবাইল ডাক্তার পিল্লাই ? এ তল্লাটে ও বস্তু পাব কোথায় ? এ কি আপনাদের কলকাতা শহর ? অলিতে গলিতে এ বাড়ির রোয়াকে ও-বাড়ির জানলায় প্রেমের ফাঁস জড়ানো ?

: বেশ, একটা ভূতের গল্পই শোনান তাহলে। এ অরণ্য প্রেমের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা হলেও ভূতের পক্ষে নয় নিশ্চয়। প্রেম বিচিত্রগতি, কিন্তু ভূতের গতি সৰ্বত্র। শাস্ত্র যদিচ বলেননি ; তবু নলেনগুড়ের বদলে ক্ষেত্রবিশেষে না হয় ভেলিগুড়ই চলুক। এমন ঘনঘোর বর্ষগরাত্রে ভূতের গল্পও মন্দ জমবে না।

ডাক্তারসাহেব বলেন : আমাদের শাস্ত্র কিন্তু অন্য কথা বলে।

: কী বলে ?

: বলে, আপনাকে দু চামচ অ্যাকোয়া টাইকটিস্ খাওয়াতে। মুরগিটা হজম হয়নি আপনার।

আমি বললাম : শেষরক্ষার গদাইও মনে হচ্ছে প্রেমরোগের এবস্থিধ একটা প্রেসক্রিপশন বাতলেছিল।

পিল্লাই বলেন : স্বাভাবিক। গদাইও ছিল চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র। হৃদপিণ্ডের অবস্থান যে ঠিক পাক্ষ্যস্ত্রের ওপরেই, এ তত্ত্বটা আপনাদের মত কবিরা না মানলেও আমাদের মত কবিরাজরা মেনে থাকে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু গল্পই শোনাতে হল ওঁকে। আমি জানতাম এ ভদ্রলোক দীর্ঘদিন এই মাড়িয়া-মুরিয়াদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিকিৎসা করেছেন। দরদী লোক। ওঁর ঝুলি ঝাড়লে নিশ্চয় কিছু রসদের সন্ধান পাওয়া যাবে। উনিও জানতেন শুধু স্থাপত্যবিদ্যার প্রয়োগ করতেই আমি এ অরণ্যে আসিনি — এসেছি এ অরণ্যপর্বতের পথে-প্রান্তরে কিছু মণিমুক্তোর সন্ধানে। ফলে ডাক্তারবাবুকে শোনাতে হল তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে একটি বাস্তব গল্প। তবে উনি প্রথমেই একটা রফা করে নিলেন। ভূত নয়, যে গল্প উনি শোনাবেন সেটা পেড়ীর। আমি তাতেই রাজি।

জানি, নারানপুরের সেই বর্ষগমুখর রাত্রে টেণ্টের নিচে আধো-অন্ধকারে যে গল্পটি শুনেছিলাম সেটি হুবহু শোনার ক্ষমতা আমার নেই। সে গল্পের পূর্ণ রসাস্বাদন করতে হলে আপনাদের কষ্ট করে যেতে হবে সেই বিরলবসতি অরণ্যের একান্তে — মহুয়াগাছতলার সেই ডবল্-ফ্লাই তাঁবুর আশ্রয়ে। বেছে নিতে হবে ঝড়ো-হাওয়ার ক্ষ্যাপামিতে বিধ্বস্ত তেমনি একটি ধারাক্লাস্ত রাত্রি, খুঁজে নিতে হবে ডাক্তার পিল্লাইয়ের

মত একজন দরদী কথক, যিনি গোন্ডি আর হাল্‌বি শব্দের সুচয়িত প্রয়োগে এ গল্পের একটা মেজাজ আপনি গড়ে তুলতে পারেন।

আর একটা কথা। রসিকতা করে রমানাথন বলেছিলেন তিনি পেত্নীর গল্প শোনাচ্ছেন। আসলে কিন্তু এটি একটি প্রেমেরই গল্প। বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা নারী-পুরুষের বিচিত্রতম হৃদয়বৃত্তি। ওদের পূর্বরাগের ক্রীড়াপ্রাপ্ত ঘট্টলের অদ্ভুত আইন-কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেড়া। ঘটলঘরের আধো-অন্ধকারে প্রেম-বিরহ, ঈর্ষা-আত্মত্যাগের অদ্ভুত ইতিকথা। আমাদের অতিপরিচিত ড্রইং-রুম-পূর্বরাগের মার্জিত-রুচি সে কাহিনীতে আশা করা অন্যায়, কিন্তু তাতে আদিম হৃদয়াবেগের অভাব দেখিনি। ডাক্তারবাবুর নায়ক হয়তো সংস্কৃত-কাব্যের নায়কের সংজ্ঞা মেনে চলেনি, দুটি নায়িকা প্রেম-নাটকের আইন-কানুন অমান্য করে বিচিত্র পথে আনাগোনা করেছে নায়কের চরিত্রটি ঘিরে, তবু এক অখ্যাত পল্লীর তিনটি চরিত্র কেমন যেন মূর্ত হয়ে উঠল আমাদের চোখের সামনে। অন্তত সেদিন তাই মনে হয়েছিল আমার।

আজ ভুলটা বুঝতে পারি। ডাক্তারবাবুর গল্পের নায়ক সেই সুদর্শন মুরিয়া তরুণটি নয়। এ কাহিনীর নায়ককে সেদিন চিনতে পারিনি। আজ পারি। এ কাহিনীর নায়ক স্বয়ং ডাক্তার রমানাথন পিল্লাই! সভ্যজগত থেকে বহু দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এ নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন একজন সভ্যজগতের প্রতিনিধি। জীবনে প্রতিষ্ঠা, বিলিয়ান্ট কেরিয়ার, বৈজ্ঞানিক জগতের মৌলিক গবেষণার সম্ভাবনাকে ভাসিয়ে দিয়ে এ গল্পের নায়ক নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন একটি মুরিয়ার প্রেমে অন্ধ হয়ে। সে কথা সেদিন ডাক্তার পিল্লাই গোপন করতে চেয়েছিলেন। আজ তিনি ধরা পড়ে গেছেন আমার কাছে।

গল্প শুনতে শুনতে শেষ হয়ে এল রাত। ক্রমে ভোরের আলো ফুটে উঠল পূর্ব আকাশে। তবু শেষ হল না গল্প। ডাক্তারবাবুর জবানিতেই গল্পটি বলার চেষ্টা করছি:

প্রায় মাস দুয়েক আগের কথা। সবে বদলি হয়ে এসেছি নারানপুরে। সেদিন ডিস্‌পেন্সারিতে বসে একটি রোগীকে ড্রেস করে দিচ্ছি, হঠাৎ বাইরে কেমন একটা সোরগোল উঠল। সকাল বেলা। রোগীর ভিড় বেশ আছে। ওরা সচরাচর বাইরের গাছতলায় গোল হয়ে বসে থাকে। কম্পাউন্ডার বিনোদবাবু এক-একটি রোগীকে ভিতরে ঢোকান ছাড়পত্র দেয়। একে একে ওরা আসে, রোগের বর্ণনা দেয়। আমি পরীক্ষা করি প্রেসক্রিপশান লিখে দিই। পাশের ঘর থেকে ওষুধ নিয়ে ওরা চলে যায়। চেকামেটি সোরগোল ওদের ধাতে নেই। আগে দেখাবার জন্যে, আগে ওষুধ নেবার জন্যে কোন ছড়োছড়ি নেই। তাই সোরগোলটা শুনে এগিয়ে গেলাম জানলার কাছে। দেখলাম বাইরে বেশ একটা জনতা। সবাই মুরিয়া গোণ্ড। আর জনতার কেন্দ্রস্থলে দেখলাম দুজন জোয়ান মানুষ শক্ত করে ধরে রেখেছে একটি ছেলের দুই বাহু। একনজর দেখেই কিন্তু মোহিত হয়ে গেলাম আমি। ছেলেটির বয়স বছর কুড়ি হতে পারে। খালি গা, মালকোঁচা-সাঁটা ফর্সা একটা ধুতি। গলায় একসার লাল-সাদা-নীল পুঁতির মালা। পাগড়িতেও একছড়া পুঁতির মালা, তার উপর ময়ূরের একটা পালক। দুহাতে দুটি ভারী দস্তার বালা। কিন্তু সাজপোশাকের চেয়ে মানুষটাই মনকে আকৃষ্ট করে

গোশ। আপনার তো স্কেচ আঁকার বাতিক আছে, আমি নিশ্চিত বলতে পারি, ওকে দেখলে আপনি রাজ্যের কাজ ফেলে রঙ-তুলি নিয়ে বসবেন। প্রশস্ত বক্ষকপাট, পেশল বাহুসন্ধি, ক্ষীণ কটি। অপ্রচুর বস্ত্রের প্রান্ত থেকে বের হয়ে এসেছে মাংসল দুটি জঙঘা—পৌরুষের মূর্তপ্রতীক যেন সে। মনে হল, মানুষ নয়—মার্বেলে-গড়া অ্যাপোলোর একটি মর্মর মূর্তি চাইনিজ ইংকের চৌবাচ্চায় চুবিয়ে কেউ এনে খাড়া করেছে আমার সামনে!

ফিরে এলাম জানলা থেকে। আমাকে জানলার ধারে উঠে যেতে দেখেই ওদের সোরগোলটা থেমে গিয়েছিল। কম্পাউন্ডারকে বললাম : ব্যাপার কী? ওকে এভাবে ধরে এনেছে কেন?

বিনোদ বললে : কী জানি কেন। বোধহয় অপরের শুয়োর জোর করে কেটে খেয়েছে। তাই, আপনার কাছে ধরে এনেছে বিচারের আশায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম : চুরি-চামারি করে থাকে তাহলে আমার কাছে কেন? থানায় যেতে বল। দেখ তো ব্যাপারটা কী।

একটু পরেই ফিরে এল কম্পাউন্ডার। চোর নয়, ছেলেটি পাগল। চিকিৎসা করাতে এনেছে। পাগল? বিধাতার এমন আশ্চর্য সৃষ্টি একটিমাত্র শব্দে এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল?

দুজনে দুদিক থেকে ধরে ওকে নিয়ে এল আমার কাছে। বন্দী বীরের মতই মাথা উঁচু করে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। যেন চন্দ্রগুপ্তকে ধরে আনা হয়েছে সেকেন্দারের তাঁবুতে। আমার দিকে চাইল না কিন্তু। দৃষ্টি তার আমার খোলা জানলা দিয়ে চলে গেছে বহুদূরে — রুম্ব পাহাড়ে দৃশ্যপটের ওপারে পাণ্ডুর দিগন্তে — ধূসর আকাশে যেখান পাক খাচ্ছে কী একটা নাম-না-জানা পাখি। কপালে জেগেছে কুণ্ডন। যেন পরিস্থিতিটা ঠিকমতো বরদাস্ত হচ্ছে না ওর। হঠাৎ আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল একটা বুড়ি। ছেলেটার মা। বললে : তোকে জোড়া শুয়োর দেব। তুই ভাল করে দে আমার চ্যনকে!

: চ্যন! — চম্কে উঠি আমি।

: হ্যাঁ, চ্যন। চ্যন শিরদার। মুরিয়া সন্তান। কাবোঙ্গা গাঁয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলে। — বললেন ডাক্তারবাবু!

আমি চুপ করে গেলাম। গল্পের এ অংশে বাধা দিলাম না। বললাম না, ছেলেটিকে আমি ভাল করেই চিনি। কিন্তু আমার মনের পর্দায় ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে উঠল কয়েকটা ছবি। সিনেমার মণ্টাজ এফেক্টে যেমন দেখা যায়। গীতাঞ্জলি হাতে চ্যন, বাদল-ধারার গানে বিহুল চ্যন, রঙিলার বিদ্রূপে বিপর্যস্ত চ্যন — আর তালোয়ের ধারে সাবুগাছতলায় বসে-থাকা উপেক্ষিত নিঃসঙ্গ নায়ক চ্যন শিরদার!

ডাক্তারবাবু আমার সে ভাবান্তর লক্ষ্য করেননি। আপন মনে তিনি গল্পের জাল বুনে চলেন : হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সবাই। ধরে তুলল বুড়িকে। জোড়া শুয়োরের মোড়ে নয়, নিজের গরজেই খুঁটিয়ে শুনলাম কেস হিস্ট্রিটা। চ্যন হচ্ছে কাবোঙ্গা ঘটুলের মধ্যমণি। কী তীর ছোঁড়া, কী শিকার — কী নাচগান হৈ-হল্লা, সেই ছিল

কাবোজার প্রাণ। গাঁয়ের ছেলেমেয়ের দল ওকেই করেছিল ঘটুলের শিরদার, অর্থাৎ প্রধান দলপতি। কোন চেলিক অন্যায় করলে চয়ন তার বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করত। কোন মোটিয়ারী অন্যায় করলে শাস্তি দিত। সকলে মাথা পেতে মেনে নিত সে আদেশ। ওদের গাঁয়ের ঘটুলে শিরদার ছিল বটে, কিন্তু বেলোসা ছিল না। অর্থাৎ রাজ্যে রাজা আছে, রানী নেই। বস্তুত চয়নের পাশে দাঁড়াবার মত উপযুক্ত মেয়েই ছিল না কাবোজায়। তা ছাড়া চয়ন ছিল মেয়েদের বিষয়ে জন্ম-উদাসীন। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার অবকাশই সে পায়নি কোনদিন। ঘটুলের সব-ব্যবস্থাপনা তাকে করতে হয়, সেই দলপতি। তারই নির্দেশে ছেলেরা মাঠে ধান রুইতে যায়, কাঠ কাটতে ছোট্টে; মেয়েরা ধান ভানে, গান গায়, ঘর নিকায়, ঘটুলের প্রাঙ্গণ মার্জনা করে। ধনুক, তীর, টাঙি আর নারানপুরের হাট থেকে কেনা একটা বাঁশের বাঁশিতেই ছিল ওর প্রাণ। কিন্তু চয়ন উদাসীন হলে কী হবে — কাবোজা গাঁয়ের উদ্ভিন্নযৌবনা মোটিয়ারীর দল তো আর অন্ধ নয়। তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওর কাণ্ড, কানাকানি করে। শিকারের সময় তীরবিদ্ধ হরিণের উপর যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়ে শিকারী চেলিকের দল তখন দেখা যায় চয়নের কড়ি-বাঁধা তীরটাই বিঁধে আছে তার বক্ষদেশে। যখন ওরা শিকারের পিছনে দলবেঁধে ছোট্টে তখন সকলের নাগাল ছাড়িয়ে সবার আগে ছুটত চয়ন, তার বাঁশপাতার মত লঘুহৃদ হাল্কা দেহখানি নিয়ে। আবার জ্যোৎস্নারাত্রী ঘটুল-প্রাঙ্গণে যখন সুরেলা-ছন্দের মোহ-বিস্তার করে তালে তালে নাচতে থাকে চেলিক-মোটিয়ারীর দল তখন চয়ন হয়ত বেরিয়ে পড়ে একা। শাল-মহুয়ার বনভূমির ভিতর থেকে ছোপধরা জ্যোৎস্নার টুকরোর মত ভেসে আসে বাঁশির আর্ত কান্না। থেমে যায় ঘটুলের বিড়িয়াটোল সে সুরের মুর্ছনায়, তাল কাটে মোটিয়ারীদের নূপুর-নন্দিত চরণ!

তবু ওরা কোনদিন চয়নের নাগাল পায়নি! কোন মেয়েকেই ওরা বেলোসা করতে সাহসী হয়নি। বরং বলা যায় কোন মেয়েই বেলোসা হতে স্বীকৃত হয়নি। ঘটুলের নিয়ম অনুযায়ী চয়নকে শুতে হত তিনদিন অন্তর নতুন মোটিয়ারীকে নিয়ে। নীরঞ্জন অন্ধকারের সুযোগে আর সবাই যখন যৌবন-রাজ্যের তোরণদ্বারের চাবি খুঁজতে ব্যস্ত, চয়ন তখন তার কঠলগা মোটিয়ারীর মাথায় হাত বুলাত ধীরে ধীরে। কাবোজা গাঁয়ের মেয়েরা জানত শিরদার হচ্ছে ওদের সকলের বড়ভাই — বড়দাদা। তার সে স্পর্শের মধ্যে তারা খুঁজে পেত প্রীতির একটা ব্যঞ্জনা, স্নেহের একটা আর্তি — তার বেশি কিছু নয়। মোটিয়ারীর দল নিজেদের মধ্যে কানাকানি করত — চয়ন এমন আলাদা জাতের কেন, এমন খাপছাড়া কেন? চয়ন যে রাত্রি যাকে নিয়ে শোয় তার পরদিন তাকে সহস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্ন হাজার রকমের হতে পারে — জবাব হত একই। চয়নের ব্যবহারে, তার স্পর্শে বড়ভাইয়ের স্নেহপ্রীতির বেশি আর কিছু পায়নি কেউ। শেষে ওদের কৌতুহলেরও অবসান হল ক্রমে। ওরা মেনে নিয়েছিল শিরদারের তথাকথিত যৌবন কোনদিনই আসবে না। বুঝে নিয়েছিল, দেব বড়াপেন চয়নের সুগঠিত তনুর স্তরে স্তরে যৌবনের উপাদান এত ঢেলেছেন যে মন তৈরি করার সময় আর কিছু বাকি ছিল না তাঁর ঝোঁলায়! চয়নকে ওরা

সম্মানের এমন একটি উচ্চ-সিংহাসনে বসিয়েছিল যে, এই সহজ সরল প্রশ্নটা তাকে করতে কেউ ভরসা পায়নি—এমনকি ওর সমবয়সী বন্ধু কোতোয়ার পর্যন্ত নয়। কাবোঙ্গা ঘটল মেনে নিয়েছিল চয়ন একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম, ছন্নছাড়া উদ্ভুটে জীব।



চয়ন শিরদার

একটু দম নিয়ে ডাক্তারবাবু ফের শুরু করেন :

এ তো গেল পটভূমি। রোগের ইতিহাসটা শুনলাম ক্রমে। গত বছর ফাগুন মাসের কথা। কারাংমেটা থেকে ওরা দলবেঁধে গিয়েছিল কাবোঙ্গা ঘটলে। চৈত-দাণ্ডার উৎসবে। এমন উৎসবরাত্রে সবাই একটু বাঁধন-ছেঁড়া হয়ে পড়ে। সচরাচর সঙ্গী বদল হয়। দু-পক্ষই একটু মুখ বদলাবার সুযোগ খোঁজে। আগন্তুক চেলিকদল বেছে নেয় স্থানীয় মোটিয়ারীদের ; আগন্তুক মোটিয়ারীর দল ধরা দেয় স্থানীয় চেলিকের বাহুবন্ধনে। সে রাত্রেও নিয়মমতো সবই হল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলল খেলা-ধাঁধা-নাচ-গান। তারপর ঘটলঘরের অন্ধকারে মছয়ার নেশায় মাতোয়ারা ছেলেমেয়ের দল কে কার মাসানিতে রাত কাটালো কে তার হিসাব রাখে। কী যে ঘটল সে রাত্রে কেউ তা জানে না। শুধু পরদিন সকালে দেখা গেল চয়নের চোখে লেগেছে যৌবনের মোহাঞ্জন। ধ্যান ভেঙেছে নিঃসঙ্গ নায়কের। চয়নের মন অবশেষে বাঁধা পড়ল কারাংমেটার একটি মেয়ের আঁচলে।

চয়নের বাপ-মা খুশি হল এতে। কারাংমেটার গাইতা আয়েতু-গোণ্ড হচ্ছে চয়নদের পাল্টি ঘর। আকোমোমা শ্রেণীর। বিবাহে বাধা নেই কিছু। স্থির হল চয়ন আয়েতুর বাড়িতে লামহাদা খাটতে যাবে।

আমি বাধা দিয়ে বলি : ‘লামহাদা’ বস্তুটা কী ?

: ও, আপনি তাও জানেন না বুঝি ? মুরিয়াদের মধ্যে কয়েক রকমের বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একই ঘটুলের ছেলেমেয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। আবার যে কোন ছেলে অন্য কোন ঘটুল থেকেও পাত্রী সংগ্রহ করে আনতে পারে। শুধু দেখতে হবে কনে যেন বরের ‘দাদাভাই’ গোত্রের না হয়। আকোমোমা হলোই হল। কোন কোন ক্ষেত্রে বরের বাপ হয়তো প্রতিশ্রুত ‘বার্না’ বা কন্যাপণ দিয়ে উঠতে পারে না। ছ’মাস, এক বছর, দু’বছর পাত্রকে সে-ক্ষেত্রে স্বশুরবাড়িতে থাকতে হয় — মজুর হিসাবে খাটতে হয় হবু-স্বশুরের ক্ষেত্রে। দুই-তিন বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বার্না শোধ দিতে হয়। তখন বাজে মান্দ্রি ঢোল, ধুশীর আর কেকরেং। চেলিক মোটিয়ারীদের ডাক পড়ে! বিয়ে বসে বর-কনে। এই জাতীয় হবু-জামাইকে বলে ‘লামহাদা’। খাওয়া-পরা ছাড়া লামহাদা হবু-স্বশুরের কাছে আর যদি কিছু প্রত্যাশা করে তা হচ্ছে কোন ভবিষ্যৎ-দিনে তার কন্যাটিকে। কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে আর কোন মজুরি সে পায় না। তবে হ্যাঁ, যদি লামহাদা খাটতে খাটতে হঠাৎ খবর পায় পাত্রী অপর কারও সাথে ভেগে পড়েছে তখন সে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। পাত্র যদি ভিনগাঁ থেকে লামহাদা খাটতে আসে, তখন তাকে এ গাঁয়ের ঘটুলের সভ্য করে নেওয়া হয়। রাত্রে লামহাদা ঘটুলেই নিদ্রা যায়, আর পাঁচটা অবিবাহিত চেলিকের মতো। ঘটুলের অন্যান্য চেলিকের সঙ্গে তার অধিকারগত প্রভেদ কিছু নেই — একটিমাত্র বিষয় ছাড়া। সে ঘটুল যদি জোড়িদার ঘটুল হয় তাহলে সে একটি মোটিয়ারীর সঙ্গে স্থায়ীভাবে জোড় বাঁধে — যতদিন না তার বিয়ে হয়। প্রশ্ন হতে পারে ভাবী বধুও যখন সেই একই ঘটুলের মোটিয়ারী তখন লামহাদা তো তাকেও শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পেতে পারে। এখানেই মজা। তা সে পারে না। অন্যান্য চেলিকের থেকে এইটুকুই তার অধিকারগত পার্থক্য। ভাবী বধু তার লামহাদার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। লামহাদা যেন হবুবউয়ের ভাশুরঠাকুর। লামহাদার সঙ্গে তার ভাবী বধুর কোন গোপন সম্পর্ক যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অবাধ কোর্টশিপের রাজ্য ঘটুলঘরে একটিমাত্র নিষেধের বেড়া আছে। — ‘এনগেজমেন্ট’ ঘোষিত হবার পর আর ওটি চলবে না! অথচ একই ঘটুলঘরে ভাবী বধু হয়তো অন্য কোন চেলিকের বাহুবন্ধনে রাত্রিযাপন করে লামহাদার মাদুর থেকে কয়েক হাত দূরে।

চয়ন এল কারাংমেটা গাঁয়ে আয়েতুগোণ্ডের বাড়ি, লামহাদা খাটতে। এমনিতেই চয়ন ছিল অত্যন্ত কর্মঠ, বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী। তার উপর স্বশুরের কাছ থেকে আশু অনুমতি পাবার আশায় সে প্রাণ দিয়ে খাটতে শুরু করে আয়েতুর খামারে। আয়েতু গাঁয়ের সদরি। বয়স হয়েছে। ছেলে নেই। সংসারে আছে বউ আখালী, বুড়ি পিসিমা কিরিংগো, আর দুই মেয়ে। ফুলের মতো নিষ্পাপ সুন্দরী মাল্কো আর আগুনের মতো উজ্জ্বল রূপসী রঙিলা। রঙিলা বড় বোন।

আমি বললুম : কার জন্যে লামহাদা খাটতে এল চয়ন ?

দণ্ডক.শবরী

এইখানে ডাক্তার পিল্লায়ের সঙ্গে আমার কিছু কথোপকথন হয়েছিল যা গল্পের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হলেও কৌতূহলী পাঠকের খাতিরে তা লিপিবদ্ধ করলাম :

আমি বললুম : আচ্ছা ঘটুলের খেলাঘরে যারা বরকনে সাজে তাদের মধ্যেই কি বেশি বিয়ে হয় ?

ডাক্তার-সাহেব বললেন : এ সম্বন্ধে, যতদূর জানি, সাম্প্রতিককালে কোন গবেষণা হয়নি। তবে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন সাগরপারের কোন কোন মানুষ এদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। ভেরিয়ার এলুইন সাহেবের একটা পরিসংখ্যান আছে এ বিষয়ে। তিনি দুই হাজারটি ঘুরিয়া বিয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সেটাই একমাত্র রেকর্ড।

কৌতূহল প্রবল। বললুম : কাল সকালে সেটা খুঁজে বার করবেন তো, দেখব।

: মনে আছে আমার। খুঁজতে হবে না। শুনুন। দুই হাজারটি বিয়ের হিসাব হল :

বাপ-মায়ের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের নিবাচিত পাত্রী স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিয়ে করেছে

... 1884 জন অর্থাৎ 94.20%

বাপ-মায়ের অনুমতি ব্যতিরেকে অস্বাভাবিক বিয়ে

... 116 জন অর্থাৎ 5.80%।

এই একশ খোলটি অস্বাভাবিক বিয়ের হিসাব :

ঘটুল-সঙ্গিনীকে ভালবেসে পরে অনুমতি নিয়ে

77টি

ঘটুল-সঙ্গিনী গর্ভবতী হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে

26টি

ঘটুল-সঙ্গিনীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে

13টি

একুনে 116টি

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক ডাক্তার, আদিবাসী-উন্নয়ন অফিসার নন। তাহলে এভাবে এত সংখ্যাতত্ত্ব মুখস্থ রেখেছেন কেমন করে? সেকথা না বলে শুধু বললুম : কিন্তু এর মধ্যে আমার প্রশ্নের জবাব কোথায়? আমি জানতে চাইছি ওরা ঘটুল সঙ্গিনীকে বেশি বিয়ে করে, না বাইরের কোন মেয়েকে।

: বলতে দিন মশাই সবটা—ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু। ভেরিয়ার সাহেবের পরীক্ষিত দুই হাজারটি বিয়ের মধ্যে একই ঘটুলের চেলিক-মোটিয়ারীর বিয়ে আছে মাত্র 756টি; আর অপর ঘটুল থেকে অজানা পাত্রীকে সংগ্রহ করে এনেছে বাকি 1,235 জন চেলিক। তার মধ্যে 113টি ছিল ‘লায়হাদা’ বিয়ে।

আমি বললুম : আশ্চর্য তো। এমন রোমান্টিক নাইট-ক্লাবে তো এরকমটি হওয়ার কথা নয়।

ডাক্তারবাবু বললেন : আমার তো মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক। একাম্বর্তী পরিবারভুক্ত ছেলেমেয়েরা যেমন একই সঙ্গে বেড়ে ওঠার সময় পরস্পরের প্রতি ততটা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না — এদেরও অবস্থা তেমনি।

আমি বললুম : আচ্ছা বিবাহের ফলাফলের কোন পরিসংখ্যান আছে?

উনি বললেন : ঠিক কী জানতে চাইছেন বলুন।

: আমি জানতে চাইছি এদের মধ্যে সুখী দম্পতি বেশি আছে কোন দলে? দু হাজার বিয়ের মধ্যে মাত্র 116টি হচ্ছে লুভ-ম্যারেজ। কোনদলের কজন সুখী হয়েছে?

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন : আমি যদি প্রতিপ্রশ্ন করি—সুখী দম্পতির সংজ্ঞা কী? আপনাদের সহস্রাব্দীর সংস্কৃতির উপর গড়ে-ওঠা সমাজ দম্পতির সুখের কোন মানদণ্ড আবিষ্কার করতে পেরেছে কি?

কোণঠাসা হয়ে বলি : সুখের না হলেও অসুখের একটা মাপকাঠি আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ দাম্পত্য থামোমিটারের নিম্ন-সীমান্ত, ফ্রিজিং পয়েন্ট।

ডাক্তারবাবু বলেন : তাহলে অবশ্য একটা হিসাব দাখিল করতে পারি। পিতৃ-আদেশে যে 1884 জন বিয়ে করেছিল তাদের মধ্যে 49 জন পরে বিবাহ-বিচ্ছেদের শরণাপন্ন হয়, অর্থাৎ 2.6 জন। অপরপক্ষে যারা নিজে পছন্দ করে বা ভালবেসে বিয়ে করেছিল, সেই 116 জনের মধ্যে 10 জন

বিচ্ছেদ চায় ; অর্থাৎ ৮.৬ শতাংশ। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদকেই যদি দাম্পত্য-উত্তাপের ফ্রিজিং-পয়েন্ট বলেন, তাহলে আমি বলব...

আমি বাধা দিয়ে বলি : বুঝলাম ! এবার পরিসংখ্যান ছেড়ে গল্পটা বলুন। চয়ন এল কারাংমেটায় লামহাদা খাটতে। তারপরে ?]

ডাক্তারবাবু আমার প্রশ্নটা কানেই তুললেন না। আপন মনে বলে চলেন ! বছরখানেক লামহাদা খাটবার পরে যেদিন আয়েতু রাজি হল কন্যা সম্প্রদানে সেদিনই ঘটল দুর্ঘটনাটা। অবশ্য ঘটনা যে কী ঘটেছিল তা ওরা কেউ ঠিক মতো বলতে পারলে না। তবে ঐদিনই যে কিছু একটা ঘটেছিল এ কথা নিশ্চিত। কারণ পরদিন থেকেই চয়নের ভাবান্তর দেখা গেল। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পাগলামির প্রচ্ছন্ন লক্ষণ প্রকট হল। আয়েতু খবর পাঠাল কাবোঙ্গায়। চয়নের বাপ কোণ্ডা এল ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তারপর থেকে সে কাবোঙ্গাতেই আছে। এখন সে বদ্ধ পাগল।

পাগলামির লক্ষণগুলি জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারবাবু জানতে পারেন চয়ন নাকি কারও সঙ্গে কথা বলে না। খায় না, ঘুমায় না। সারাদিন শুধু পায়চারি করে আর বিড়বিড় করে বকে আপন মনে। হাতে পায়ের গাঁটে গাঁটে ওর বেদনা বোধ হয়। কেউ জোর করে খাওয়াতে এলে তাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। ক’দিন হল পাগলামির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওকে নাকি বেঁধে রাখতে হয়েছিল।

যে ভাষায় ওরা কথা বলছিল সেই গোণ্ডিই হচ্ছে চয়নের মাতৃভাষা। ডাক্তার-সাহেব কেস্ হিস্টিটা শুনছিলেন কান দিয়ে, কিন্তু তাঁর নজর ছিল চয়নের উপর। আশ্চর্য, সে যেন বধির। এ কাহিনীর বিন্দুমাত্র যে তার বোধগম্য হয়েছিল তা মনে হয়নি ডাক্তারবাবুর— ওর ভাবলেশহীন মূর্তি দেখে। দু-একটা প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। চয়ন নির্বাক। সে যে ডাক্তারবাবুর প্রশ্নগুলি শুনেছে, তার অর্থ বুঝেছে, তাও মনে হয়নি। শুধু মুক নয়, সে যেন বধিরও। জানালা দিয়ে তাপদঙ্ক দিগন্তের পাণ্ডুর ধূসরতার দিকে নিম্প্রাণ দুটি চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল চয়ন — যেন এক পাথরের মূর্তি।

ডাক্তারবাবু ওর বাঁধন খুলে দিতে বললেন। ওরা প্রথমটা রাজি হয়নি। শেষে ডাক্তারবাবুর পীড়াপীড়িতে চয়নের বাঁধনটা ওরা খুলে দিল। ভয়ত্রস্ত-দৃষ্টিতে জনতা লক্ষ্য করতে থাকে চয়ন এবার কী করে। কিছুই করল না চয়ন — উবু হয়ে বসল সে, মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু বাঁধন খুলে দেবার সময় সে একবার ডাক্তারবাবুর দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল। ক্ষণিকের দৃষ্টি !

ডাক্তারবাবু আমার কাছে সে দৃষ্টির বিশ্লেষণ করে বললেন, বিদ্যুতচমকের মতো আমার মনে হল — চয়ন কখনও সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়নি। ওর চোখে আমি কৃতজ্ঞতার একটা আভাস দেখেছি। ও বুঝতে পেরেছে—আমার আদেশেই ওর বাঁধনটা খুলে দেওয়া হল। তাই ওর সেই চকিত দৃষ্টির কৃতজ্ঞতা। তাই যদি হবে—তাহলে সে বদ্ধ-উন্মাদ কখনই নয় !

ওদের সকলকে ঘর থেকে বিদায় করে ডাক্তারবাবু জনান্তিকে দাঁড়িয়েছিলেন চয়নের মুখোমুখি। প্রশ্ন করেছিলেন, চয়ন ! তোমার কী হয়েছে ?

পূর্ণদৃষ্টিতে চয়ন একবার ওঁর দিকে তাকালো। পরমুহূর্তেই নত হল তার দৃষ্টি। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ওরা বলছে তুমি পাগল। আমার বিশ্বাস ওরা ভুল বলছে,

নয় ?

জবাব নেই। চয়ন নিশ্চয় পাথরের মতোই ভাবলেশহীন।

—ওরা তোমাকে কষ্ট দেয়, বেঁধে রাখে, তাই নয় ? তোমার মনের কথা বুঝতে পারে না, আমি জানি। আমাকে বলবে সব কথা ?

চয়ন এবারও নিরুত্তর।

—ওরা মিছিমিছি তোমাকে ভয় পায়। আমি তো তোমাকে ভয় পাই না। আমি তো তোমাকে পাগল মনে করি না। তুমি আমাকে বল কী কষ্ট, তুমি কী চাও — আমি সব ব্যবস্থা করে দেব ! আবার আগের মতো হয়ে যাবে তুমি। বলবে আমাকে সব তোমার কথা ?

আবার চোখ তুলে তাকাল চয়ন। ডাক্তারবাবুর মনে হল, ওর চোখের তারায় যেন একটা প্রত্যাশা কাঁপছে, ঝোড়ো হাওয়ায় বাঁশপাতার মতো। ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে সে যেন শুনতে পেয়েছে সুস্থ-সবল প্রাণময় পৃথিবীর আহ্বান, যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে যৌবন-উচ্ছল ঐ অরণ্যচারী মানুষটা তারুণ্যের দুবার প্রেরণায় ছুটে বেড়াতো বন থেকে বনান্তরে। সে দৃষ্টি যে দেখেছে সে হলপ করে বলতে পারে চয়ন কখনও সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায়নি। উমাদের ঘোলাটে চোখে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও-ভাবে দোল খেতে পারে না। ডাক্তারবাবুর মনে হল চয়ন তাঁর কথা বুঝতে পারছে ঠিকই, কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। আত্মীয়-বন্ধু মায় গোটা দুনিয়ার প্রতি তার অভিমান ! কাউকে ও বিশ্বাস করে না। পাগল নয়, তবু সে পাগল সেজে আছে ! ডাক্তারবাবু ওকে বললেন, আমাকে তুমি সব কথা খুলে বলতে পার না ? আমি কাউকে কোন কথা বলব না। আমাকে যদি সব কথা খুলে বলতে না পার, তাহলে বল, কাকে তোমার মনের কথা বলতে পারবে ?

ডাক্তার পিল্লাই প্রশ্নটা নিষ্ফলপ করে ওকে লক্ষ্য করতে থাকেন। ওঁর মনে হল চয়ন যেন তিলে তিলে ওঁর অন্তরের কাছে সরে আসছে। ওঁকে বিশ্বাস করতে, ওঁর কাছে ধরা দিতে চেষ্টা করছে। মনের মধ্যে একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলেছে চয়নের। ধীরে ধীরে ওর চোখের উপর থেকে পাগলামির আচ্ছন্নতার একটা পর্দা যেন উপরে উঠে যাচ্ছে — যেমন করে ভোরবেলাকার কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্য ওঠে।

ডাক্তারবাবু বললেন, মালকোকে ডাকব ? রঙিলাকে ?

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল চয়ন, না-না-না !

থপ করে বসে পড়ল ফের মাটিতে। আর সেই চিৎকারে ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে আবার সবাই ঢুকে পড়ল ঘরে।

ভুল, ভুল, মমাস্তিক ভুল করে বসেছেন ডাক্তার পিল্লাই। এত সহজ কথাটা তাঁর খেয়াল করা উচিত ছিল। অনুমান করা উচিত ছিল, বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে-আসা বরের মনের গভীরে যদি কোন কাঁটা বিঁধে থাকে — তাহলে তা হচ্ছে তার হলেও — হতে-পারত কনের কাঁটা ! আর উনি নির্বোধের মতো চয়নের সেই বেদনার জায়গাটাই মাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে ওর অন্তরাত্মা আতর্জনাদ করে উঠেছে ! পিল্লাই-সাহেবের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, পরীক্ষা কার্যের আপাতত ঐখানেই

যবনিকা।

ডাক্তার সাহেবের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল ছেলেটি উন্মাদ নয়। ঈশ্বরের এমন একটি অপূর্ব সৃষ্টি কি এভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে? এ নিশ্চয় কঠিন ‘সাইকলজিক্যাল কেস’। ওঁর মনে হয়েছিল চয়নের চিকিৎসার মাধ্যমেই আদিবাসী-মনের একটা অনুদ্যুত মহাদেশ হয়তো আবিষ্কার করতে পারবেন। যতটা ওঁদের আগ্রহ ছিল তার চেয়ে ডাক্তারবাবুর উৎসাহই যেন বেশি। একটা কথা ডাক্তারবাবু কিছুতেই ভুলতে পারেননি—কাবোঙ্গা গাঁয়ের ঐ অসভ্য লোকগুলি সাত মাইল পথ ঠেঙিয়ে তাঁর কাছেই এসেছে, গুণিয়ার কাছে যায়নি। ঝাড়ফুক মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারস্থ হয়নি। পরে অবশ্য তিনি জানতে পারেন যে ঝাড়-ফুকের রাজ্য অতিক্রম করেই ওরা এসেছিল তাঁর কাছে। তা হোক, তবু চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে নেমে তিনি নিজের দায়িত্বের কথা ভোলেননি। উনি লক্ষ্য করেছেন, ঐ নেংটিসার মানুষগুলো কেমন তিল তিল করে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে শিখছে। সভ্য জগতের মানুষের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলছে। তার অনিবার্য ফলস্বরূপ একদল ঝাড়-ফুক-মন্ত্র-তন্ত্র-ওয়ালাদের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর একটা সংঘাত পাকিয়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে। নারানপুরে কাজে যোগ দেবার পর থেকেই সেটা তিনি অনুভব করেছিলেন। এক্ষেত্রেও তাই হল। কাবোঙ্গা গাঁয়ের গুণিয়া ইতিপূর্বেই নিদান হেঁকেছিল — চয়ন ভুগছে অপদেবতার অভিশাপে। ‘পাংনাহিন নিহনী ধুরবান!’ মন্ত্রবিলাসিনী ডাইনীর নিষ্কিণ্ড মারণমন্ত্র। একমাত্র নাকি সেই ডাইনীই পারে আবার চয়নকে স্বাভাবিক মানুষ করে তুলতে। আর কারও সে ক্ষমতা নেই। তাই ডাক্তারবাবু যখন কেসটা হাতে নিয়ে চয়নের আত্মীয়স্বজনকে ভরসা দিতে গেলেন তখন খল্খল করে হেসে উঠেছিল লোকটা।

ডাক্তারবাবু ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, এই! হাসছ কেন তুমি?

লোকটা ঝাঁকড়া চুল সমেত মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে : হাসব না? তুই কেন মিছামিছি এদের বলছিস্ যে, চয়ন আবার ভাল হয়ে যাবে?

ডাক্তারবাবু বললেন, মিছে কথা আমি বলি না, চয়ন সত্যিই সেরে উঠবে। আমি তাকে সারিয়ে তুলব।

লোকটা অবজ্ঞার হাসি হেসেছিল।

ওর সে হাসি দেখে পিণ্ডি জ্বলে গেল ডাক্তারবাবুর। গুণিয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন উনি। যেমন করে হোক চয়নকে ভাল করে তুলতে হবে—এই হল ওঁর পণ। চয়নকে নিজ হেপাজতে রাখলেন। কথা হল, রোজ বিকালে কেউ না কেউ এসে চয়নকে দেখে যাবে।

গুণিয়া যাবার সময় উপদেশ দেবার ছলে বললে, এ কিন্তু তুই ভাল করলি না। শুধু শুধু তুই বিপদ ডেকে আনছিস।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, সে আমি বুঝব। আর শোন, তুমি আর আসবে না এখানে।

লোকটা কুখে উঠে বলে, কেন? আসব না কেন?

—না! তুমি এলে আমার চিকিৎসার ফল হবে না। তুমি তো তোমার মস্ততন্ত্র সবই খাটিয়েছ — তখন তো আমি বাধা দিতে যাইনি। এবার আমার চিকিৎসা যখন চলবে তখন তুমিও আসবে না বাধা দিতে।



একটি মাড়িয়া তরুণী—(কোকামেটায় আঁকা)

—বাধা দিতে যাব কেন? কর না তুই কী করতে চাস! — বললে লোকটা।

—না! তুমি আসবে না। আমি বারণ করছি!

হঠাৎ ক্ষেপে গেল মানুষটা। ধবক করে স্বলে উঠল ওর চোখ দুটো। চিংকার করে উঠল, তোরও ঐ অবস্থা হবে।

কোণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার উপর, মুখে হাত চাপা দেয় : সর্বনাশ করিস না গুণিয়া! ডাক্তার-সাহেবের উপর ধুবান ছুড়িস না!

হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় কোণ্ডাকে সরিয়ে দিল লোকটা। ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাতের আঙুলগুলো মটকালো, বলল : মোটিয়ারী হয়ে যাবি! আস্‌কালোনে পড়ে থাকবি মাসের পর মাস! ভেড়ী হয়ে যাবি তুই।

ডাক্তারবাবু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন লোকটাকে।

নারানপুরে ডাক্তারবাবুর মোবাইল ডিসপেন্সারির ব্যবস্থা। সেখানে হাসপাতাল নেই। তবু ওঁর আউট-ডোরে খান দুই খাটিয়া পেতে নিজ দায়িত্বে দুটি এমাজেসি-বেডের

ব্যবস্থা রেখেছেন উনি। সে দুটি নাকি ভর্তি ছিল। চয়নকে নিয়ে এসে তুললেন নিজের তাঁবুতে। কিন্তু চয়ন কিছুতেই রাজী হল না। জঙ্গল কেটে এনে পরদিনই একটা ছাপরা মতো বানিয়ে ফেলল মছয়া গাছতলায়। কাঠের একটা আলপান্জি (মাচাঙ) বানিয়ে নিল। ভাব জমিয়ে ফেলল ডাক্তারসাহেবের আলসেশিয়ানটার সঙ্গে। পাগলামির বিশেষ কোন লক্ষণ প্রথমটা নজরে পড়েনি, শুধু তীব্র একটা অনীহা জগতের সব কিছুর উপর। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কারও সঙ্গে কোন বন্ধন স্বীকার করে না। আপন-মনে বসে থাকে তার পাতায়-ছাওয়া ঘরে, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল। ডাক্তারবাবু নিজে যা খেতেন তাই খেতে দেওয়া হত ওকে। লোকজনের সামনে সে কিছু খেত না। ডাক্তারবাবুর মেডিক্যাল-ভ্যানের ক্লিনার ছোকরাও মুরিয়া — খাবারটা সেই দিয়ে আসত ওর ছাপরায়। তার সঙ্গেও কোন দিন কথা বলেনি চয়ন; তবে খাবারটা খেত। বোঝা যায়, খুব তৃপ্তি পায় না খেয়ে। খায় যতটা, ছড়ায় তার চেয়ে বেশি। পাগলের খাওয়ার ধরন আর কি। প্রতিদিনই ওদের গ্রাম থেকে কেউ না কেউ আসত ওর সঙ্গে দেখা করতে। ওর বাপ কোণ্ডা, গাঁয়ের গাইতা গাদরু, বন্ধু কোতোয়ার, ওর কাকা—চয়নের মাও আসত মাঝে মাঝে ছোট একটি ভাইকে কোলে নিয়ে। চয়ন খুশি হয় না তাদের দেখে। ওরা এলেই সে উঠে গিয়ে মুখ লুকাতো তার ছাপরার ভিতর। কাবোঙ্গা গাঁয়ের চেলিক-মোটিয়ারীর দলও মাঝে মাঝে আসত তাদের প্রাক্তন শিরদারের সংবাদ নিতে। চয়ন তখন একেবারে শমুক-বৃদ্ধি অবলম্বন করত — চুপচাপ বসে থাকত ঘরের ভিতর, দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বক্তব্যের চেয়ে বক্তাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। গভীর রাত। বাইরে একটানা টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টির শব্দ। লঠনের ভুতুড়ে ছায়া তাঁবুর চন্দ্রাতপে! ডাক্তারবাবু খাটিয়ার উপর বসে গল্প বলছেন। বুকের তলায় বালিশ গোঁজা। গল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ! মামুলী একটা রোগীর চিকিৎসার গল্প। অখ্যাত এক অরণ্যপল্লীর অজ্ঞাত এক যুবকের মস্তিষ্ক-বিকৃতির কাহিনী। কিন্তু বক্তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকার গহন অরণ্যে স্বর্ণখনির সন্ধানে ফেরার গল্প বলছেন উনি।

বললুম, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সে সময় আপনার কী ধারণা হয়েছিল? হঠাৎ কেন পাগল হয়ে গেল ছেলেটা?

—ওর ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল, সে যেন কোন অপরাধবোধে ভারাক্রান্ত। গিল্ট-কন্‌শাসের মতো সে তার মুখখানা লুকাতে চায় শুধু। তাই সে পাগলামির চাদর মুড়ি দিয়ে দুনিয়ার একান্তে আত্মগোপন করতে চায়। দুনিয়াকে সে উপেক্ষা করতে চায়, অস্বীকার করতে চায়, পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে উন্মুখ—নির্বাক উদাসীনতায়। তাই সকলকে বারণ করে দিলাম। কারও আসার দরকার নেই। ওর পরিচিত কেউ যেন ওর কাছে না যায়। থাকুক ও আপন মনে। দেখি তার ফলাফলটা। ক্রমশ কাজের চাপে ওর কথা ভুলেই গেলাম আমি। চয়ন সুখেই আছে, অন্তত স্বচ্ছন্দে আছে। যে কোন কারণই হোক নির্জনতাটাকেই ওর পছন্দ। দিনসাতেক পরে আবার একদিন চেষ্টা করলাম ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু না,

চয়ন আর কোন সাড়াশব্দ দিল না। স্থির করলাম ওকে কোনভাবে বিরক্ত করব না। ও যা চায় তা অনুমান করে সরবরাহ করতে হবে। রোগীর মনটা প্রফুল্ল রাখার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। চয়ন যে-কোন কারণেই হোক সবচেয়ে বেশি করে চাইছে নির্ভরনতাকে — তাই ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম। ওকে যে নজরে রেখেছি তাও যেন বুঝতে না পারে।

ইচ্ছা ডাক্তারবাবু আমাকে বলেন, একটা মজার কথা শুনবেন? চয়ন শর্মিলাকে একেবারেই সইতে পারে না। শর্মিলাকে দেখলেই সে ক্ষেপে যায়। তার পাগলামির মাত্রাটা বেড়ে যায়! কারণটা আন্দাজ করতে পারেন?

আমি বললুম, পারি। শর্মিলাদেবী মেয়েমানুষ বলে। মেয়েমানুষ জাতটার উপরেই ও ক্ষেপে গিয়েছিল।

—শুধু তাই নয়। আরও একটা কারণ ছিল—

—জানি! শর্মিলাদেবীর গায়ের রঙ কালো নয় বলে!

ডাক্তারবাবু রীতিমতো অবাক হয়ে যান। বলেন, আশ্চর্য! আপনি কেমন করে এটা আন্দাজ করলেন?

আমি হেসে বলি, ডাক্তার-সাহেব, আপনি যদিও বলেননি, তবু আমি আন্দাজ করেছি চয়ন আয়েতুর বাড়ি লামহাদা খাটতে গিয়েছিল ছোটবোনের জন্যে নয় — রঙিনা-বেলোসার পাণিপ্রার্থী হয়ে। মুরিয়ার ঘরে রঙিনা এক আশ্চর্য বিষয়। রঙিনাই ওকে পাগল করেছে। আর সেই রঙিনা সাধারণ মুরিয়া মেয়ের মতো কালো নয়, সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রঙিনা আগুন-বরন ফর্সা মেয়ে।

বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়ে ডাক্তার পিল্লাই বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আগুন-বরন...কিন্তু, কিন্তু আপনি তা কেমন করে জানলেন! ট্রাম্প কার্ডটাতো এখনও আমি এক্সপোজ করিনি!

আমি হেসে বললুম, তাস খেলার ঐ তো মজা! লুকোবার চেষ্টা করলেও হার্টসের দাবিকে আমি আপনার হাতে ঠিকই প্লেস করেছি!

ডাক্তারবাবু বলেন, সারেডার করলুম। বলুন এবার, কেমন করে আন্দাজ করলেন সেটা?

—আন্দাজ নয়। রঙিনাকে আমি দেখেছি।

—দেখেছেন? কোথায়? কেমন করে?

বললুম, কারাংমেটার দল যেদিন কাবোঙ্গায় আসে সে রাত্রে আমিও ছিলাম কাবোঙ্গা মাঠে।

কোথাও কিছু নেই ডাক্তার-সাহেব লাফ দিয়ে পড়েন আমার খাটিয়ার উপর। সামান্য হাত দুটি ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলেন, ছিলেন! ছিলেন! হাউ স্টেঞ্জ! আপনি সে রাত্রে ছিলেন কাবোঙ্গায়! বলুন তাহলে কী দেখেছিলেন—সব গুণানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করুন।

আমি তো হতভম্ব!

ডাক্তার-সাহেব এমনভাবে চোঁচিয়ে উঠেছিলেন যে, পাশের ঘরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শর্মিলা দেবীর। তিনিও দ্বারপ্রান্তে উঠে এসেছেন লণ্ঠন হাতে, কী হয়েছে?

ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু, কিছু হয়নি। ডোট বি সিলি! যাও শোও গে যাও।

আমি মরমে মরে গেলাম এ কথায়। মিসেস্ পিল্লাইয়ের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পরিচয় হয়েছে। ডাক্তার পিল্লাইয়ের মতো শিক্ষিত সজ্জন যে আমার মতো অর্ধপরিচিতের সামনে মধ্যরাত্রিতে এভাবে স্ত্রীকে ধমক দিতে পারেন তা ছিল আমার স্বপ্নেরও আগেচর। অপ্রস্তুতের একশেষ। মিসেস পিল্লাই নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। পিল্লাই-সাহেব আবার আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, কই কী দেখেছিলেন বলুন?

ভাবলাম — পাগল কে? চয়ন, আমি না ডাক্তার পিল্লাই?

গল্প শোনা মাথায় উঠল। গল্প বলে চলি এরপর। কাবোদ্দায় পৌঁছানো থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত। জিপের হেড-লাইটে সাবুগাছতলায় চয়নের নিঃসঙ্গ মূর্তি পর্যন্ত। নারানপুরের ঘটনাটা আর বললাম না। সেটা চয়নের কাহিনীতে অপ্রাসঙ্গিক। সেটা বেলোসার উপাখ্যান। তাই বলিনি।

আজ বুঝতে পারি, বেলোসার কাহিনীটা অনুল্লেখ করার পিছনে আমার নিজের একটা অপরাধবোধ ছিল। গুপ্তেজীর কাছে ধমক খেয়ে বুঝেছি সেদিন ওভাবে মোহনকে ছেড়ে দেওয়া আমার অন্যায় হয়েছিল। সেই, ভীকতার লজ্জা গোপন করতে ও-কাহিনী উহ্য রেখেছিলাম ডাক্তার সাহেবের কাছে। সেদিন যদি রঙিলার উপাখ্যান ডাক্তারবাবুকে বলে ফেলতে পারতাম, আজ বুঝতে পারি, তাহলে এ গল্প হয়তো অন্য খাতে বইত।

ডাক্তারবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ধরেছি ঠিকই। এনি পোর্ট ইন দ্য স্টর্ম। ঝড়ের মুখে জাহাজের অবস্থা। নির্দিষ্ট বন্দরে যদি পৌঁছাতে না পার, নোঙর গাড়।

যেন একটা মহা আবিষ্কার করেছেন। হা হা করে হাসলেন খানিক। এ মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারিনি। বললাম, তারপর?

ডাক্তার-সাহেবের মেজাজ তখন খুশ। বললেন, তারপর? তারপর ‘কুকুসনা পোহার।’

—অস্যার্থ?

—অস্যার্থ কোঁকর কোঁ, ভেলরে বিহান। ঐ শুনুন মোরগ ডাকছে! রাত শেষ।



॥ দশ ॥

সকাল সাতটার মধ্যেই এসে পড়লেন মৌলানা সাহেব : একি আপনি এখনও তৈরি হয়ে নেননি ?

সবিনয়ে নিবেদন করি, আজ্ঞে না। এ-যাত্রায় আমি আর পারলকোট যাচ্ছি না। আপনি ফেরার পথে আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন।

—রাত্রের মধ্যেই মত বদলালেন যে ?

—যা বৃষ্টি হয়েছে, তাতে আপনিও যে পারলকোট পৌঁছতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে আমার ; কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। কালরাত্রে একটা গল্প আধখানা শুনেছি, বাকিটা না শুনে পাদমেকং ন গচ্ছামি।

—বুঝেছি। হাসলেন মৌলানা ; — বেশ সেই কথাই রইল। আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব। দেখবেন, একাধিক সহস্র রজনীর গল্প না-হয় শেষ পর্যন্ত।

মৌলানাকে বিদায় করে আমরা এসে বসলাম। প্রাতরাশের পর বলি, কই মশাই, আপনার গল্পের শেষটুকু বলুন।

ডাক্তার-সাহেব বলেন, শেষটুকুতো বলতে পারব না। তবে আরও কয়েকটি চ্যাপটার শোনাতে পারি।

—শেষটা শুনব কবে ?

—মহাকাল যেদিন লিখবেন শেষ চ্যাপটার। চয়ন এখনও আমার হেপাজতেই আছে। এখনও সে ভাল হয়ে ওঠেনি।

—বেশ তাহলে যতটা মহাকাল লিখেছেন, ততটাই বলুন।

—তারও সবটা শোনাতে পারব না। এতো আপনাদের সাপ্তাহিক, মাসিকে প্রকাশিত ধারাবাহিক গল্প নয়। এর উপাদান আমাকে রীতিমত খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়েছে। একবার ছুটেছি কাবোঙ্গা, একবার ছুটেছি কারাংমেটা। এর জবানীতে, ওর জবানীতে শুনেছি এক-একটা খণ্ড কাহিনী। জোড়াতালি দিয়ে গোটা গল্পটা কেমনভাবে খাড়া করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমার কাছে সংবাদগুলো যেমনভাবে এসেছিল সেই কালানুক্রমিকভাবেই বলে যাই ?

দিনকয়েক পরের কথা। দুপুরবেলা হাতে কাজ ছিল না। বসে, বসে একটা গল্পের বই পড়ছি। হঠাৎ চাকরটা ছুটে এল—সর্বনাশ হয়েছে। চয়নের ঘরে কে একটা মেয়ে ঊকি দিচ্ছিল, চয়ন তাকে এমন ধাক্কা মেরেছে যে মেয়েটি উল্টে পড়ে গেছে। মাথাটা কেটে গেছে তার। রক্তারক্তি কাণ্ড।

ছুটে গেলাম চয়নের ছাপরায়। কম্পাউন্ডারটাও নেই। দুপুরবেলা। জনমানব নেই গারে কাছে। ওর ঘরের সামনে গাছতলায় মুখ-থুবড়ে পড়ে আছে মেয়েটি। মাথার পিছনের দিকে আঘাত লেগেছে। তখনও জ্ঞান ফেরেনি। চাকরটি একটা জলের ঘটি নিয়ে এসেছিল। মুখে বার দুই ঝাপটা দিতেই উঠে বসল। সামলে উঠল অল্পক্ষণেই।

বছর সতেরো-আঠারো বয়স। মুরিয়া ঘরের মেয়ে। নিটোল স্বাস্থ্য, শান্ত মুখশ্রী — বেশ একটু বিষন্ন। বিহ্বলভাবে চারিদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজল। তারপর নিশ্চিত হয়ে বসল একটা গাছে ঠেস্ দিয়ে। তাকে চাকরটার জিন্মায় রেখে চয়নের ঘরে

গেলায়। গুম মেরে বসে আছে এক কোণায়। আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, ওকে মেরেছ কেন?

কোন জবাব নেই।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। ওর কাঁধ দুটি ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, তোমার পাগল সেজে থাকা বার করেছি আমি! কেন মেরেছিস ওকে, বল! উত্তর দে!

চয়ন উঠে দাঁড়াল। ঘোলাটে চোখ দুটো হঠাৎ ধ্বক করে জ্বলে উঠল। বললে, ছেড়ে দে!

গলার স্বর চড়িয়ে বললুম, না! কেন মেরেছিস ওকে বল!

ও চটে উঠে বললে, বেশ করেছি, মেরেছি!

আমার মাথার মধ্যে যেন দাবানল জ্বলে উঠল। ঠাস করে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলাম ওর গালে, বদমায়েশ, শয়তান কোথাকার! খুন করে ফেললি মেয়েটাকে।

রাগের মাথার চড়টা মেরেই বুঝলাম ভুল করেছি। চয়ন আমার চেয়ে শক্তিশালী। হয়তো ও সত্যিই পাগল। আমাকে যদি এ নির্জন ঘরে ও আক্রমণ করে বসে তাহলে সর্বনাশ! কিন্তু সে-সব কিছুই করল না! চড়টা খেয়ে কেমন যেন সম্বিত ফিরে এল তার, বোকার মতো বললে, খুন! কে খুন হয়েছে? মাল্কো?

মেয়েটির পরিচয় পেলাম ওর প্রশ্নের ভিতর থেকে। এই তাহলে আয়েতু গোণ্ডের মেয়ে মাল্কো? কিন্তু আমি কোন জবাব দেবার আগেই আমাকে ও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। আমি উল্টে পড়লাম। নক্ষত্রবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছিল, তবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়লাম। হাতের কাছে পড়েছিল চয়নের কুঠারখানা! তুলে নিলাম ক্ষিপ্ৰগতিতে। চয়ন ক্ষেপে গেছে। ঘরের বাইরেই রয়েছে মাল্কো—তখনও দুর্বল! তাকে আক্রমণ করতেই গেল বোধহয়। প্রচণ্ড ভুল করেছি ওকে এভাবে মেরে বসায়। পাগলটা এখন কী করবে কে জানে! ওর পাগলামি প্রতিহত করতে গিয়ে কুঠারটাকে যে কোনমতেই ব্যবহার করা যাবে না—তাতে যে একটা বীভৎস রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে সেকথাও তখন খেয়াল ছিল না আমার। শুধু প্রাণধর্মের তাগিদে কাজ। কুঠারটা হাতে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে এলাম ওর পিছনে পিছনে।

বাইরে এসে দেখি চয়ন উপুড় হয়ে পড়েছে মাল্কোর বুকের উপর। চাকরটা বাধা দেবার চেষ্টা করছে বৃথাই। না ভয় নেই কিছু; চয়ন ওকে আক্রমণ করেনি। এ শুধু অনুশোচনার আবেগে উচ্ছ্বসিত বিলাপ।

চাকরটা লোকজন ডাকতে ছুটছিল বোধহয়। বাধা দিলাম তাকে। চয়নের বাহুমূল ধরে বললাম, ওকে ছেড়ে দাও চয়ন। ওর মাথায় আঘাত লেগেছে। ওকে বিশ্রাম নিতে দাও!

চয়ন স্থির হল। ছেড়ে দিল ভুলুঠিতা মেয়েটিকে। দ্রুতপদে উঠে গেল ঘরে। তারপর উবুড় হয়ে পড়ল ভূশয্যায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেমানুষের মতো।

মাল্কোকে নিয়ে এলাম আমার তাঁবুতে।

একটু ব্র্যান্ডি মেশানো গরম দুধ খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলো মেয়েটি। ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে। রহস্যের যখন কোন কিনারাই করতে পারছিলাম না, তখন নূতন একটা আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল মাল্কোর জবানবন্দিতে।

আদিবাসীদের মধ্যে চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেছি, সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, রোগীর কী কষ্ট, তা ওরা ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারে না। আর সবচেয়ে সুবিধা এই যে, লজ্জায়-সঙ্কোচে কোন কথা ওরা গোপন করে না। সভ্যজগতের মানুষ যেটা লজ্জাজনক মনে করে, সেই তথাকথিত গোপন কথাও ওরা অকপটে বলতে দ্বিধা করে না। মাল্কো তার পূর্বরাগের যে বিবৃতি দিল, তাতে রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এল। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, অমন স্বীকারোক্তি কোন শিক্ষিতা আধুনিকমনা অনুচার কাছে আমি আশা করি না।

মাল্কো হচ্ছে কারাংমেটা গাঁয়ের গাই তা আয়েতু গোণ্ডের ছোট মেয়ে। কারাংমেটা ঘটুলের মাল্কো। ঘটুলে সে এসেছিল মাত্র ছয় বছর বয়সে। রঙিলার হাত ধরে। রঙিলা তখনও বেলোসা হয়নি। ঘটুলের প্রত্যেকটি কোনা তার অতি পরিচিত, গাঁয়ের সবকয়টি চেলিক-মোটয়ারীকেই সে খুব ভালভাবে জানে। ওর সতের বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের অধিকাংশ সন্ধ্যাই কেটেছে এই ঘটুল-ঘরে। সবাই ভালবাসতো মাল্কোকে তার মিষ্টি লাজুক স্বভাবের জন্যে। আর মাল্কো সবচেয়ে ভালবাসতো তার দিদি রঙিলাকে। রঙিলার চেয়ে সে বছরতিনেকের ছোট। তাই দু'বোনের সম্পর্কটা প্রায় সখীত্বের পর্যায়ে পড়ে। তবে রঙিলার সাংসারিক জ্ঞান খুব বেশী, চালাক-চতুর সে — মাল্কো সরলা। দিদির কাছেই মাল্কো নিয়েছে জীবনের প্রথম পাঠ। মনের মধ্যে যখন যা প্রশ্ন জেগেছে তার সমাধান জানতে ছুটে গেছে দিদির কাছে। রঙিলার চোখের তারা নীল আর গায়ের রঙ সুচিক্ণ নিকষ কালো নয় বলে কেউ যদি তাকে ঠাট্টা করত, বিদ্রূপ করত, অমনি ফোঁস করে রুখে দাঁড়াতো মাল্কো। কারাংমেটা ঘটুলের সবাই ওদের দুজনকে তখন ঠাট্টা করে বলত মানিক-জোড়। রঙিলা যদি বনের মধ্যে খুঁজে পেত একটি কন্দ-মূল তাহলে সেটা নিয়ে এসে দিত মাল্কোর হাতে। মাল্কো তাতে এক-কামড় খেয়ে আধখানা আবার ফিরিয়ে দিত দিদিকেই। মাল্কো যদি খুঁজে পেত নারান্ধীর ধারে নতুন ধরনের ঘষা-পাথর — তাহলে এক কোঁচড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে এনে তার অর্ধেক দিয়ে দিত রঙিলাকে। দিদির সঙ্গে তার প্রথম বিবাদ বাধল এই দান-প্রতিদান নিয়েই। কতই বা তখন বয়স ওদের? মাল্কো দশের কোঠায় — রঙিলা ত্রয়োদশী! পর পর দু-রাত্রে দুটি কাঁকুই পেয়ে সে দিদির কাছে ছুটে এল। দিদি! একটা তুই নে।

কোথাও কিছু নেই, ঠাস করে এক চড় মেড়ে বসল রঙিলা। কাঁকুইয়ের মূল্য বুঝবার বয়স তখন হয়েছে রঙিলার। ততদিনে সে বেলোসা হয়েছে। অভিমানী মাল্কো গিয়ে লাগালো মায়ের কাছে। আখালী শুনে হাসল না। গভীর হয়ে গেল। সে জানতো, সুন্দর রঙ নেই বলে, অর্থাৎ সুচিক্ণ কৃষ্ণবর্ণ নয় বলে, বেলোসাকে কারও নজরে ধরে না। বেলোসার একখানিও কাঁকুই জোটেনি তখনও।

সেদিন থেকে মাল্কো সামলে নিল নিজেকে। সব কথা সেও বুঝতে পারেনি

সে বয়সে, কিন্তু নারীর সহজাত প্রবৃত্তি থেকে এটুকু বুঝল যে, কোথায় কী যেন একটা ঘটেছে। রঙিলার রূপহীনতার প্রতি চেলিকের দল উদাসীন — টকটকে সাদা রঙ, নীল চোখ, পিঙ্গল কোঁকড়ানো চুল দেখে ওরা সরে যায় — কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাটা যেন রঙিলার রক্তে। তাই সঙ্গী না জুটলেও অল্প বয়সে সে হয়ে উঠলো ঘটুলের বেলোসা। যতই পদোন্নতি হতে থাকে রঙিলার, যতই দু-বোনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে যৌবনরাজ্যের তোরণ-দ্বারের দিকে, ততই দু-বোনের মিতালীটা হয়ে আসে ক্ষীণ — সম্পর্কটা হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বীর। শেষ পর্যন্ত ঐ নীলনয়না পিঙ্গলকেশা মেয়েটিকে রীতিমত ভয় করতে লাগলো মাল্কো। শুধু মাল্কো নয়, মনে মনে সবাই তাকে ভয় করে। শুধু গ্রামের গাইতার প্রতাপে কথাটা প্রকাশ্য রূপ নেয়নি। নাহলে সকলেই মনে মনে জানে, রঙিলা অপার্থিব ক্ষমতার অধিকারী — অনেক মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুক জানে সে। কে জানে, হয়তো সে ডাইনীই! পাংনাহিন! মাল্কো লক্ষ্য করেছে, দিনে দিনে ওর দিদির স্বভাব যাচ্ছে বদলে। ক্রমশ রুম্ব বদ্মেজাজী হয়ে উঠছে যেন। আখালীও তাকে শাসন করতে সাহস পায় না। কথায় কথায় রঙিলা ছোট বোনের ক্রটি ধরে। কঠিন শাস্তি দেয়। শুধু দিদি হিসাবে নয়, ঘটুলের বেলোসা হিসাবে। সে আদেশ অমোঘ। মাল্কোর নিকট-বান্ধবীরা সহানুভূতি জানায়, কিন্তু বেলোসার আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা নেই কারও। মাল্কো শাস্তি ভোগ করে আর ওরা নেচে চলে ‘রেলো রেলো’ নাচ! দিদি যে কেন এমন বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে তাকে দেখতে শুরু করেছে তা এতদিনে অনুমান করতে পারছে মাল্কো — সেও বড় হয়ে উঠেছে।

একদিন সবাই দেখল রঙিলার মাথায় উঠেছে একটা নতুন কাঠের চিরুণী! ঘাম দিয়ে স্বর ছাড়লো মাল্কোর। যাক, তাহলে দিদির একটা হিল্লো হল। শুধু মাল্কো নয়, সকলেরই কৌতূহল হল জানতে, কে দিয়েছে ওটা। বেলোসাকে এ প্রশ্নটা করতে কারও সাহসে কুলালো না। কুলাবে না জানতো রঙিলা, আর তাই সে সাহস করে পরেছিল সেটা। জাতে উঠবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অপর সম্ভাবনাটা সে ভেবে দেখেনি। ওরা বেলোসার সামনে আসার সাহস করতে না পারলেও পিছনে মিলিত হয়েছিল। সব কটি চেলিক যখন টাঙি স্পর্শ করে লিঙ্গোপেনের নামে শপথ নিয়ে বলল যে, কেউ-ই সেটা দেয়নি বেলোসাকে, তখন রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল জনান্তিকে! গোপন হাসির বন্যা বয়ে গেল সেদিন রঙিলার অনুপস্থিতিতে! সে হাসি রঙিলা শুনতে পায়নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েটি আন্দাজ করল ঠিক। লজ্জায়, অনুশোচনায় সে ফেলে দিয়ে এল নিজে-হাতে বানানো কাঁকুইটা নারঙ্গীর জলে।

বেলোসার প্রতাপ তা বলে ক্ষুণ্ণ হল না একতিল। সবাইকে সে হুকুম করে, চালায়। কে কার সাথে শোবে, তা সেই ঠিক করে দেয়। কোতোয়ার শুধু সায় দিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। কোন মেয়ে ঘটুলে আসতে দেরি করলে, অপরিষ্কার থাকলে, ঘটুলের রীতিনীতি না মানলে কঠোর শাস্তি দেয় সে। সবাই তাকে ভয় করে চলে।

কিন্তু রঙিলা বুঝতে শিখেছে — জীবনে এমন কিছু আছে, যা ঠিক হুকুম দিয়ে পাওয়া যায় না। ঘটুলে সকলেরই সমান অধিকার; কিন্তু অধিকার তোমাকে কতটুকু

দেয় ? এমন জিনিস আছে দুনিয়ায়, যা দাবি করে আদায় করে চলে না — যা স্বতঃস্ফূর্ত। রঙিলা সব পেয়েছে, পায়নি শুধু ঐ স্বতঃস্ফূর্ত জিনিসটা। রঙিলা দেখেছে, চেলিক-মোট্যারীর দল তাকে দেখলেই কেমন যেন সংযত হয়ে ওঠে। উদ্দাম হাসির উৎস উষর হয়ে যায় সে ঘট্টলে এলেই ! রঙিলা দু'চোখ মেলে দেখেছে মোটিয়ারীদের বাহুবন্ধনে বেঁধে চেলিকের দল কেমন করে মাতোয়ারা হয়ে যায়। সে অভিজ্ঞতাটা ওর হয়নি। ও আসার আগে তারা ফিসফিস করে কথা বলে, অগ্নীল হাসি-মস্করা করে, মুখ লুকিয়ে হাসে—অথচ আশ্চর্য, রঙিলা এসে পড়লেই সবাই সংযত হয়ে যায়। এমনকি শিরদার পর্যন্ত তাকে সমীহ করে চলে। ঘট্টলের নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করে না ; যেদিন যার মাসানিতে বেলোসার আসন নির্দিষ্ট হয়, সেদিন সেই তাকে নিয়ে শোয় ; আপত্তি করে না। আলগোছে একটা হাতও ফেলে রাখে ওর পিঠে, আর বোধহয় ভাবে, ভাবে রঙিলা, কখন ভোর হবে রাত।

আরও লক্ষ্য করল রঙিলা, ওর ছোট বোন মাল্কো যদিও সাধারণ মোটিয়ারী, তবু তাকেই শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পাওয়ার লোভে সব ক'টা চেলিকের চোখের তারা যেন নাচতে থাকে। কোতোয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে বেলোসাই তিন দিন অন্তর স্থির করে মাল্কো কার সাথে জোড় বাঁধবে। শিরদার হয়তো বলে, জান্‌কি তাহলে আজ শুচ্ছে আখার সাথে, দুলোসা কোতোয়ারের সঙ্গে, আর মাল্কো ? মাল্কো কার মাসানিতে শোবে ?

রঙিলা লক্ষ্য করে, সব কয়টি চেলিকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এমনকি স্বয়ং শিরদারের চোখেও ফুটে উঠেছে একটা মুগ্ধ-লোলুপতা।

কোতোয়ার হয়তো বলে, মাল্কোর কথা ঠিক করিনি—ও নিজেই বেছে নিক।

বাকি সব ক'টা চেলিক একসাথে চেষ্টা করে ওঠে, মাল্কো, আমি ! আমি !

মাল্কো লাজনশ্র মুখটা আর তুলতে পারে না। বুকটা টিপটিপ করে।

রঙিলা গম্ভীর হয়ে বলে, না মাল্কোর আজ শরীর খারাপ — ও বাড়ি যাবে।

শিরদার বলে কেন ? আস্‌কালোন্ ?

রঙিলা ধমক দিয়ে ওঠে, সে খোঁজে তোমার কী দরকার ?

শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও মাল্কো নিঃশব্দে বাড়িতেই ফিরে যায়।

কোতোয়ার বলে, আর তুমি ? বেলোসা ? আমাদের রানী কোথায় শোবে ?

রঙিলা চোখ তুলে তাকায়, দেখে সবকটা চেলিক অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যেন এ-আপদ না ঘাড়ে চড়ে বসে। শিরদারও মাথা নিচু করে মাটিতে কী একটা খুঁজছে।

চোখ দুটো স্থালা করে ওঠে রঙিলার। চায় না, কেউ চায় না তাকে। কেন ? তার গায়ের রঙ আর পাঁচটা মোটিয়ারীর মতো নিকষ কালো নয় বলে ? সে কি সত্যিই ডাইনী ?

রঙিলা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, আমার শরীরটা খারাপ — আমিও আজ বাড়ি গিয়েই শোব।

এমনিভাবেই চলছিল নগণ্য কারাংমেটা গাঁয়ের ঘট্টলের জীবনযাত্রা।

ডাক্তারবাবু বলেন, নাটকটা মোড় ফিরল গত বছর, ওরা দল বেঁধে যখন গেল কাবোঙ্গায় — নারানপুর মেলায় যাওয়ার পথে সেখানে কী ঘটেছিল, আপনি তার প্রত্যক্ষদর্শী, সুতরাং সে সব কথা বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু মাল্কোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কয়েকটা কথা বলতে হবে, যা নাকি আপনার অজানা। মাল্কো তার জবানবন্দিতে সে-কথা স্বীকার করেছিল অকপটে।

কাবোঙ্গা ঘটুলের ছেলেমেয়েদের পরিচয় দিতে উঠে দাঁড়াবার আগেই চয়নকে চিনতে পেরেছিল মাল্কো। চিনতে পেরেছিল স্থানীয় দলের শিরদার বলে। এমন ছেলে ঘটুলে থাকতে আর কারও পক্ষে শিরদার হওয়া সম্ভব নয়। এমন রূপ আগে মাল্কো কখনও কোন চলিকের দেখেনি। নিজের গাঁয়ের তো নয়ই, এমনকি নারানপুর কিম্বা কোকামেটার মাড়াইতে — যেখানে দশ-বিশ গাঁয়ের শত শত চলিক জমায়েত হয়, সেখানেও নয়। লিঙ্গোপেনের গল্প শোনা ছিল। লোকগাথা বলে, লিঙ্গোপেনকে যে দেখেছে, সেই ভালবেসেছে। এমনকি, দেবী তাল্লুই-মুটাই পর্যন্ত একসময়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন দেব লিঙ্গোপেনের রূপে। মাল্কো মনে মনে ছবি আঁকতো — কী রকম দেখতে ছিলেন তিনি? সারা দুনিয়ার যত মোটিয়ারী যাঁকে দেখবামাত্র গীর্দা আতোরের ছালা অনুভব করে? আজ এই ছেলেটিকে দেখে সে কৌতূহল চরিতার্থ হল যেন।

আচমকা রঙিলা যখন তাকে ঠেলে দিলে আর চয়ন লুফে নিল তাকে, তখন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল মাল্কো। ওর বুকে ক্ষণিক আশ্রয় নেবার অনুভূতিটা আজও সে ভুলতে পারেনি। চয়ন প্রশ্ন করেছিল, লাগলো নাকি?

মাল্কোর সারা শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে।

রঙিলার প্রগলভতা তার সহ্য হয়নি। ও বুঝতে পেরেছিল ঐ দরাজ-বুক মানুষটার লেহে যত শক্তিই থাক খরজিহু রঙিলার তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রতিহত করবার ক্ষমতা তার নেই। আর সেজন্যই মনে মনে ফুঁসছিল সে।

কথা ছিল কারাংমেটার দল প্রথম নাচবে ‘বান্দা রোলা পুঙ্গার ও আয়া।’ এই নাচ প্রথম নাচা হবে বলে দিনের পর দিন ওরা মহড়া দিয়ে এসেছিল যাত্রার আগে। ভারি মিষ্টি সে গান। পুষ্প আহরণের গান —

দিঘি-কালো জলে কমল ফুটেছে ঐ!

দেব চূলে ফুল তুলে আন ওলো সই।

কিন্তু রঙিলা সমস্ত পূর্বনির্দেশ অগ্রাহ্য করে হঠাৎ ধরে বসল নতুন গানের ধূয়ো : ‘বাদাং সারপাঠে উদিতন সায়দার!’

শুধু মাল্কো নয় দলের সবাই বুঝতে পেরেছিল রঙিলার নেশা হয়েছে। পর পর কয়েক পাত্র মধুক-রস পান করেই সে মাতাল হয়নি। সে যেন আরও কিসের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। ঐ পাথরে-কোঁদা কবাটবক্ষ মানুষটিকে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করবার নিষ্ঠুর খেলায় যে যেন মেতে উঠেছে। লড়াইটা যেন কাবোঙ্গা আর কারাংমেটার নয়, চয়ন আর রঙিলার। মাল্কোর মনে হল রঙিলার বঞ্চিত নারীত্ব যেন পৌরুষের প্রতীক ঐ ছেলেটির উপর প্রতিশোধ নিতেই উদগ্র হয়ে উঠেছে আজ। তাই মহড়ার সব নির্দেশ ধূলিসাৎ করে সে গেয়ে উঠল ব্যঙ্গের গান, আঘাত

করার গান।

তবু সে সহ্য করেছিল বেলোসার এ অত্যাচার। ভিনগাঁয়ের সামনে কেউই আপত্তি করেনি। নেচেছিল অনভ্যস্ত নাচ বেলোসার খেয়ালখুশীর মূল্য মেটাতে। কিন্তু এ অপরাধ কতবার সহ্য করা যায়? কাবোঙ্গার দল যখন গাইল বর্ষা-মঙ্গল, তখনও বেলোসা নির্ধারিত কর্মসূচী মেনে চলেনি। হঠাৎ শুরু করল আবার এক নতুন গান ‘ও হো মায়না হো লালসাই, ব্যয়ঠো ডাঙা হো!’ এবার আর সহ্য হয়নি মাল্কোর। চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এর আগে বছরসে গিয়েছে ঐ গান, নেচেছে ঐ নাচ। পরিচিত-অপরিচিত চেলিকদের সুরের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে — উঁহু ডাকু হো রাজা লালসাই।’ কিন্তু সে গান ছিল নেহাৎ গান, চৈতদাঙার উৎসবের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত। তার আভিধানিক অর্থ হয়তো একটা ছিল, কিন্তু তার কোন বিশেষ অর্থ নেই। আজ কিন্তু ঐ কথাগুলি সত্যি সত্যিই সে বলতে চাইছে। মাল্কোর অন্তরাত্মা ঐ চেলিকদের বিশেষ একজনকে সত্যিই বলতে চায় ‘ওঠো রাজপুত্র, নিষ্ঠুর লুটেরার মতো লুট করে নাও আমার জীবন-যৌবন।’ আজ তাই সে পারলে না নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতার ঐ কথাকয়টা গানে গানে উচ্চারণ করতে। নিঃশব্দে পালিয়ে এল নাচের মাঝখানেই। বেরিয়ে গেল বাইরে, তারায় ভরা অন্ধকারের আশ্রয়ে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি রঙিলার নজরকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেনি। কারাংমেটার বেলোসা সে — সবদিকেই তার কড়া দৃষ্টি। নাচ সমে ফিরে এলে রঙিল ও বেরিয়ে এল বাইরে। কোথায় গেল দুর্বিনীত মেয়েটা, খুঁজে বার করতে হবে। বেশী গুঁজতে হল না অবশ্য। শুক্লা অষ্টমীর জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল ঘটুলের অদূরে তাল্লুর-মুটাই মন্দির-সংলগ্ন গাছতলায় একা বসে আছে মাল্কো। রঙিলা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। আন্দাজ করলে ব্যাপারটা। ডাকলে, মাল্কো, উঠে আয়!

মাল্কোকে যেন ভূতে পেয়েছে। যে রঙিলাকে সে বাঘিনীর মতো ভয় করে তাকে মুখের উপর বললে, না, যাব না।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রঙিলা : ও ! তাই বল ! গীর্দা আতোর ! পীরিত।

ধম্কে উঠল মাল্কো, চুপ কর্ ! লজ্জা করে না তোর !

রঙিলা তখনও হাসছে, গীর্দা আতোর হয়েছে তোর, আর লজ্জা পাব আমি ?

মাল্কো বললে, ডাইনি !

একটা সাধারণ গালাগাল ! কথার মাত্রা। কিন্তু রঙিলার কাছে ঐ কথাটির একটা বিশেষ অর্থ আছে। এ গাল এর আগে কেউ তাকে দেয়নি। এর চেয়ে অশ্লীলতর গাল দিয়েছে। যা নাকি অল্লানবদনে ওরা বলে সর্বসমক্ষে, অথচ যা ছাপার হরফে লেখা বে-আইনি ! কিন্তু কেউ কখনও তাকে ‘ডাইনি’ বলেনি ! চোখ দুটো জ্বলে উঠল রঙিলার, তুই নিয়ম ভেঙেছিস। নাচের মাঝখানে চলে এসেছিস। ফিরে চল ঘটুলে। তোকে কী শাস্তি দিই দেখ্। তোর পীরিতের মানুষ দাঁড়িয়ে দেখবে শুধু, কিছু বলতে পারবে না !

মুখটা শুকিয়ে যায় মাল্কোর। সুরটা বদলে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে, বা রে ! তুই তো নিয়ম আগে ভাঙলি ? এ নাচ নাচলি কেন ? আমার অভ্যাস ছিল না, তাই

উঠে এসেছি!

রঙিলা শুধু বললে, উঠে আয় ওখান থেকে?

মাল্কোর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। তবু দাঁতে দাঁত চেপে বললে, না, আমি যাব না!

: যাবি না? —রঙিলার হাতে ছিল চৈতদাগুর! বসিয়ে দিলে এক ঘা!

—আয় বলছি!

বন্যজন্তুর মতো আর্তনাদ করে উঠল মাল্কো — না, না, না!

—এখনও না! —খুন চেপে গেছে রঙিলার! দ্বিগুণ বেগে উদ্যত করে হাতের লাঠি! শিউরে ওঠে মাল্কো! আর্ত চিৎকার করে ওঠে! কিন্তু সে নিষ্ঠুর আঘাত প্রতিহত হল মাঝখানে। পিছন থেকে কে যেন চেপে ধরেছে রঙিলার উদ্যত মুষ্টি!

চম্কে ওঠে ওরা দুজনেই। কখন অতর্কিতে রঙিলার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মানুষটা। চয়ন শিরদার।

রঙিলা বললে, হাত ছাড়!

—ছাড়ছি, কিন্তু কথা দাও ওকে মারবে না আর!

রঙিলা বলে, শিরদার, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি ভিনগাঁয়ের বেলোসা! আমার ঘটুলের মোটিয়ারীকে শাসন করবার অধিকার আমারই। তোমার মোড়লি করবার ইচ্ছা থাকে নিজের দলে যাও!

চয়ন হাসল। হাতখানা সে ছাড়েনি কিন্তু। বললে, বেলোসা, তোমার চেহারা মুরিয়া মেয়ের মত নয়; কিন্তু একটা ঘটুলের বেলোসা হয়েও ঘটুলের কানুন তুমি শেখনি?

আহত সর্পিণীর মতো রঙিলা বললে, এত বড় কথা বললে তুমি?

—বলতে বাধ্য করলে যে! তুমি কি জান না, আজকে একরাতের জন্য তোমার দলের সব কয়টি মোটিয়ারীর উপর তুমি অধিকার হারিয়েছ? এরা আজ এক রাতের জন্য আমার সম্পত্তি। রাত পোহালে তুমি তোমার অধিকার ফিরে পাবে।

রঙিলা চুপ করে থাকে। যুক্তিটা অকাট্য। চয়ন ছেড়ে দেয় ওর হাত।

বাঁ-হাতে মাল্কোকে টেনে নেয় বুকে। ডান হাতখানা প্রসারিত করে দেয় ঘটুলঘরের দিকে। মুহূর্ত পূর্বেকার রঙিলার কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠে, বেলোসা! ঘটুলে ফিরে যাও!

রঙিলার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেছে। কিন্তু না, সংযম সে হারায়নি! দ্রুতপদে নিঃশব্দেই ফিরে যায় একা। কলকণ্ঠে হেসে উঠে চয়ন। তারপর তার খেয়াল হয়—ওর বাহুবন্ধে নির্জীবের মতো পড়ে আছে মাল্কো, যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে সে!

—মাল্কো! মাল্কো!

না, অজ্ঞান সে হয়নি। আবেশে মুদে এসেছে তার দুটি কাজলকালো চোখ। ওর তনুদেহের প্রতিটি জীবকোষ অপ্রত্যাশিত মিলন সুখে নিম্পন্দ! উষ্ণ-আঁকা মুখটা তুলে ধরে সে প্রতীক্ষা করে অপ্রত্যাশিত স্পর্শ। “পোড়ো ভূমের” দিকে মুখ তুলে যেমন ফুটে ওঠে স্থলপদ্ম। কাবোঙ্গা গাঁয়ের নিঃসঙ্গ নায়কের হিসাবে কেমন যেন

ভুল হয়ে যায়। যা কোনদিন করেনি, যার প্রেরণা কোনদিন জাগেনি অন্তরে, তাই করে বসে হঠাৎ। তার কবাট-বক্ষে মান্দ্রি ঢোলের দ্রুত দ্রিমি দ্রিমি বোল — সে কার বুকের স্পন্দন? নত হয়ে আসে চ্যনের অধরোষ্ঠ, দিকচক্রবালের দিকে বর্ষণক্লান্ত বৈকালে যেমন বেঁকে নেমে আসে সপ্তবর্ণা ‘ভীমুল-উইল!’

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠি, কিন্তু একটা কথা ডাক্তার-সাহেব। সে রাত্রে এমন কী ঘটেছিল যাতে ধ্যান ভাঙলো কাবোঙ্গার নিঃসঙ্গ নায়কের? পূর্ণযৌবনা নারীকে বাহুবন্ধে বাঁধবার অভিজ্ঞতা তো এর আগেও হয়েছিল তার।

ডাক্তার-সাহেব বলেন, আমার মনে হয়, বেলোসাকে দেখেই ওর ধ্যান ভেঙেছিল। চ্যন সৃষ্টিছাড়া জীব। রঙিলার রূপটাও সৃষ্টিছাড়া, মুরিয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যে কোন কারণেই হোক রঙিলার ঐ অদ্ভুত চেহারায় মুগ্ধ হয়েছিল চ্যন। ধ্যান ভেঙেছিল তার। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে বেলোসা ধরা দিল না, সে হল প্রতিপক্ষ। চ্যনের অন্তরে তখন ঝড়ের সংকেত — তাই এনি পোর্ট ইন দ্য স্টর্মের আইনে মাল্কোর বন্দরে নোঙর গাড়ল চ্যন।

আমি বলি, তাহলেও প্রশ্ন থাকে। এক্ষুনি যে ঘটনার বর্ণনা দিলেন আপনি, সেটা কি আমরা কাবোঙ্গা ত্যাগ করার আগের ঘটনা, না পরের? আমি যে স্পষ্ট দেখেছিলাম একা বসে চ্যন তালাওয়ার ধারে সাবু গাছতলায়।

ডাক্তার পিল্লাই বলেন, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন — রঙিলার প্রতি চ্যন আকৃষ্ট হয়েছিল কেন? শুধু তার অদ্ভুত চেহারার জন্যই? রঙিলাই বা তাকে প্রত্যাখ্যান করে কোতায়ারকে বরণ করে নিল কেন? কিন্তু সে যীমাংসা আপাতত বন্ধ থাক। নটা বাজলো। আমাকে এবার বের হতে হবে। যাব পাশের একটা গাঁয়ে ভ্যান নিয়ে। যাবেন?

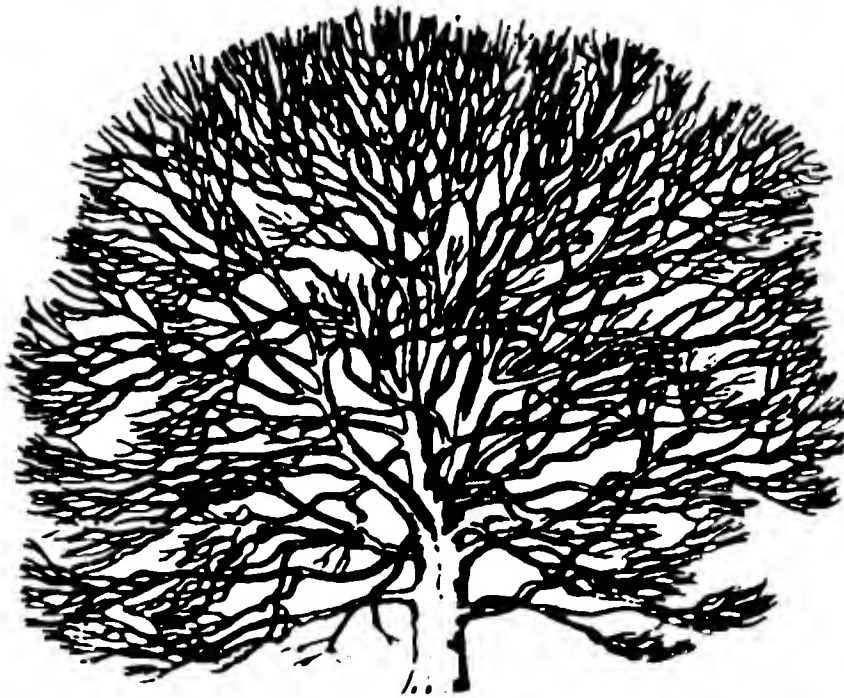
—কাবোঙ্গা অথবা কারাংমেটায়?

ডাক্তার-সাহেব হেসে বললেন, না, অন্য একটা গাঁয়ে।

বললুম, তবে একাই যান। কালরাত্রে ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নিই।

ডাক্তারবাবু টেবিল থেকে একখানা বই এগিয়ে দিয়ে বলেন, ঘুম না এলে এ বইখানা পড়তে পারেন! বেশ ইন্টারেস্টিং।

বইখানার নাম ‘সাইকোলজিক্যাল এ্যাবনমালিটিস্ এমংস্ট এ্যাবরিজিনালস্’!



॥ এগারো ॥

বইটা নিয়ে সবে শুরু করতে যাব, ঘরে এলেন মিসেস পিল্লাই। রান্নাঘর থেকে সরাসরি আসছেন বোঝা যায়। হাতে তাঁর স্টেনলেস স্টিলের একটা হাতা। কালরাত্রে ব্যাপারে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেছিলাম। মিসেস পিল্লাই কিন্তু সেদিক দিয়েই গেলেন না। হাসিমুখেই বললেন, কী? থার্ড এডিশন এক কাপ হবে নাকি এবার?

আমি ক্যাম্প চেয়ারটা ওঁর দিকে ঠেলে দিয়ে কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলি: থার্ড এডিশন? আমি তো প্রথম সংস্করণের জন্য একটা আবেদন পেশ করব ভাবছিলাম।

শর্মিলা দেবীর তরফে বিস্ময় প্রকাশের মধ্যে কপটতা ছিল না। বলেন, আপনি তো সাংঘাতিক লোক। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক কাপ, ব্রেকফাস্টের সঙ্গে এককাপ — একুনে দু-কাপ ইতিপূর্বেই শেষ করেননি?

—আমি যখন নিরস্ত্র, আর আপনার হাতে হাতিয়ার তখন আপনার যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী?

—মানে? আপনি বলতে চান সকাল থেকে দু-কাপ কফি খাননি?

—ও হরি! আপনি কফির কথা বলছেন। আমি দুঃখিত। আমি চায়ের কথা ভাবছিলাম। সকাল থেকে চায়ের নেশাটা ছোটেনি কি না!

—সে কথা বললেই হতো। আপনি তো শরবীর জন্যে লামহাদা খাটতে আসেননি। তাহলে নতুন জামাইয়ের মতো অত লজ্জা কেন? চায়ের তেষ্টায় কফি গিলে মরছেন কী জন্যে?

বুঝলাম কালরাত্রে গল্প তাহলে আরও একজন শুনেছেন। সে কথার কিন্তু ইঙ্গিত দিলাম না। বলি, মাদ্রাজী বাড়িতে আছি কি না সেটাই যে বুঝে উঠতে পারছিলাম না এতক্ষণ।

—আপনি ভুলে গেছেন এটা মাদ্রাজী বাড়ি নয়। অর্ধেক তার রঁচিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী! আপনি লক্ষ্য করে দেখেননি আপনাদের সঙ্গেই আমি যে পানীয়টি গ্রহণ করেছি তার রঙ মাল্কোর মতো নয়, রঙিলা বেলোসার মতো।

একই প্রসঙ্গ দ্বিতীয়বার উত্থাপন করায় বুঝলাম মিসেস পিল্লাই চাইছেন কালরাত্রে গল্পটার বিষয়ে আলোচনা মোড় ফিরুক। কারণটা আন্দাজ করতে পারি না। আমার অনুমান সত্য কি না বুঝবার জন্যে সে পথেই একপা বাড়িয়ে দিয়ে বলি, না তা অবশ্য লক্ষ্য করিনি আমি। আমি বুঝতে পারিনি আপনিও চয়ন শিরদারের দলে। কফি-কালো মাল্কোকে ছেড়ে সোনালী বেলোসার জন্যে লামহাদা খাটতে ছুটবেন।

শর্মিলা দেবী বলেন, সেখানেও ভুল হল আপনার। চয়ন শিরদারকে ভুল বুঝেছেন আপনি।

—ভুল বুঝেছি? কেমন করে?

—বলছি; কিন্তু তার আগে চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়ে আসি।

চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়ে উনি যখন ফিরে এলেন তখন আমি কোন প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসু নেত্রে শুধু তাকলাম ওঁর দিকে। বললেন, আমি কিন্তু এই সুযোগে আপনাকে অন্য একটা কথা বলে নিতে চাই।

—বলুন।

—সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা আপনাকে বলা শোভন হবে কি না তাই এখনও গুয়ে উঠতে পারছি না।

চুপ করেন উনি। হয়তো জবাবের প্রত্যাশায়। কিন্তু কী বলি? সে কথাই বললুম, আপনি কী বিষয়ে কথা বলতে চান, সঙ্কোচই বা কিসের তা না জেনে কেমন করে বলি?

—বিষয়টা আপনার বন্ধুর সম্বন্ধে আর সঙ্কোচটা স্বল্প-পরিচয়ের।

আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন উনি এক নিঃশ্বাসে। তবু আমার কথা ফুটলো না। সঙ্কোচটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, ভাবছিলাম আপনার পক্ষে মনে করা স্বাভাবিক, এত অল্প পরিচয়ে এত ঘনিষ্ঠ কথা কেন বলতে চাইছি আমি। কিন্তু মুশ্কিল কী জানেন, যে সমস্যার মধ্যে আমি পড়েছি তার সম্বন্ধে আলোচনা করার মতো মানুষ আমার কাছে-পিঠে নেই। আপনি বাঙালী, ডাক্তারবাবুর ঘনিষ্ঠ না হলেও বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী — তাই মনে হচ্ছে আপনার পরামর্শ নিতে সঙ্কোচ করা আমার পক্ষে বোকামিই হবে।

আমি গাঢ়স্বরে বলি, শর্মিলা দেবী, আপনি আমাকে অসঙ্কোচে সব কথা বলতে পারেন। আমার ছোটবোন থাকলে তাকে যেভাবে পরামর্শ দিতাম, আপনাকেও তাই দেব।

শর্মিলা দেবী একটু ভেবে নিয়ে বলেন, আপনি কি ডাক্তারবাবুর পূর্বকথা সব জানেন?

—ওঁর বাবা একজন বড় সার্জেন ছিলেন, আপনার শাশুড়ী বাঙালী ঘরের মেয়ে, ডাক্তার-সাহেব প্রথমে শান্তিনিকেতনে এবং পরে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়েন এইটুকু মাত্র জানি।

—আমাদের বিয়েতে ওঁর বাবার সম্মতি ছিল না, তা জানতেন না?

—না।

—তাহলে একটু গোড়া থেকে বলতে হবে।

ডাক্তার পিল্লাইয়ের সঙ্গে শর্মিলা দেবীর প্রথম আলাপ শান্তিনিকেতনে। শর্মিলা আর্টসের ছাত্রী, পিল্লাই বিজ্ঞানের। তবু ইন্টারমিডিয়েটে বাঙলা-ইংরাজির যুক্ত ক্লাসে ওঁরা একসাথে লেকচার শুনেছেন। গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব। পিল্লাই আই. এস্‌সি পাশ করে কলকাতায় এলেন—শর্মিলা রয়ে গেলেন সেখানেই। ছাড়াছাড়ি হওয়াতেই প্রথম দুজনে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝা যায় তার চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হয়েছেন ওঁরা। ডাক-বিভাগের আয় বাড়ল। কাটলো আরও দু-বছর। বি-এ পাশ করে শর্মিলা এলেন কলকাতায়। দেখা হতো কফি হাউসে। তারপর যা হয়ে থাকে। দুজনেই অনুভব করলেন কফি হাউসে বড় ভীড়। রমানাথন বলতেন, কোন নিরালা চায়ের দোকানে যাওয়া যাক বরং। শর্মিলা জবাব দিতেন, তার চেয়ে আমাদের বাড়িতে চল, কফিই খাওয়াব তোমাকে। কিন্তু আসলে তো ওঁরা যে খুঁজছেন একটি দুর্লভ জিনিস—নির্জনতা, নাগরিক সভ্যতায় যা নাকি দুস্প্রাপ্য। প্রায় একই

সঙ্গে দুজনে আবিষ্কার করলেন একটা সত্য — ভীড়ের এ্যান্টোনিম হচ্ছে ‘নীড়’। একটা নীড় না বাঁধতে পারলে এ ভীড়ের হাত থেকে মুক্তি নেই। রমানাথন শর্মিলার মায়ের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করলেন। শর্মিলার বাবা নেই। মা সম্মতি দিলেন, কিন্তু গোল বাধল সার্জেন-সাহেবকে নিয়ে। তিনি আপত্তি করলেন বাঙালী বলে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও যুক্তিটা প্রবল। তিনি নিজেরও একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, ভালবেসে। কিন্তু তাঁর দাম্পত্যজীবন নাকি সুখের হয়নি। আর সার্জেন-সাহেবের মত, তাঁদের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার কারণ রমানাথনের মা মাদ্রাজী নন! যে ভুল তিনি করেছেন, সেই ভুল ছেলেকে করতে দেবেন না। এই তাঁর পণ।

বাপের অমতেই বিবাহ করলেন রমানাথন। থিসিস পেপার প্রায় তৈরি! ডক্টরেট নিয়ে বিলেত যাবেন সব ঠিক। সব ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসতে হল। যা হয় একটা রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে। শর্মিলা দেবী বারেবারে আপত্তি করেছিলেন। সংসারের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন যতদিন না থিসিসটা তৈরি হয়। কিন্তু রমানাথন কর্ণপাত করেননি। চাকরি নিয়ে চলে এলেন দণ্ডকারণ্যে। এই পটভূমিকা সংক্ষেপে সেরে শর্মিলা দেবী বললেন, ওঁর যিনি অধ্যাপক, যাঁর তত্ত্বাবধানে উনি রিসার্চ করছিলেন, তাঁর ধারণা ওঁর অসমাপ্ত গবেষণার সম্ভাবনা আছে। শুধু ডিগ্রি নয়, একটা মৌলিক গবেষণার অধিকারী হতে পারতেন পিল্লাই। গত চার বছর ধরে তিনি ক্রমাগত লিখেছেন ওঁকে ফিরে যেতে। অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে। গত সপ্তাহে তিনি লিখেছেন, দাঁড়ান দেখাই আপনাকে—

চিঠিখানা নিয়ে এলেন। তার প্রতি ছত্রে ছাত্তের প্রতি অধ্যাপকের অন্ধ আবেগ অনুভব করা যায়। বৃদ্ধ অধ্যাপক ব্যক্তিগত পত্রে শেষবারের মতো অনুরোধ করেছেন। লিখেছেন, তিনি বে-আইনী কাজ করেছেন, জ্ঞাতসারে। রমানাথনের অসমাপ্ত কাগজ চার বছর ধরে গোপন রাখার কোন অধিকার তাঁর নেই! তবু তিনি প্রাণ-ধরে সে কাগজ কোন উত্তরসূরীকেও দিতে পারেননি। লিখেছেন, তাঁর নিজের চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে এসেছে। তিনি যাবার আগে দেখে যেতে চান, রমানাথন আবার ফিরে গেছে তার আরদ্ধ কাজ শেষ করতে। রমানাথনের রেকর্ড মার্ক তাকে সাহায্য করবে এ স্কলারশিপ দ্বিতীয়বার লাভ করতে। তিনি সে ব্যবস্থা করবেন। রমানাথনের মুখ চেয়ে যে কাগজ এতদিন লুকিয়ে রেখেছেন তিনি, এই শেষ সুযোগ যদি সে না নেয়, তাহলে বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে তা এবার অন্য কোন রিসার্চ-স্কলারকে দেওয়ার সময় হয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে ফেরত দিলাম শর্মিলা দেবীর হাতে, বলি, ডাক্তারসাহেব কী বলেন?

—ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ও যখন যা ধরে তার মধ্যেই ডুবে যায়। আর কোন কিছুর কথা তখন ওর খেয়াল থাকে না। একদিন এই রিসার্চের কাগজগুলো বাঁচাতে ও নিজের একখানা হাত কেটে ফেলতে পারত। যে মুহূর্তে স্থির করল আমাকে বিয়ে করবে সেই মুহূর্তেই ওর সারা মন অধিকার করলাম আমি। কাগজগুলো তখন ছেঁড়া-কাগজের ঝুলিতেই গেল, না ওজনদরে বিক্রি করে দেওয়া হল তার খোঁজও করেননি তখন। পাগলের মত ছোট্টাছুটি করেছে রোজগারের সন্ধানে। এখন ওর

আর্থিক অসচ্ছলতা নেই। দণ্ডকারণ্যে ইচ্ছে থাকলেও টাকা খরচ করা যায় না। চার বছরে যা জমেছে তাতে অনায়াসে এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রিসার্চ-ওয়ার্কে যোগ দিতে পারে এখন।

—তাহলে আর আপত্তি কী ?

—ঐ যে বললাম। ওর মাথায় এখন ঢুকেছে অন্য এক চিন্তা। ও এখন রিসার্চের কথাও ভাবে না, আমার কথাও নয়, ও ডুবে আছে নতুন নেশায়।

—কী সেটা ?

—চয়নকে ভাল করে তুলতে হবে। চয়নের বিয়ে দিতে হবে। উইচক্রাফট ভার্সেস চিকিৎসা-বিজ্ঞান। লড়াইয়ে নেমেছে ও। আর কোন কিছু ওর সামনে নেই।

অবাক হয়ে গেলাম শুনে, বলি, বলেন কী ? এতদূর ?

—দেখলেন না কাল রাত্রে ? চয়নের সমস্যার বিষয়ে একটা নতুন ক্লু পাওয়া মাত্র আমাকে কেমন ধমকে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে ?

শর্মিলা দেবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি বৃথাই লজ্জা পেয়েছি কালরাত্রে। স্বামীর রূঢ় ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হননি মিসেস পিল্লাই। বরং, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, কেমন যেন গর্ববোধ করেছেন তিনি।

শিল্পী, সাধক, লেখক, বৈজ্ঞানিকদের প্রতি মেয়ে-মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। যারা সাবধানী পথিক তারা তাদের ভালবেসেই ক্ষান্ত হয়, তাদের সঙ্গে নীড় রচনা করে না। কিন্তু একজাতের মেয়ে আছে যারা আবার ওদের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে নেবার দুঃসাহসী খেলায় বেপরোয়া। ওরা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত বলেই তাদের গর্ব। শর্মিলা দেবী হচ্ছেন সেই জাতের মেয়ে। তাঁর স্বামী যে একজন একনিষ্ঠ সাধক এটাই ওঁর আত্মতৃপ্তির মূলধন। সে একনিষ্ঠ সাধনার মূল্য মেটাতে যদি খেয়ালী মানুষটা স্বল্পপরিচিতের সামনে স্ত্রীকে অপমান করেই বসে তবে সে অপমানও কি গৌরবের নয় ?

বললুম, কিন্তু আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে ?

—ওকে বোঝাতে হবে — এসব ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে যাতে ফিরে যায়। ওর রিসার্চ-ওয়ার্কে যাতে আবার যোগ দেয়।

একটু চুপ করে ভাবি। তারপর বলি, দেখুন শর্মিলা দেবী, আপনি আমার চেয়ে ডাক্তার-সাহেবকে বেশী ভাল করে চেনেন। স্বল্প পরিচয়ে আমি যেটুকু বুঝেছি সেটুকু আপনার অন্তত বোঝা উচিত। আমার বিশ্বাস আমার মৌখিক অনুরোধে কোন কাজ হবে না। ছেলেমানুষিই বলুন, আর পাগলামিই বলুন, চয়নের একটা এস্পার-ওসপার না দেখে তিনি মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে দাঁড়াতে রাজী হবেন না।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস পিল্লাইয়ের। হাসলেন অদ্ভুত ভাবে। সে হাসি বেদনার, সে হাসি সার্থকতার। শর্মিলা দেবী যে রমানাথনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সে রমানাথন স্বাভাবিক নয়। সে ব্যতিক্রম। আর ঐ ব্যতিক্রমটুকুকেই তিনি ভালবাসেন। মনে হয় শর্মিলা দেবীর মধ্যে দুটি ব্যক্তিসত্তা যেন এক সঙ্গে রয়েছে। এক শর্মিলা প্রাগম্যাটিক — সে শাড়ি-গাড়ি-বাড়ির প্রত্যাশী, সে স্বল্প-পরিচিত স্বামীর বন্ধুর

কাছে আসে সাহায্য চাইতে — কেমন করে স্বামীকে সাধারণ স্বাভাবিক পথে নিয়ে আসা যায়। আর এক শর্মিলা আইডিয়ালিস্ট — সে তার প্রেমিকের সাধনার মূল্য মেটাতে সব বঞ্চনা সহ্য করতে রাজী। ত্যাগের মহিমায় সে মহান হবার ব্রতে দীক্ষা নিয়েছে।

—চয়ন কি কোনদিন ভাল হয়ে উঠবে? মুক্তি পাবেন উনি?

—তা আমি কেমন করে বলব বলুন।

—আচ্ছা পাগলরা অনেকদিন বাঁচে, নয়?

হেসে বলি, চয়নের মৃত্যু কামনা করছেন আপনি।

কোন সঙ্কোচ নেই এ কথাতেও। অম্লানবদনে উনি স্বীকার করেন, করছি। সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করছি — আমি চয়নের মৃত্যু কামনা করি। পাগল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে কি মৃত্যু ভাল নয়? চয়নও মরে বাঁচে, ডাক্তার-সাহেবও মুক্তি পান। আর বাঁচি আমরাও। আমি, খুকু!

মনে মনে হাসি—মানুষ কী স্বার্থপর। মিসেস পিল্লাই জীবনে প্রতিষ্ঠা চান—তাই তিনি মৃত্যু কামনা করছেন নগণ্য চয়ন শিরদারের, যে চয়ন শিরদারের জীবনের বিনিময়ে তার মা অম্লানবদনে প্রাণ-হরণ করতে চেয়েছিল নগণ্যতর দুটো শুয়োরছানার!



॥ বারো ॥

পরের দিন ফিরে এলাম নারানপুর থেকে। মৌলানা-সাহেব পারলকোট থেকে ফেরার পথে তুলে নিয়েছিলেন আমাকে। এই দুটো দিন সময় ও সুযোগমত শুধু চয়ন শিরদারের কথা শুনেছি। চয়ন শিরদার, মাল্কো, রঙিলা, আখালী, কোণ্ডার জগতে বিচরণ করেছি। শুধু ডাক্তার পিল্লাইয়ের হাত ধরে নয়, মিসেস পিল্লাইয়ের কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছি অনেক খণ্ড কাহিনী। রহস্যের কিনারা করা যায়নি। দেখলাম, ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মেতে আছেন এই নিয়ে। যদিও শর্মিলা দেবী এ অভিযোগ অস্বীকার করলেন। গল্পটার কোন্ অংশ কখন কার কাছে শুনেছি আজ আর তা মনে নেই। এবার তাই নিজের ভাষাতেই শুরু করতে হচ্ছে—

চৈতদাণ্ডার উৎসবের মাসখানেক পরের কথা। কাবোঙ্গা গাঁয়ের কোণ্ডা সদলবলে বার হল ‘পুষ্পার মিছানায়’। কোণ্ডা হচ্ছে চয়নের বাপ। ওরা যাবে কারাংমেটার গাইতা আয়েতু গোণ্ডের বাড়ি। চৈতদাণ্ডার উৎসবের পরেই চয়ন তার মাকে বলেছে, আয়েতুর মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়। চয়নের মা বলেছে কোণ্ডাকে। বুড়ো-বুড়ি দুজনেই খুশী হয়েছিল চয়নের এ প্রস্তাবে। আয়েতু ওদের আকোমামা শ্রেণীর, সে একটা গাঁয়ের সদার। এ বিবাহ সবদিক থেকেই কাম্য। কোণ্ডা কথাটা প্রথমে গিয়ে জানালো নিজ গ্রামের গাইতার কাছে, গাদরুর কাছে। কাবোঙ্গা গাঁয়ের গাইতা, গুনিয়া আর কোণ্ডা তিনজনে পরামর্শ করল। সবার আগে সিয়ারি পাতার ঠোঙায় করে একপাত্র মধুক নিবেদন করা হল পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে। সকলে সাগ্রহে লক্ষ্য করতে থাকে। না, মছ্যার ঠোঙাটা হাওয়ায় উল্টে গেল না। তিল তিল করে ঠোঙা থেকে মধুকরস বেরিয়ে এল মাটিতে। মাতা ধরিত্রী— মাটি-মাল — শোষণ করে নিলেন অর্ঘ্য। অর্থাৎ এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন পূর্বপুরুষগণ। বিবাহে কোন বাধা নেই। ফলে এক চৈতালী প্রভাতে গাদরু, গুনিয়া আর বিণ্ডোকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল কোণ্ডা। বিণ্ডো হচ্ছে চয়নের বন্ধু, কাবোঙ্গার কোতোয়ার। ঘটুলের বাইরে গুরুজনদের কাছে তার পরিচয় বিণ্ডো — কোতোয়ার নয়। যেমন ঘটুল-বন্ধুরা ওকে ভুলেও ‘বিণ্ডো’ নামে ডাকবে না। তাদের কাছে সে কোতোয়ার। ওরা চারজন কারাংমেটায় চলেছে পুষ্পার মিছানায়। ‘পুষ্পার’ মানে ফুল, আর ‘মিছানা’ শব্দের অর্থ চয়ন, আহরণ। সুতরাং ‘পুষ্পার মিছানা’ মানে পুষ্প আহরণ। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কন্যাপক্ষের দ্বারস্থ হওয়া পুষ্প চয়নের প্রয়াস ছাড়া আর কী?

ওদের ভাগ্য ভাল। অমঙ্গলসূচক কিছু ওদের নজরে পড়ল না। কাক, সাপ, ময়ূর, গিরগিটির দল ত্রিসীমানায় নেই। মনে মনে আশ্বস্ত হল কোণ্ডা। বিবাহ সুখের হবে নিশ্চিত। পূর্বপুরুষরা পথ থেকে সব কিছু অযাত্রাকে সরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোণ্ডা লক্ষ্য করেছে ওরা যখন গাঁয়ের বাইরের তেঁতুলতলা দিয়ে আসছিল তখন তেঁতুল গাছের মগডালে বসে একটা উশীর পাখী ‘উইং উইং’ করে ডাকছিল। পাখীটা ছিল পথের বাঁদিকে। ফলে যাত্রা শুভ!

বেলা দ্বিপ্রহরে ওরা এসে পৌঁছালো কারাংমেটায়। আয়েতু বাড়ি ছিল না। আয়েতুর

মেয়ে রঙিলা ছিল বাড়িতে। আপ্যায়ন করে বসতে দিল অতিথিদের। ঘরের ভিতর থেকে বার করে আনল ‘কাটল’। বন্যলতায় বোনা চারপায়া জলটৌকি। কোণ্ডা, গাদরু আর গুণিয়া বসল জুত করে। বিণ্ডো বয়োঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারে না। ভিনগাঁয়ে এসে তাকে কাবোঙ্গার শিষ্টাচারের পরিচয় দিতে হবে। দাওয়ার উপর ছিল একখানা মাড়াং ঘাসের বোনা মাসনি, অর্থাৎ মাদুর। তাই পেতে বসল সে।

কোণ্ডা বলে, তুই আয়েতুর বেটি ?

মেয়েটি সলজ্জ মাথা নেড়ে বললে, হয়, অর্থাৎ, হ্যাঁ।

অবাক হয়ে গেল কোণ্ডা। এমন মেয়ে মুরিয়া মায়ের কোলে আসে নাকি ? শহর থেকে মাড়াই দেখতে আসে যেসব সাহেব তাদের ঘরের মেয়েদের মতো দেখতে ! গায়ের রঙ সাদা, মাথায় চুলও কটা, চোখের তারা বেড়ালের মতো ! গা-টা ছমছম করে ওঠে কোণ্ডার। এ কেমন মেয়ে ? এমন মেয়েকে পছন্দ করে বসেছে তার চয়ন ? যে কখনও কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায় না ? মেয়েটি ‘ইয়ে’ নয়তো ? ভাবী পুত্রবধু সম্বন্ধে ‘পাংনাইন’ কথাটা মনে মনেও সে ভাবতে পারলে না।

অবাক হয়েছিল বিণ্ডোও। দিনের আলোয় মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছিল — আশ্চর্য, কেমন করে ঐ মেয়েটিকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেছিল সেদিন ? রাত্রের অন্ধকারে পূর্ণযৌবনা একটি নারীর যৌবন ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনি বলেই ?

গাদরু বলে, তোর নাম কী ?

—রঙিলা।

—তোর বাপকে খবর দে। বল্ কাবোঙ্গা থেকে গাইতা আর গুণিয়া এসেছে।

মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। কোণ্ডা তখন বিণ্ডোর দিকে ফিরে চুপি চুপি বলে, এই মেয়েই তো ?

চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে বিণ্ডো বলে, হয় !

আড়ালে অপেক্ষা করছিল মাল্কো আর তা মা আখালী। আর আয়েতুর বুড়ি পিসি — কিরিংগা ! বুড়ি ফিস্ ফিস্ করে বলে, ওরা কি পুঙ্গার মিছানায় এসেছে নাকি রে নাতিন ?

ঠোঁট উল্টিয়ে রঙিলা বলে, আমি কী জানি ? টান্নিকে ওরা ডাকছে।

কিরিংগো রঙিলার খুতনিতে নাড়া দিয়ে একটা অশ্লীল গালাগাল ছাড়ে। গালটা আদরের, যদিও কানে আঙুল দিতে হয়। বলে, ওলো আর ন্যাকা সাজিস না। বুঝেছিস ঠিকই। তোর জন্যে ওরা মিছানায় এসেছে আর তুই জানিস না ? কিন্তু কে ওরা ? আসছে কোথা থেকে ?

—কাবোঙ্গা থেকে। কাবোঙ্গার গুণিয়া আর গাইতা ওরা।

কাবোঙ্গা ! নামটা শুনেই চমকে ওঠে মাল্কো। ওরা কাবোঙ্গা থেকে আসছে ? সেখানেই তো বাস করে সেই আশ্চর্য ছেলেটি, যে বেরিয়ে এসেছিল ঘটল থেকে। এরা নিশ্চয় চয়নকে চেনে। একই গাঁয়ের লোক, চিনবে না ? জিজ্ঞাসা করলে কি

কি না? — চয়ন কেমন আছে, সে এখন কী করে, কী ভাবে —
কি না? গায়ের একটি মেয়ের কথা তার এখনও মনে আছে কি না? হ্যাঁ, ঠিক তো

কোনায় ঐতো বসে আছে সেই ছেলেটি যে ‘মাক্স’র খাঁখাটা জিজ্ঞাসা করছিল।
কি না? — রঙিনাঙ্কে ঐ ছেলেটির কঠলগাও হতে দেখেছিল সে রাতে। ঐ
ছেলেটিই তাহলে পাত্র। কিন্তু কী নির্লজ্জ ছেলেটা। নিজেই এসেছে পুজার-মিছানায়!
কি না? নিয়ম নয়। তা সে যাই হোক, ঐ ছেলেটির সঙ্গে একবার নির্জনে দেখা
করা যায় না? জানা যায় না ওর কাছ থেকে চয়নের কথা?

মাল্কেও চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। বুড়ি কিরিংগো ওকে ঠেলা মারছে, যা যা,
নিশাপুর ডেকে নিয়ে আয় তোর টাঙ্গিকে।

মাল্কে ছুটলো মাঠপানে। দিদির একটা হিল্লো হল তাহলে!

আয়েতু এলে দুপক্ষের সৌজন্য বিনিময় হল। কোণ্ডা যে মধুকের পাত্রটা এনেছিল
দুপথারস্বরূপ সেটা দিল আয়েতুর হাতে। আয়েতু আন্দাজ করেছে ব্যাপারটা। তবু
অনাসক্তের ভাব দেখিয়ে বলে, তারপর, এদিকে কী মনে করে?

কোণ্ডা বললে, বিশেষ কিছুই নয়, এ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ তোমার
ঘর থেকে মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ পেলাম পথ থেকে। ভাবছি ফুলটা তুলে নিয়ে
গেলে কেমন হয়।

আয়েতু মুখ টিপে হেসে বলে, আমিও সেই রকম আন্দাজ করেছি। এই তো
দুনিয়ার নিয়ম ভাই। একজন ফুলগাছ পোঁতে, জল দেয়, সেবা যত্ন করে — আর
গোষ্ঠে সে গাছে কুঁড়ি দেখা দেয় অমনি ছুটে আসে প্রতিবেশী। ফুল তুলে নিয়ে চলে
গায়।

কোণ্ডা বলল, দুনিয়াদারির এ দস্তুরীর মধ্যে নতুন কথা কী আছে? তুমি তো
আমাদের আকোমামা শ্রেণীর। তোমার ঘরগীটি কি একদিন আমাদের গোত্রেরই ফুল
হয়ে ফোটেনি? লুটেরার মতো তাকে লুট করে আননি আমাদের গোত্র থেকে?
এ শিক্ষা যে তোমার কাছেই ভাই।

মুখের মতো জবাব। হাহা করে হেসে ওঠে সবাই। এ আলাপচারী শুনে মনে
হতে পারে দুজনেই শিক্ষিত, ভাষার উপর দুই বৈবাহিকেরই যথেষ্ট দখল আছে।
মাসলে তা মোটেই নয়। পুজার মিছানার এ বাঁধি গৎ বহুদিন থেকেই চলে আসছে।
নতুন জামাইয়ের হাতে মাকু দিয়ে তাকে জীববিশেষের স্বর অনুকরণ করতে যিনি
অনুরোধ করেন তিনি কবি প্রতিভাশালিনী না হলেও যেমন ছড়া কাটেন এরাও তেমনি
অন্যায়সে বাঁধি-গৎ গেয়ে গেল। অবশ্য স্বীকার করতে হবে, আদি রচয়িতার নিশ্চয়
কিছু কাব্যজ্ঞান।

গাই হোক আয়েতু এবার কাব্য ছেড়ে কাজের কথায় নামে। আগন্তুক দল যথারীতি
পূর্ণপুষ্করদের সিয়ানি পাতায় মধুক উৎসর্গ করেছে কি না — তার ফলাফল কী হয়েছে

পথে কী কী সুলক্ষণ অথবা দুর্লক্ষণ দেখা গেছে তার সন্ধানসুলুক জেনে নেয়।
কি না? শুনে সে রাজি হয়, বলে, আমার মেয়েকে দেখেছ তো?

দেখেছি বই কি। সেই তো কাটুল পেতে বসতে দিল আমাদের। কিন্তু একটা

কথা গাইতো, তোমার গায়ের রঙ তো উঁইষের মতো, তোমার গৃহিণীটিও আমাদের গোত্রের, তাহলে...

বাধা দিয়ে আয়েতু বললে, হ্যাঁ সব কথাই খুলে বলা দরকার ! আমার মেয়েটিকে তোমরা আদর করে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছ। তাই সব কথা তোমাদের জানাতে হবে। সব শুনে, সব জেনে যদি আমার মেয়েকে ঘরে নিতে চাও তবেই আমি সম্মতি দেব।

ঘরের ভিতর দিকের দেওয়ালে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে রঙিলা, মাল্কো, তাদের মা আর বুড়ি কিরিংগো। রঙিলার জন্মবৃত্তান্ত আজ ওরা নতুন শুনছে না। সে কাহিনী ওদের জানা। রঙিলা নিজেরও জানতো যে, সে আয়েতুর নিজের মেয়ে নয়, পালিতা কন্যা। ওরা শুধু জানতে চায় সব কথা শুনে পাত্রপক্ষ কী বলে।

আদ্যোপান্ত সব কথা শুনে কোণ্ডা বললে, এত কথা আমি জানতাম না। চৈত-দাণ্ডারে তোমাদের গ্রাম এবার এসেছিল আমাদের ঘট্টলে। সেখানেই আমার ছেলে তোমার মেয়েকে প্রথম দেখে। পরে তার মাকে বলে তাকে সে বিয়ে করতে চায়। তাই আমি এসেছিলাম। এখন যা শুনছি তাতে...

কাবোঙ্গার গাইতা গাদরু বাধা দিয়ে ওঠে, কিন্তু এখন যা শুনছ তাতেই বা তোমার মত বদলাচ্ছে কেন ? তোমার ছেলে এ মেয়েকে দেখেছে, পছন্দ হয়েছে তার। রঙিলা আয়েতুর নিজের মেয়ে না হলেও সে তাকে কন্যার মতো পালন করেছে। কারাংমেটার মুরিয়া সমাজ তাকে মেনে নিয়েছে আয়েতুর মেয়ে বলেই। রঙিলা শুনেছি এ ঘট্টলের বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত। তাহলে তোমার ভাবনা করার কী আছে ?

কোণ্ডা বলে, বারে, নেই ? আমাদের সমাজপতিদের জিজ্ঞাসা করতে হবে না ? ও তো আসলে মুরিয়া নয়। মুরিয়ার রক্ত তো ওর দেহে নেই।

—ও মুরিয়াই !—দৃঢ়স্বরে বললে গাদরু।

—কিন্তু সমাজ ? কাবোঙ্গার পঞ্চায়েত ?

গাদরুর অভিমানে লাগল। বললে, আমিই সমাজ। আমিই পঞ্চায়েত ! তবে শোন বলি। অনেক বছর আগের কথা। আল্‌হোর গাঁয়ের নাম শুনছে ? আল্‌হোর ঘট্টলে কুহ্‌রামি গোত্রের একটি চেলিকের সঙ্গে সগোত্র একটি মোটিয়ারীর গীর্দা-আতোরে হয়। ওরা দুজনেই কুহ্‌রাম। দাদাভাই গোত্রের। বিবাহ অসম্ভব। ঘট্টলের শিরদার ওদের দুজনকে বারে বারে সাবধান করে দিল, তবু তোমরা জান ‘আতোরে’ পড়লে মানুষ ছুঁচোর মতো কানা হয়ে যায়। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করতে থাকে। শেষে শিরদার নিরুপায় হয়ে আল্‌হোরের গাইতার কাছে অভিযোগ আনল। পঞ্চায়েতের বিচারসভা বসল, ডেকে পাঠানো হল দুটি তরুণ-তরুণীকে। কিন্তু কোথায় তারা ? খবর পেয়ে ওরা দুজন ভেগে পড়েছে। খোঁজ খোঁজ। শেষে সন্ধান পাওয়া গেল হিরুরি গাঁয়ে গিয়ে ওরা ঘর বেঁধেছে। হিরুরির সমাজপতিরা সব শুনে ওদের একঘরে করল। গাঁয়ের বাইরে একটা ছাপরা তুলে ওরা দুজনে থাকত। মুরিয়া সমাজ তাদের বিবাহ স্বীকার করে নেয়নি। কোন মুরিয়া ওদের সাথে একসঙ্গে বসে খায়নি। গাঁয়ে শুয়োর বলি হলে ওদের প্রসাদী মাংস পাঠানো হয়নি। কোন উৎসবে ওদের নাচতে

দেওয়া হয়নি। কালে ওদের একটি ‘ভুলা-ছ্যা’ হয়েছিল। মেয়ে নয়, ছেলে। ওরা দুজনে যখন মারা যায়, কোন মুরিয়া ওদের পোড়ায়নি। সেই ভুলা-ছ্যা একাই বাপমায়ের সংকার করেছিল। কিন্তু সেই ভুলা-ছ্যাকে সমাজ ত্যাগ করেনি। যদিও সে আইন-মাফিক অবৈধ সন্তান, তবু তাকে স্বীকার করে নিয়েছিল সমাজ। যদিও তার বাপ-মা দুজনেই কুহুরামি গোত্রের তবু তাকেও কুহুরামি গোত্রের বলে ধরা হল। সে ছিল হিরুরি গাঁয়ের ঘটুলের কোতোয়ার। মুরিয়া সমাজে সে বিয়েও করেছিল।

কোণ্ডা বলে, কিন্তু তা কেমন করে হল ?

গাদরু গভীর হয়ে বলে, হল এইজন্য যে, আমরা শহুরে হিন্দুদের মতো অসভ্য নই। বাপ-মায়ের অপরাধে আমরা বাপ-মাকেই শাস্তি দিই। সন্তান তো কোন পাপ করেনি। তাকে শাস্তি দেব কেন ?

আয়েতু বললে, ন্যায্য কথা। আমরা শহুরেদের মত অসভ্য নই !

কোণ্ডার মনের সংশয় কেটে গেল এতে। বললে, বেশ আমি রাজি !

অক্ষুটে একটা গুঞ্জন উঠল ভিতর মহলে। বুড়ি কিরিংগো রঙিলার গালটা টিপে দিয়ে বললে, কী গো মেয়ে ? এত স্মৃতি কিসের ? — বলেই একটা অলীল রসিকতা যোগ করল সাথে।

রঙিলা একছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। মালকো হি-হি করে হেসে ওঠে, দিদিটা লজ্জা পেয়েছে !

আয়েতু বললে, তা হলে তোমার ছেলেকে একবার দেখতে হয়। শিকার করতে শিখেছে ? তীর ছুঁড়তে ?

হাছা করে হেসে উঠে কোণ্ডা। বলে, আমার ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন ছেলে এ তল্লাটে নেই।

আয়েতু বললে, বটে ?

পুত্রগর্বে গভীর হয়ে কোণ্ডা বললে, আমার ছেলে সাধারণ চেলিক নয়, সে হচ্ছে কাবোঙ্গা ঘটুলের শিরদার। চমন শিরদার।

গাদরু ধমক দিয়ে ওঠে : কোণ্ডা !

সন্তান ঘটুলে কোন পদে অধিষ্ঠিত বাপ-মায়ের তা জানার কথা নয়। অর্থাৎ না জানাটাই নিয়ম। অবশ্য অধিকাংশ লোকেই তা জানে — স্বীকার করে না প্রকাশ্যে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সেই কথাটাই বলে ফেলেছে কোণ্ডা। তাই ধমক দিয়ে ওঠে গাদরু।

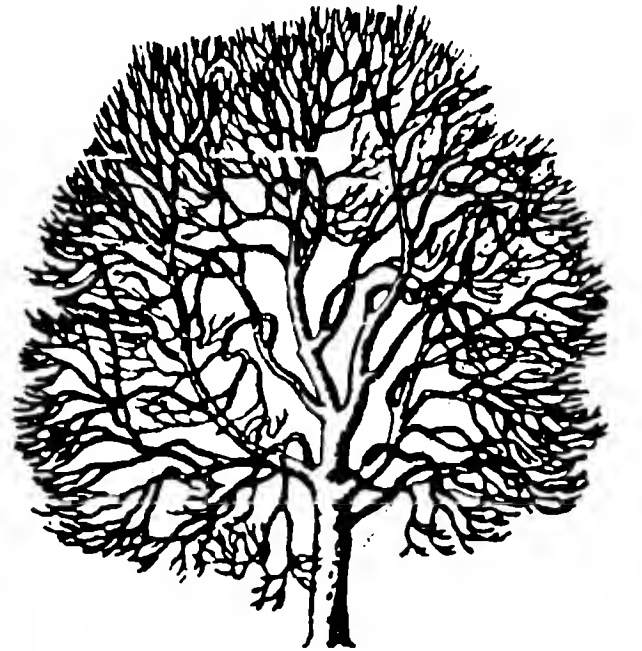
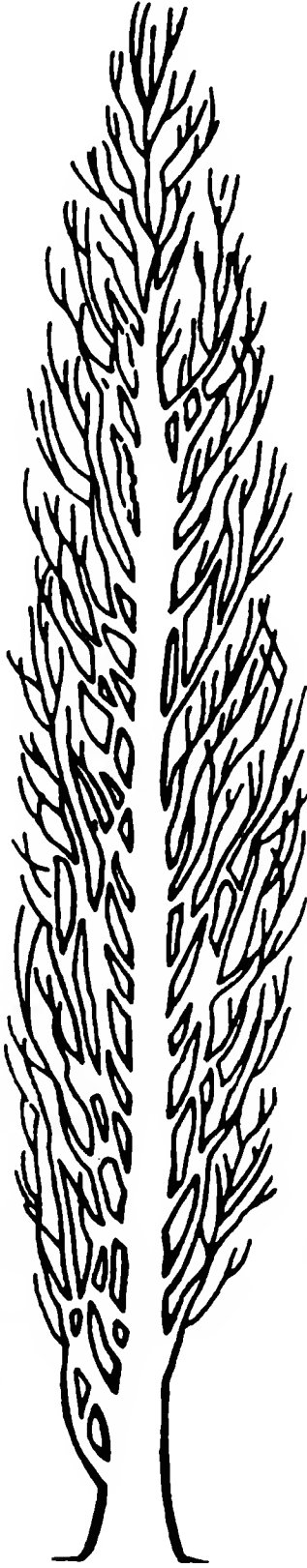
কিন্তু ঘরের মধ্যে ওটা কিসের শব্দ ? আয়েতু উঠে গেল ভিতর বাড়িতে। মাল্কোকে বুঝি কিছুতে কামড়েছে। দরজার ফাঁকে কান পেতে সে শুনছিল এতক্ষণ পুঙ্গার-মিছানার কথোপকথন। হঠাৎ বসে পড়েছে মাথা ঘুরে। দুহাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে উবুড় হয়ে পড়েছে। দেওয়ালের ফাটলে সাপ-বিছে কিছু ছিল না কি ?

[মনে আছে, এখানেও আমার সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা হয়েছিল। আমি বললুম, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওদের ভাষায় ‘আপনি-তুমি’-র ভেদ আছে ?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, না নেই। কিন্তু বঙ্গানুবাদের সময় সে ভেদ রেখেই বলছি আমি। ইংরাজী ভাষায় মাস্টার ছাত্রকে বলে “যু”, ছাত্রও শিক্ষককে বলে “যু”। আমরা অনুবাদ করবার সময় একটাকে ‘তুমি’, আর একটাকে ‘আপনি’ বলি। মুরিয়াদের ভাষায় মধ্যমপুরুষে “তুই”-টাই বহুল প্রচলিত — কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে বাচনভঙ্গিতে যে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রকাশ পায় তাতে সে “তুই”কে বাঙলায় কখনও “তুমি” কখনও “আপনি” বলতে ইচ্ছে করে।

—কিন্তু ওদের ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ করলেই গল্পের মেজাজটা ঠিক ফুটে উঠবে না কী ?

আক্ষরিক অনুবাদ করলে আপনি কানে আঙুল দিয়ে উঠে পড়বেন। প্রতি কথার মাত্রায় ওরা যে খিস্তির লেজুড় জোড়ে তার কাছে বাঙলার ‘শ-কার’, ‘ব-কার’, পূজার মন্ত্র। মানুষের দেহের অঙ্গবিশেষের কথা, জৈবিক বৃত্তির কথা এমন ভাষায় ওরা উল্লেখ করে যার বঙ্গানুবাদ চলে না। সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভাল।]



॥ তেরো ॥

ডাক্তারবাবুর কাছে রঙিলার জন্মবৃত্তান্তের কথা শুনে মনে পড়ল মুনিয়াগাঁও গ্রামের সেই প্রকাণ্ড কৌয়া-ডোলের কথা। কোটা-মালকানগিরি সড়কের উপর ক্ষুদ্র গ্রাম মুনিয়াগাঁও। পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা খাড়া পাহাড়। আর তার মাথায় বিরাটাকার একটা পাচিং-স্টোন। পাঁচ-সাত শ'মন ওজন হবে হয়তো। পাহাড়ের মাথায় চড়েছে কেমন করে ভাবলে অবাক লাগে। শুধু তাই নয়, সেখানে বসে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। মুনিয়াগাঁওয়ের লোকেরা ঐ পাথরটার ভারি মজার নামকরণ করেছিল — কৌয়া-ডোল। ভাবখানা, যদি একটা কাক ঐ পাথরের উপর বসে তাহলে তার ভারে পাথরটা দুলবে। আসলে কিন্তু বিশজন লোকে ঠেলেও পাথরটাকে এতটুকু নাড়াতে পারে না। কে জানে কবে কেমন করে ঐ পাথরটা উঠে এসেছে ওখানে। কত সহস্র বছর ধরে অমনি ঝুঁকে পড়ে দেখছে নিচের দিকে, তাই বা কে বলতে পারে? এই বন্যসড়ক ধরে ত্রোতা যুগে যখন অত্রি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, স্বরভঙ্গের দল যাতায়াত করতেন তখনও কি কৌয়া-ডোল ছিল ওখানে? রাবণের অস্ত্রাঘাতে পক্ষীরাজ জটায়ু ঘুরতে ঘুরতে যে পাথরটায় আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন তারই কি আধুনিক নাম কৌয়া-ডোল?

তারপর যুগ যুগ ধরে এই পথে গিয়েছে রাক্ষসসেনা, কপিসেনা, ক্রমে চোল — হয়শোল রাজাদের সেনাবাহিনী। আজ ক'বছর ধরে ওর তলা দিয়ে যাচ্ছে ডজসুবার্ন, স্টেশন-ওয়াগন, জীপ, ট্রাক, ক্যাটারপিলার, বুলডোজার। মানব সভ্যতার উত্থান-পতনের প্রতি উদাসীন কৌয়া-ডোলের কিন্তু ধ্যান ভাঙেনি। তারপর এলাম আমি। আমার আদেশে ঠিকাদার। ছোট ছোট এক সারি তাঁবু পড়ল পথের উপর। গড়ে উঠল ছাপরা। রাস্তার বোন্ডার সাপ্লাইয়ের ঠিকা নিয়েছে ওরা। লক্ষ বৎসরের উদাসীনতায় অভ্যস্ত কৌয়া-ডোল ক্রম্বেপ করেও দেখল না আমার ঠিকাদারের দিকে। দেখল না তার হাতের লাল লেবেল-আঁটা ছোট কৌটাটির দিকে। প্রকাণ্ড ছায়া বিস্তার করে আশ্রয়দান করল আমার ঠিকাদারকে। তারপর একদিন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে থর থর করে কেঁপে উঠল পাহাড়। আর্তনাদ করে হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল কৌয়া-ডোল পাহাড়ের নিচে। সহস্রাব্দির উদাসীন স্তব্ধতা দীর্ণ করে বুক ফাটানো হাহাকার করল কৌয়া-ডোল শেষবারের মতো। ছুটে এল পাথুরে কুলির দল ধারালো গাঁইতা হাতে। আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে ফেলল কৌয়া-ডোলকে। শেষ হয়ে গেল কৌয়া-ডোলের ইতিহাস।

সভ্যজগতের প্রতি উদাসীন কারাংমেটা গাঁয়েরও সেই অবস্থা হয়েছিল প্রায় বিশ বছর আগে। দণ্ডকারণ্যের বাইরের যে জগত সে জগতে এসেছে শক-হুনদল, পাঠান-মোগল, এসেছে ইংরাজ — তাতে কারাংমেটার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। বিংশ শতাব্দীর দু-দুটো মহাযুদ্ধ তিলমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি কারাংমেটার জীবনযাত্রায়। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট তারিখটা সে গাঁয়ে সহস্রাব্দির আর যে কোন একটা দিনের মতো সূর্যোদয়ের পথ ধরে এসে সূর্যাস্তের পথে শেষ হয়েছে! এ হেন কারাংমেটায় এসে একদিন ছাউনি ফেলল একদল অদ্ভুত মানুষ।

ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বাচ্চার দল। সঙ্গে তাদের গোটা কয়েক টাট্টু ঘোড়া, ছাগল আর কুকুর। অদ্ভুত ফর্সা রঙ তাদের। নীল চোখ, পিঙ্গল চুল, টকটকে গায়ের রঙ। কোথা থেকে এল, কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। আয়েতু তখনও গাইতা হয়নি। ওর কাকা বুড়ো গাইতা রেণো তখনও জীবিত। আয়েতুর বয়স তখন বছর ত্রিশেক — বিয়ে করেছে বছর পাঁচেক — ছেলেপিলে নেই। রেণো গাঁয়ের মানুষকে সাবধান হয়ে থাকতে বললে। চুপি চুপি জানালো — এরা জিপসি, যাযাবর। পাঁচ-দশ বছর বাদে বাদে ওরা এ পথে আসে। কেন আসে, কোথায় যায় কেউ জানে না। কিন্তু ওরা এলেই গাঁয়ের মানুষের জিনিসপত্র চুরি যায়। কারাংমেটার মানুষ মুরগী, শুয়োর, গরু, মোষ সামলে রাতটা প্রায় জেগেই কাটাল। আয়েতুর বউ আখালী বলে, ওগো জান, ওদের একটা মেয়ের বাচ্চা হয়েছে, এই এ্যান্টটুকু! কী সুন্দর দেখতে তাকে।

আয়েতু বলে, দেখেছি; কিন্তু তাতে তোর কী?

আখালী লজ্জা পেয়ে বলে, না, তাই বলছিলাম।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে আয়েতুর। এতদিন বিয়ে হয়েছে ওদের— কোন সন্তান হয়নি আজও। ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই আখালী লোভাতুর দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে—সুযোগ পেলেই বুকে চেপে ধরে, চুমায় চুমায় অস্থির করে তোলে তাকে। আয়েতু অনেক পূজো দিয়েছে, অনেক মুরগী বলি দিয়েছে গুণিয়ার নির্দেশে—কিন্তু কিছুই হয়নি ফল। আখালীর তৃষিত মাতৃহৃৎ তৃপ্ত হয়নি।

সন্ধ্যাবেলায় আয়েতু বসেছিল বাড়ির সামনের আলগিতে। সামনেই উজ্জাওয়েতা উৎসব—অর্থাৎ ধানকাটার আগের রাত্রেই আহেরিয়া উৎসব। বছরের সবচেয়ে বড় শিকার অভিযান। আয়েতু বসে বসে পাথরে শান দিয়ে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল তীরের ফলা। সূর্যের আলো নিবে যাওয়ার আগে দিনের শেষ কাজগুলো সেরে নিচ্ছে আখালী। শুয়োরগুলো খোঁয়াড়ে ঢুকেছে; মুরগীগুলো খাঁচায়। বাকি আছে উঁচু মাচাং ঘরে এবার ছাগল দুটোকে তুলে দেওয়া। তাহলে নিশ্চিত। রৌদ্রে দীর্ঘ ছায়া পড়ল যেন কার — সামনের উঠানে। আয়েতু মুখ তুলে দেখে একটি জিপ্সি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। তার কোলে একটি সদ্যোজাত শিশু। মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশেক, পরনে ঘাঘরা আর উড়ানি। সীমন্তে রূপোর একটা মস্ত ঝুমঝুমি — হাতে একসার কাঁচের চুড়ি। মেয়েটি হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছে। আয়েতু বুঝতে পারে না তার ভাষা। কিন্তু ভঙ্গিটা আন্দাজ করতে পারে। একবার মুখে একবার বুকে-পেটে হাত দিয়ে সে যা বলতে চাইছে তাতে বোঝা যায়, সে ক্ষুধার্ত। আয়েতু নিঃশব্দে উঠে গেল ঘরের ভিতরে, নিয়ে এল মাণ্ডিয়া-ভরা শুকনো লাউয়ের পাত্রটা। ইঙ্গিতে আদেশ করলে মেয়েটিকে হাত পাততে। তরল খাদ্যটা সে ঢেলে দেবে। মেয়েটি রাজি হল না। না-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। নারানপুরের হাটে-বাজারে যাতায়াত ছিল আয়েতুর। সে আন্দাজ করলে মেয়েটি এ জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত নয়। এবার সে নিয়ে এল একটা পাকা পেঁপে। আশ্চর্য, তাও নিল না মেয়েটি। বারবার বাচ্চাটাকে দেখায় আর বুকে করাঘাত করে। বুঝতে পারে না, সে কী বলতে চাইছে। আখালীও বেরিয়ে এসেছিল ঘর ছেড়ে। দাঁড়িয়ে দেখছিল মেয়েটার কাণ্ড। কেমন করে কে জানে সে বুঝতে পারে মেয়েটির বক্তব্য। হঠাৎ ছুটে এসে কেড়ে নিল বাচ্চাটাকে।

দু হাতে চেপে ধরলো তাকে নিজের নগ্ন বুকে। জিপসি মেয়েটি কোন আপত্তি করল না। ক্ষুধার্ত সে নয়, ক্ষুধার্ত তার শিশুকন্যাটি। মুরিয়ার ঘরে দুধ থাকে না। গোরু ওরা পোষে, কিন্তু দুধ দোয় না। গোরু-বলদ গাড়ি টানে, ক্ষেতে লাঙল টানে, আর মাংস সরবরাহ করে। দুধ খায় বাছুরে।

আখালী বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল পাশের বাড়ি। মোড়াঙ বউয়ের কাছে। মোড়াঙ বউ সদ্যোজাত সন্তানের জননী জিপসিটিও গেল ওর পিছন পিছন। বাচ্চাটাকে দুধ খাইয়ে ফেরত দিতে হাত কাঁপছিল আখালীর।

রাত্রে ঘুমন্ত আয়েতুকে আখালী বললে, ঐ বাচ্চাটা কখনও ওর মেয়ে নয়, বুঝলে। বাচ্চাটার মা মরে গেছে।

ঘুম জড়ানো চোখ খুলেই আয়েতু বলে, কেমন করে বুঝলি ?

—কী বোকা তুমি ! যদি ওর মেয়েই হবে তবে ওর বুকে দুধ নেই কেন ?

আয়েতু বলে, তা বটে ! — পাশ ফিরে জুত করে শোয় ফের।

কিন্তু আখালীর চোখ ঘুম নেই। আবার খানিক পরে বলে, শুনছ ?

—কী —

—আচ্ছা ওর যখন মা নেই, তখন চাইলে বাচ্চাটাকে দেবে না আমায় ?

অঘোর ঘুমের মধ্যে আয়েতু বলে, তা দেবে।

—দেবে ? — উৎসাহে উঠে বসে আখালী — জাহ্নলে চল নিয়ে আসি ! এবার ঘুম ভেঙে যায় আয়েতুর। বলে, কী নিয়ে আসবি ?

—কেন — ঐ বাচ্চাটাকে। তুমি যে বললে, চাইলে দিয়ে দেবে।

আয়েতু ধমক লাগায়, দূর পাগলি ! অতটুকু বাচ্চাকে পুষবি কী করে ? ও যে এখনও বুকের দুধ খায় ! তোর বুকে কি দুধ আছে ? আর তাছাড়া—

কিন্তু সে ‘তাছাড়া’ শুনবার মতো মনের অবস্থা আখালীর নেই। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। আয়েতু বেচারি তার কী সান্ত্বনা দেবে ? ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ধীরে ধীরে। আবার কখন ঐ ভাবেই আয়েতুর বাহুবন্ধনে অতৃপ্ত বাসনা চেপে ঘুমিয়ে পড়ল আখালী।

রাত তখনও ভোর হয়নি। কুঁকড়ো ডাকেনি ভোরের ! আয়েতুকে ঠেলে তুললো আখালী, এই শোন ! বাচ্চাটা এসেছে, জানলে ! ঐ শোন আস্কালালান ঘরে বাচ্চাটা কাঁদছে।

এবার বিরক্ত বোধ করে আয়েতু। এ কী পাগলামি ; কিন্তু না, সত্যিই যেন একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্না শোনা যায় পাশের ঘরে। তারপর নিজের মনেই হেসে ফেলে আয়েতু। সেও কি আখালীর মতো পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি ? জিপসির বাচ্চা এ বাড়িতে কেমন করে আসবে ? এ নিশ্চয় মোড়াঙ বউয়ের বাচ্চার কান্না ! কিন্তু আখালীর উৎসাহে ওকে উঠতে হল।

তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। আস্কালালান ঘরটা বাড়ির পিছনে। জানলা নেই ঘরে। ছোট ঘর, একটি মাত্র দরজা। সে ঘরে পুরুষমানুষের ঢোকা বারণ। বাড়ির বয়স্ক মেয়েরা বিশেষ কারণে মাসে তিন-চার দিন মাত্র ঐ ঘরটায়

কাটিয়ে আসে। প্রতি বাড়িতেই থাকে একটা করে আস্কালোন ঘর। ঘরটার সামনে এসে ওরা দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আশ্চর্য, ঘরের ভিতর থেকে সত্যিই একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্না শোনা যায়। অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গেল আখালী, বঞ্চিতা বঙ্ক্যা নারী — ফিরে এল মুহূর্তে সন্তান ক্রোড়ে, তৃপ্ত মাতৃত্বের পরিপূর্ণ হাসিটি মুখে ফুটিয়ে।

দিনের আলো ফুটলে দেখা গেল জিপ্সির দল যেখানে তাঁবু গড়েছিল সেখানে জনপ্রাণী নেই।

কৌয়া-ডোল পাথরটা যেমন উদাসীন দৃষ্টি মেলে দেখেছিল আমার ঠিকাদারের ছোট্ট ডিনামাইটের কৌটাটাকে, তেমনি উপেক্ষা ভরে আয়েতু সেদিন দেখেছিল জিপ্সির পরিত্যক্ত শিশুকন্যাটিকে। আন্দাজ করতে পারেনি, বিষকন্যার বিস্ফোরণী শক্তি।

আখালী ওকে বুকে করে মানুষ করতে থাকে — সাত রাজার ধন মানিক এসেছে সংসারে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি — যদিও সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা মুরিয়া সমাজে স্বীকৃত তাতে ওকে সুন্দরী বলা চলে না আদৌ। আখালী ওর নাম রাখল রঙিলা!

জিপসি মেয়েটি মানুষ হল মুরিয়া পরিবারে। ওরা কেউ জানতো না, রঙিলা : বিষকন্যা!

রঙিলার যখন তিন বছর বয়স তখন আখালীর কোলে এল তার প্রথম এবং একমাত্র সন্তান — মাল্‌কো। সাদা আর কালো দুটি সন্তানকে মানুষ করতে থাকে আখালী। ক্রমে মেয়ে দুটি বড় হয়ে ওঠে! আর ঘরে রাখা যায় না। আখালী ওদের একে একে ঘটুলে পাঠালো। সারাদিন মায়ের হাতে হাতে কাজ করে দুই বোন — তারপর সঙ্ক্যায় চলে যায় ঘটুলে — ফেরে ভোরবেলা।

রঙিলাকে মেনে নিল কারাংমেটার সমাজ, কিন্তু কারাংমেটার ঘটুলে ক্রমশ বৃদ্ধিতে শিখল রঙিলা—পুরোপুরি তাকে গ্রহণ করেনি কেউ।

কাবোঙ্গা থেকে পুঙ্কার মিছানা আসার পর অদ্ভুত পরিবর্তন হল যেন রঙিলার। কিদারি পাখির হালকা পালকের মতো মন নিয়ে রঙিলা যেন নেচে বেড়ায় সারা পাড়া। কারাংমেটার কোন চেলিক তার মূল্য বোঝেনি, এজন্য দুরন্ত ক্ষোভ ছিল রঙিলার। ঘটুলে তার প্রেমিক ছিল না, জীবনে একটিও কাঁকুই উপহার পায়নি সে, এজন্যে মরমে মরে ছিল এতদিন। আজ তার দিন আসছে। কাবোঙ্গা গায়ের কোণ্ডা সর্দারের ছেলে চ্যন শিরদার তার মূল্য বুঝেছে। তোমরা দেখে নাও, যাকে তোমাদের নজরে পড়েনি — তারই জন্যে ভিনগাঁয়ের সেরা ছেলে লামহাদা খাটতে আসছে। রাজপুত্রের মতো তার চেহারা, স্বয়ং লিঙ্গোপেনের মতো সুদর্শন। খবরটা রটে গেল মুখে মুখে। চ্যনকে অনেকেই দেখেছে। ঘটুলের সবাই তাকে চেনে। চোখে পড়বার মতো ছেলেই সে। রঙিলাকে সবাই ঠাট্টা করে, মশকরা করে। রঙিলা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে তা। কখনও ছদ্ম তাড়না করে বান্ধবীদের, কখনও হেসে স্বীকার করে নেয়। উশীর পাখি যেমন জোড়া পায়ে নেচে বেড়ায়, রঙিলার ভাবখানাও তেমনি। কারাংমেটার ঘটুলে সাড়া পড়ে গেছে। চ্যন-শিরদার এ গাঁয়ে লামহাদা খাটতে এলে এ ঘটুলের সভ্য হতে হবে তাকে। কারাংমেটায় নয়া-ঘটুল, জোড়িদার ঘটুল নয়।

অর্থাৎ প্রতি তিন দিন অন্তর এখানে জোড় ভাঙে, জোড় গড়ে। কারাংমেটায় সব মোটিয়ারীর মুখেই তাই হাসি ফুটেছে।

আর ঠিক সেই কারণেই মরমে মরমে মরে আছে মাল্কো। চয়নকে আর একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে তার কী আকুলতাই না ছিল! এ এক মাসে সে যে কতবার জোড়ি-মায়ের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে তা সেই জানে। সেই চয়নই এ ঘটুলের সভ্য হতে চলেছে। এ খবরে কোথায় মাল্কোর অন্তরাত্মা ধুশীরের তারের মত রিমঝিম করে বেজে উঠবে, না তার কান্না আসছে বুক ফেটে। ছি ছি ছি! এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়? এই যদি চয়নের মনে ছিল তা হলে সে রাত্রে কেন সে অমন মিথ্যার কুহক সৃষ্টি করেছিল?

কিন্তু! না, মাল্কো অন্যায় কথা ভাবছে। চয়ন তো কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। মাল্কোকে সে বুক টেনে নিয়েছিল, আদর সোহাগ করেছিল, — কিন্তু কই একবারও তো সে বলেনি মাল্কোকে সে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। একথা যে মাল্কোর স্বপ্নের অগোচর। এ স্বপ্ন তো সে দেখেনি। মাল্কোও মুখ ফুটে বলেনি কোন কথা! চয়নকে দেখেই কী জানি কেন তার বুকের মধ্যে দুলে উঠেছিল। অরণ্যচারী পাহাড়ি মেয়েটির যৌবন হঠাৎ চিত্রকোট জলপ্রপাতের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চেয়েছিল ওর তারুণ্যের পায়ে। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার উদগ্র বাসনা জেগেছিল মনে। কিন্তু সে কথাও তো লাজুক মেয়েটা মুখ ফুটে বলেনি। চয়নও কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি সে রাত্রে। তাহলে মাল্কো এতটা মর্মান্বিত হল কেন? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। তবু কেন জানি মাল্কোর মনে হয়েছিল চয়নের ব্যবহারে একটা আন্তরিকতা ছিল — সাধারণ চেলিকের মতো তার আলিঙ্গন শুধু জৈবপ্রেরণার বশে নয়। নিজের অজান্তেই মাল্কো কিছু একটা আশা করে বসেছিল নিশ্চয়।

পাহাড়ি মেয়েরা এমন ক্ষেত্রে যা করে থাকে মাল্কো সে পথে গেল না। রঙিলার গাত্রবর্ণ যদি হয় মুরিয়া-ঘরের ব্যতিক্রম — চয়নের উদাসীনতা যদি হয় অ-সাধারণ, তাহলে মাল্কোও পাহাড়ি মেয়ে হিসাবে একটু অন্য জাতের — প্রতিহিংসার কথা তার মনের কোণে জাগেনি। কোথায় মুখখানা লুকাবে সেই চিন্তাতেই লাজুক মেয়েটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

চয়ন আসছে। পাশের গাঁয়ের ঘটুলের সে শিরদার — রাজা। তাকে এখানেও উপযুক্ত একটা পদমর্যাদা দিতে হয়। কারাংমেটার কোতোয়ার সম্প্রতি বিয়ে করেছে। কোতোয়ারের পদ শূন্য। সুতরাং স্থির হল চয়ন এ গাঁয়ে এলে তাকেই করা হবে কারাংমেটার কোতোয়ার। আপত্তি করল রঙিলা নিজেই। কোতোয়ারের কাজ হচ্ছে মোটিয়ারীদের দেখ-ভাল্ করা। ফলে বেলোসা আর কোতোয়ারকে ক্রমাগত আলাপ-অলোচনা পরামর্শ করতে হয়। মুরিয়া সমাজের নিয়ম অনুযায়ী ভাবী বধু তার লামহাদার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তাই রঙিলা বললে — চয়ন কোতোয়ার হলে আমাকে তোমরা নিষ্কৃতি দাও।

শিরদার বলে, তা যেন দিলাম, কিন্তু বেলোসা হবে কে?

রঙিলা মুখ টিপে বলে, কেন মাল্কো! তার সঙ্গে চয়নের খুব ডাব যে!

—তাই নাকি, তাই নাকি ? তা তো জানতাম না ! তাই নাকি রে মাল্কো ?

মাল্কোর মনে হল তার বেদনার স্থানটা ইচ্ছে করেই মাড়িয়ে দিয়েছে দিদি। কোন জবাব দিল না। উঠে চলে গেল বাইরে। হেসে উঠল সবাই, আর সবচেয়ে বেশী হাসল রঙিলা-বেলোসা !

চয়ন কারাংমেটায় এসে পৌঁছালো বিকালে। প্রথমেই সে গিয়েছিল আয়েতুর বাড়ি। খবর পেয়ে ঘটুল থেকে দল বেঁধে এল চেলিকেরা। চয়নকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘটুলে নিয়ে যাবে। ওদের ঘটুলের মর্যাদা বৃদ্ধি হল আজ। চয়ন বিখ্যাত তীরন্দাজ, নির্ভীক শিকারী। তার আগমন উপলক্ষে আজ ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে ঘটুলে।

চয়নকে নিয়ে চেলিকের দল যখন ঘটুলে এসে পৌঁছালো তখনও সন্ধ্যা লাগেনি। শুধু কামদার বেলদার এসে ঝাঁটপাট দেওয়ার ব্যবস্থাপনা দেখে গেছে। ওরা এসে বসল গোল হয়ে। বাচ্চা ছেলের দল, যারা এখনও ‘ঘটুল-নাম’ পায়নি, তারা একে একে আসছে এক-এক টুকরো কাঠ হাতে নিয়ে। শুকনো কাঠখানা শিলেদার অথবা কাজাঞ্চিকে দেখিয়ে জমা দিচ্ছে ভাঁড়ারে। তারপর ফিরে এসে হাত তুলে জোহার করছে সবাইকে, জোহার শিরদার, জোহার বেলদার, জোহার কোতোয়ার....

শিরদার একবার চারদিক ঘুরে দেখে এল। কোথাও কারও কর্তব্যে কোন শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায় কি না। তারপর সেও এসে বসে পড়ে চয়নের পাশে। এই সময় হঠাৎ দল বেঁধে হুড়মুড় করে ঘটুলে ঢোকে মোটিয়ারীর দল। চয়ন আড়চোখে একবার দেখে নেয়। এতক্ষণ তারা অপেক্ষা করছিল গ্রামদেবী জোড়িমাইয়ের ছাপরার কাছে। ওরা কখনও একা একা আসে না। অনেকগুলি মেয়ে আগে মন্দিরের কাছে জড়ো হয় — সেখানে চলে কিছুক্ষণ ফিসির ফিসির। তারপর দল বেঁধে ঘটুলে আসে হুড়মুড়িয়ে। আজ ওদের দেবী হবার আরও কারণ আছে। চয়নের কী কী পরীক্ষা নেওয়া হবে তারই পরামর্শ আটাইছিল এতক্ষণ।

ঘটুলে কোন নতুন চেলিক এলে তাকে সহ্যশক্তির পরীক্ষা দিতে হয়। মোটিয়ারীরা যখন চুল আঁচড়ে দেয় তখন চিরুণীটা মাথার খুলিটাকেও আঁচড়ে তুলে ফেলার উপক্রম করে। যখন গা-হাত টিপে দেয় তখন নখ বসিয়ে দেয় চামড়ায়। এসব পরীক্ষায় যদি নির্বিকার থাকতে পারে নতুন চেলিক তবেই তো সে জাতে উঠবে !

মেয়েরা বসে পড়ল এখানে-ওখানে, কেউ ছেলেদের কাছে, কেউ একা মেয়েদের ছোট দলে। এবার শুরু হল কাজের কথা। শিরদার বললে, সবাই এসেছে ?

শিরদারের গুন্তি শেষ হয়েছিল, বললে, দুজন মোটিয়ারী আসেনি।

—বেলোসা কী বলছে ? কেন আসেনি ওরা দুজন ?

—বেলোসা নিজেই আসেনি। আর আসেনি মাল্কো।

—হুম ? — গভীর হয়ে যায় শিরদার। তারপর নিম্নকণ্ঠে চয়নকে বলে, এই হয়েছে এক মহা মুশ্কিল। আমাদের ঘটুলের কোতোয়ার মাস-দুয়েক আগে বিয়ে করে ইস্তফা দিয়েছে। আর আমাদের বেলোসাও কারও শাসন মানে না। ফলে মোটিয়ারীদের ঠিকমতো দেখ-ভাল হচ্ছে না। ভাবছি তোমাকে আমাদের কোতোয়ার করব। আপত্তি নেই তো ?

চয়ন বললে, না আপত্তি কিসের, সবাই যদি চায় —

—তা তো বটেই। সবাইকার মত নিয়েই এটা স্থির করেছি আমরা। তারপর শিলেদারকে হুকুম করে, দুজন মোটিয়ারীকে পাঠিয়ে দাও। ডেকে নিয়ে আসুক বেলোসা আর মাল্কোকে। যদি আস্কালোনে থাকে তবে অন্য কথা — না হলে বলবে আমার হুকুম। না এলে শাস্তি পাবে।

মনে আছে এখানেই ডাক্তারবাবুকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু শিরদার কি বেলোসাকে শাস্তি দিতে পারে ?

ডাক্তারবাবু বলে, শুধু শিরদার কেন, ঘটুলের নিয়ম না মেনে চললে ঘটুলের তরফ থেকে অন্য কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারে। একমাত্র শিরদারকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হয় না। ঘটুলের আইন-কানুন কতদূর অমোঘ হতে পারে তার একটা উদাহরণ দিই। সত্য ঘটনা। মার্শোরা ঘটুলের কথা। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাস। ঘটুলের বড় বড় ছেলেরা সবাই ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত। ফসল ঘরে না ওঠা পর্যন্ত রাত্রে ওদের মাঠে পাহারা দিতে হয়। ক্ষেতের মাঝখানে উঁচু মাচাও বানায়। ওরা বলে ‘কেতুল’। তার উপর বসে গোগা ঢোল পিটে অথবা পিটার্কো বাজিয়ে বুনো শুষোর তাড়ায়। সুতরাং বয়স্ক চলিকেরা আর কেউ ঘটুলে আসছে না। মোটিয়ারীদের মধ্যে পাঁচজন ছিল বয়সে বেশ বড়। পূর্ণ যুবতী। আঠারো-বিশের কোঠায়। বেলোসা, তিলোকা, পিওসা, জানকি আর আলোসা। তরুণ চলিকদের কেউ ঘটুলে আসছে না — ওদের পাঁচজনের কাছে ঘটুলের সাক্ষ্য-আসরকে মনে হল লবণহীন বাণ্ডিয়ার মতো বিশ্বাস। শিরদার ঘটুলের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল চালানের উপর। পদমর্যাদায় সে শিরদার, কোতোয়ার, শিলেদার, এমনকি কাজাঞ্চিরও নিচে। ছেলেটির বয়স অল্প — বছর বারো। অবশ্য বড় ছেলেদের অনুপস্থিতিতে বাকি যে বালখিল্যদল ঘটুলে আসছে তাদের মধ্যে সেই ছিল বয়োঃজ্যেষ্ঠ। বেলোসা-তিলোকাকার দল নিজেদের মধ্যে গোপনে পরামর্শ আঁটল। ওরা চালানকে খবর পাঠালো যে তাদেরও ক্ষেতে যেতে হচ্ছে। রাত্রে সেখানেই থাকতে হচ্ছে। তাই তারা ঘটুলে আসতে পারবে না কদিন। অনেক পরিবারে বয়স্ক ছেলে না থাকলে বড় মেয়েরাও ক্ষেতে পাহারা দিতে যায়, তাই এদের কোন সন্দেহ হয়নি প্রথমটায়। কিন্তু ঘটুলের পুঁচকে সিপাহীর সন্দেহ জাগলো। বছর-দশেক বয়স তার। সন্ধান নিয়ে এসে চালানকে বললে, ওরা মোটেই পাহারা দিতে মাঠে যায় না। বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমায়।

অপরাধ গুরুতর। আত্মসম্মানে আঘাত লাগল বালখিল্য বাহিনীর। সাত থেকে বারো বছরের ঘটুল-সভ্যদের অপমান বোধ হল। চালান দুটি বাচ্চাকে পাঠালো মেয়েদের ত্রেপ্তার করে আনতে। সে দুটি সেপাইয়ের তখন ল্যাণ্ডট আঁটার বয়সও হয়নি। বেলোসা হচ্ছে ঘটুলের রানী, সে হাঁকিয়ে দিল বাচ্চা দুটোকে, বললে, বেশ করেছি, মিথ্যা কথা বলেছি। তোদের চালানকে বল, যতদিন না তোদের দাদারা মাঠ থেকে ফেরে, আমরা ঘটুলে যাব না।

চালান মাঠে খবর পাঠাল স্বয়ং শিরদারকে। শিরদার এল না, কিন্তু বলে পাঠালো, ঘটুলের দায়িত্ব তোমাদের উপর দিয়ে এসেছি, যদি কেউ অন্যায় করে তার শাস্তির

ব্যবস্থা তোমরাই করবে।

খবরটা পৌঁচাল বেলোসা-তিলকার কানে। ভয় পেল তারা। পরদিন সন্ধ্যায় গুটি গুটি হাজিরা দিল ঘটুলে। কিন্তু তাদের ঢুকতে দিল না সেই বাচ্চা ছেলেটি—দ্বাদশবর্ষীয় চালান। বললে তোমরা ঘটুলের ভিতরে এস না, বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। আগে সবাই আসুক, তোমাদের বিচার হবে।

ষোড়শী-অষ্টাদশীর দল বাইরে দাঁড়িয়ে রইল — শীতের রাত্রে।

বিচারে বালখিল্য বাহিনী স্থির করল — কান ধরে ওদের দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকতে হবে। শাস্তির মেয়াদ দুই ‘রেলো’।

রায় শুনে কেঁদে ফেললে বেলোসা। সে হচ্ছে ঘটুলের মক্ষিরানী — সবার সামনে তাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে কান ধরে বসে থাকতে হবে! ক্ষমা চাইলো জোড় হাতে। কিন্তু বিচারক নড়লেও বিচার নড়ে না। অগত্যা যুবতীর দল দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসল কান ধরে। আর ন্যাংটা ছেলের দল নেচে চলে দুই প্রস্তু রেলো রেলো নাচ!

মনে আছে উপসংহারের ডাক্তার পিল্লাই বলেছিলেন, এঞ্জিনিয়ার-সাহেব, সংবিধান আমাদেরও অনেক মৌলিক অধিকার দিয়েছে। সে অধিকার যারা ক্ষমতার দণ্ডে বুটের তলায় মাড়িয়ে যায় তাদের নিকটতম ল্যাম্পপোস্ট না হ’ক ফাঁসি-কাঠে ঝোলানোর বিধান আছে আপনাদের সভ্য জগতের আইনে — কিন্তু স্বৈচ্ছাচারী এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দর্প জুডিসিয়ারির কাছে এমনভাবে চূর্ণ হতে সেখানে দেখেছেন কোনদিন?

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। বলি, কিন্তু মাল্কো আর রঙিলা কি এখনও ঘটুলে ফিরে আসেনি?

ডাক্তারবাবু চটে ওঠেন, আপনি তো বেশ লোক মশাই। নানান ফ্যাকড়া তুলে গল্পে বাধা দেবেন — যেই আমি অন্য প্রসঙ্গে আসব অমনি ধমক লাগাবেন?

আমি নিরীহের মতো বলি, সে কী কথা? ধমকে দেব কেন? আমি শুধু বলতে চাইছি কারাংমেটা ঘটুলে এতক্ষণ বোধহয় মাল্কো আর রঙিলা পৌঁছে গেছে।

—না, পৌঁছায়নি। — প্রতিবাদ করেন ডাক্তারবাবু, তার আগেই অন্য দিকে মোড় ঘুড়ল ঘটনাচক্র। ওরা সবাই মিলে অপেক্ষা করছে। রাত্রে ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাল্কো আর রঙিলা এলেই সান্ধ্যআসর শুরু হবে। শিরদার চয়নকে বলে, আমরা ঠিক করেছি মাল্কোকে এবার বেলোসা করে দেব।

চয়ন অবাক হয়ে বলে, কেন? রঙিলা কী দোষ করল?

শিরদার হেসে বলে, রঙিলা বেলোসা থাকলে তোমাকে কোতোয়ার করব কেমন করে!

চয়ন আরও অবাক হয়ে বলে, কেন তাতে কী অসুবিধা?

ওরা হেসে ওঠে একসাথে।

শিরদার বললে, কী বোকা হে তুমি! তুমি কোতোয়ার হলে রঙিলা কখনও বেলোসা থাকতে পারে?

—কেন পারে না তাই তো জিজ্ঞাসা করছি এতক্ষণ।

—সে যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তুমি যে তার লামহাদা।

অনেকক্ষণ বাক্য-স্মৃতি হয়নি চয়নের। তারপর বলে, কে বললে?

—কে আবার বলবে। সবাই বলছে। গাইতা নিজেই বলেছে। আর তাই যদি না হবে তাহলে তুমি কাবোঙ্গা থেকে এলে কেন?

চয়ন বুঝতে পারে কোথাও একটা প্রচণ্ড ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সে বলে, তোমাদের রঙিলা বেলোসা কি আয়েতু গাইতার মেয়ে?

—তুমি জানতে না?

—আর মাল্কো? মাল্কো কার মেয়ে।

—মাল্কো বেলোসার ছোট বোন। আয়েতুরই ছোট মেয়ে।

চয়ন উঠে পড়ে। বলে, দাঁড়াও শুধিয়ে আসি গাইতাকে।

তখনই বেরিয়ে পড়ে সে। একটু পরেই রঙিলা আর মাল্কোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে দুজন মোটিয়ারী। কিন্তু চয়ন আর ফেরে না। রাত বাড়তে থাকে। ব্যাপার কী? তার পর পাঁচ ‘রেলো’ কেটে গেছে মনে লাগে। (এক দফা ‘রেলো রেলো’ নাচে মিনিট পনের সময় লাগে। সময়ের মাপকাঠিও ওদের নাচের ছন্দে বাঁধা।) চিন্তিত হল শিরদার। এত দেরী হচ্ছে কেন? শেষে ওরা ক’জনে নিজেরাই খোঁজ নিতে গেল আয়েতুর কাছে। আয়েতু বলে, হ্যাঁ চয়ন এসেছিল তো, কথাবার্তা বলে আবার ঘটলেই ফিরে গেল। সে তো অনেকক্ষণ!

—ঘটলে ফিরে গেছে! কই না তো!

খোঁজ খোঁজ। ছোট্ট গ্রাম কারাংমেটা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা গাঁয়ের সব কটা ঘরই খোঁজা শেষ হয়ে গেল। নেই, কোথাও নেই চয়ন! কোথায় গেল একটা জলজ্যান্ত মানুষ? চিতাবাঘে ধরল না তো? বহু রাত্রি পর্যন্ত ওরা খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। মশাল ছেলে আয়েতুও বের হল সন্ধানে। ভিনগাঁয়ের ছেলেটা প্রথম রাত্রেই গেল বাঘের পেটে! এই ছিল বড়া-দেওয়ার মনে?

রঙিলা আর মাল্কো দুজনেই স্তব্ধ। কারাংমেটা গাঁয়ের কেউ আর সে রাত্রে ঘুমালো না। নিশ্চয় বাঘে খেয়েছে ছেলেটাকে! রাত্রি প্রভাত হল দেখা যাবে, তার রক্তাক্ত মৃতদেহ গাঁয়ের প্রান্তে পড়ে আছে কোন ঝোপের ধারে। কী জবাবদিহি করবে আয়েতু — যখন কাবোঙ্গা থেকে কোণ্ডা আসবে খবর পেয়ে?

রাত্রি প্রভাত হল। দিনের আলোয় আবার নতুন খোঁজার পালা শুরু হয়। আশ্চর্য, মানুষটা যেন হাওয়ায় উবে গেছে। বাঘে খেলে রক্তের দাগ তো দেখতে পাওয়া যেত — তাও পাওয়া গেল না কোথাও।

সন্ধ্যার দিকে সন্দেশের নিরসন হল। কাবোঙ্গা থেকে এল কোণ্ডা আর গাদরু। তাদের দেখে মুখ শুকিয়ে গেল আয়েতুর। কিন্তু তাদের কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে শেষ পর্যন্ত।

ক্ষমা চাইতে এসেছে ওরা। রঙিলা নয়, মাল্কোর জন্যে লামহাদা খাটতে চায় চয়ন।

আয়েতু বলে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার ছেলে কোথায় ?

—পাগলাটে ছেলে। ভুলটা বুঝতে পেরেই সে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয় কাবোঙ্গার দিকে। রাত যখন ‘ভঁয়ষা হিকং’ — মোষের মতো কালো, তখন সে গিয়ে পৌঁছায় কাবোঙ্গাতে। মাঝরাতে আমরা তো তাজ্জব।

আয়েতু বলে, পাগলাটে নয়, বন্ধ উন্মাদ তোমার ছেলে! এদিকে আমরা তো ভেবে সারা। একটা মানুষ একা এমনভাবে রাতের বেলা জঙ্গল পাড়ি দেবে তা কী করে আন্দাজ করব ? পথে যদি বাঘ-ভালুকের দেখা পেত ?

পুত্রগর্বে গভীর কোণ্ডা বলে, তাহলে বাড়ি পৌঁছাতো ভঁয়ষা হিকতে নয়, সেই যার নাম ‘ককুসানা-পোহার’। জানোয়ারটা মেরে তো আর জঙ্গলে ফেলে রেখে যেত না — টানতে টানতে নিয়ে যেত কাবোঙ্গায় !

আবার খানাপিনার আসর বসল। আয়েতু এ নতুন প্রস্তাবেও রাজি। রঙিলাই হোক আর মাল্‌কোই হোক এমন ছেলেকে জামাই করতেই হবে। আপত্তি হল কিরিংগোর। ব্যবস্থাটা বুড়ি কিরিংগোর পছন্দ হয়নি, বললে — রঙিলাই হোক ‘আকোইন’, — বড় বোন, তার বিয়ে না দিয়ে মাল্‌কোর বিয়ে দিবি কিরে ?

আয়েতু চুপি চুপি পিসিকে বলে, সেটাই তো হবে অজুহাত। রঙিলার বিয়ে ঠিক না হলে তো আর মাল্‌কোর বিয়ে দিতে পারিনা। সুতরাং ছেলেটা বছরের পর বছর লামহাদা খাটবে আমার ক্ষেতে। বিয়ের কথা তুললেই বলব — আগে রঙিলার বিয়েটা হ’য়ে যাক্।

কিরিংগো পিচুটি ভরা চোখ দুটো পিট পিট করে বলে, তাই বল ! তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি !

মাল্‌কোর মা আখালী বলে, কিন্তু রঙিলার কথাটা ভেবে দেখেছ কী ? সে কেমন করে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাবে ?

আয়েতু বিরক্ত হয়ে বলে, যেমন করে আর পাঁচজনে মুখ দেখায়। ভুল ভুলই। আর রঙিলার সঙ্গে তো ওরগীর্দা-আতোর হয়নি, হয়েছে মাল্‌কোর সঙ্গে।

আখালী বলে, তুমি কেমন করে জানলে ?

—আমাকে জানতে হয়। আমি হচ্ছি গাঁয়ের গাইতো। সব খবর জানতে-হয় আমাকে। রঙিলার সঙ্গে আতোর হয়েছিল ওদের কোতোয়ারের।

মাল্‌কোর মায়ের কেমন যেন সব গুলিয়ে যায় — তো কেমন করে হবে ? তাহলে রঙিলার মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন ?

আয়েতু তাকে সান্ত্বনা দেয়, রঙিলার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলছি। দেখ না তুই !



॥ চোদ্দ ॥

যে নিষ্ঠাভরে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন দেবশিশু কচ তেমনি একনিষ্ঠ আন্তরিকতায় চয়ন খাটতে থাকে আয়েতুর খামারে ! সেই কুঁকড়ো-ডাকা ভোরে উঠে বেরিয়ে যায় মাঠে, বলদ জোড়া নিয়ে। লেগে যায় ক্ষেতের কাজে। লাঙল দেয়, বীজ ছড়ায়, নাড়া তুলে ফেলে, মই দেয়। ধান কাটে। আয়েতু যখন মাঠে আসে ততক্ষণে সূর্যদেব উঠে পড়েন তেঁতুল-গাছের মাথায়। এতদিন আয়েতু নিজেই সব কাজ করত। ওদের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা আমাদের মতো নয়। ও দেশে ভাগচাষী নেই, মজুর-চাষী নেই। জমির অভাব কী ? ফলে, লাঙল যার জমি তার। তাই দিনমজুর পাওয়া ভার। এতদিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে বুড়ো। সব কাজের দায়িত্ব এখন চয়নের ঘাড়ে। জওয়া-উণানায়, অর্থাৎ জল-খাবার বেলায় ওর জন্যে শুকনো লাউয়ের খোলায় জওয়া অথবা মাণ্ডিয়া নিয়ে মাঠে আসে — না মাল্কো নয়, রঙিলা। মাল্কোর সঙ্গে চয়নের সাক্ষাৎই হয় না। এ গাঁয়ে এসে পর্যন্ত একটি লহমার জন্যও সে সাক্ষাৎ পায়নি মাল্কোর। এ দিক থেকে দেবশিশু কচের সাধনাকে সে শ্রদ্ধা করে দিয়েছে। সে শুধু দূর থেকে দেখেছে মাল্কোর ছায়া, নেপথ্য থেকে শুনেছে তার কণ্ঠস্বর। লামহাদার সঙ্গে তার ভাবী পত্নীর দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া, কথাবার্তা বলা নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাতে সমাজে বদনাম হয়। ঘটুলের ভিতরে বা বাইরে ভাবী বধূ লামহাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে না, তাকে জোহার পর্যন্ত করতে পারে না। আইন তাই বলে বটে কিন্তু ব্যতিক্রমটাই এ ক্ষেত্রে আইন। জীবনযাত্রার নানান প্রয়োজনে একই গৃহবাসী দুটি মানুষের প্রতিদিন বারেবারে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়। আর সে সাক্ষাৎ যে প্রতিবারেই তৃতীয় ব্যক্তির সামনে হবে এমন কথা স্বীকার করে নিলে অতনুর মহিমা থাকে কোথায় ? লামহাদার পক্ষে কাজের মরুভূমিতে ঐ তো একটিমাত্র মরুদ্যান। ভাবী পত্নীর পক্ষেও লামহাদার প্রতি অনুকম্পা জাগা স্বাভাবিক। যে মানুষটি ভিন-গাঁ থেকে এসেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার জীবন-যৌবনের মূল্য মেটাচ্ছে, তার প্রতি অনুকম্পা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধুই কি অনুকম্পা ? নিশ্চয়ই নয়। সচরাচর মেয়ের মা সামাজিক বিধি-নিষেধের কথাটা মাঝে মাঝে ভুলে যায়, অন্তত ভুলে গেছে বলে ভান করে। আহা ছেলেটি উদয়াস্ত খাটছে ওর সংসারে — দিনান্তের একটিমাত্র মুহূর্ত যদি ওর ক্ষণিক মাধুর্যে ভরে ওঠে তবে তাতে কার ক্ষতি ? শুধু লক্ষ্য রাখে যেন গোপন সাক্ষাৎকালে ওরা বাড়াবাড়ি না করে।

চয়নের দুর্ভাগ্য। ব্যতিক্রমটা তার ক্ষেত্রে নিয়ম হল না, হল ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রমটাই। মুরিয়া সমাজের আইনের মর্যাদা ঠিক মতো রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা দেখে নেবার জন্য যেন উঠে পড়ে লাগল রঙিলা। বাঘিনীর মতো পিঙ্গল চোখ তার। সেই দুটি চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত। কুঠার হাতে থাকলে যে চয়ন চিতাবাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পায়না, কারাংমেটা থেকে নিশাসমাগমে যে একা জঙ্গলের পথে রওনা হতে পারে সেই তারুণ্যের মূর্ত-প্রতীক চয়ন-সদার পর্যন্ত কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, ঐ পিঙ্গলনয়না মেয়েটির সান্নিধ্যে। রঙিলা যেন কোন মায়াবী, যেন

মদ্রতন্ত্রের অধিকারিণী ডাইনী সে। মাল্কোকে সে দিবারাত্রি আগলে রাখে। মাল্কো এমনিতেই লাজুক, তারপর রঙিলার প্রতিবন্ধকতায় মাল্কোর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায়না চয়ন। মাঝে মাঝে একবার চকিত দৃষ্টিপাত ভিন্ন নগদ কিছুই পায়নি বেচারি। কিন্তু সেই ক্ষণিক চাহনিতেই অনুভব করেছে মাল্কোর মমোভাব। সে দৃষ্টি প্রেমে উজ্জ্বল, মমতায় কোমল। আখালী মাঝে মাঝে সুযোগের সৃষ্টি করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সতর্ক-প্রহরী রঙিলার চোখ এড়িয়ে কিছুই হবার উপায় নেই। অনাচার সে সইবে না কিছুতেই। ‘জওয়া-উগুনা’র দায়িত্ব সেজন্য রঙিলা নিজেই গ্রহণ করেছে।

‘জওয়া-উগুনা’র ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। আমাদের গ্রাম্য জীবনেও এ নাটিকার অভিনয় হয়ে থাকে। আমাদের দেশের চাষীভাইও মাঠে যায় সেই কাক-ডাকা ভোরে। দেড় প্রহর বেলায় কৃষকবধু আসে মাঠে। গামছা দিয়ে মাথা-মুখ মুছে গাছতলায় একটু জিরিয়ে নিতে বসে কৃষক। চাষীবধু সযত্নে খাবারের পুঁটলির মুখ খুলে বার করতে থাকে খাবার। চাষীভাই ততক্ষণে পুকুরের জলে মুখ-হাত ধুয়ে এসে বসে। ঘুঘুর একটানা ঐকতানে তাপদগ্ধ পৃথিবীর দেহটা কেঁপে কেঁপে ওঠে কিসের শিহরনে। কৃষক জীবনের এই মধ্যাহ্ন-নাটকের বিষয়বস্তু যে শুধু জান্তব আহার তা হলফ করে বলতে পারিনা। ওরই ফাঁকে ফাঁকে চলে দাম্পত্য বিশ্রান্তালাপ। মুড়কির মিষ্টরসেও যদি চাষীভাইয়ের পরিতৃপ্তি না হয়, জনবিরল আনের আড়ালে হঠাৎ যদি এক চুমুক মিষ্টতর মধুর সন্ধানে উন্মুখ হয়ে পড়ে — তবে দোষ দেব কাকে? আর তাতে যদি কৃষকবধু চারিদিকে ভীত-চকিত দৃষ্টিপাত করে আঁচল সামলে উঠে পড়ে বলে, ‘এমন করলে কাল থিকে আমি আসবনি বাপু, পুঁটিরে খাবার দে’ পাইঠে দেবনে!’ — তাহলে সেটাকে নাটকের পালাবদল বলতে পারি না।

মুরিয়া কৃষকের জীবনেও ‘জওয়া উগুনা’র সময়টা অমনি মাধুর্যরসে ভরা। কৃষকের বধু অথবা চেলিকের মোটিয়ারী লাউয়ের শুকনো খোলায় নিয়ে আসে ‘জওয়া’ কিংবা ‘ঘাটো’ অথবা ‘মাণ্ডিয়া’। তরল-ভাত। বিরল-পত্র বাবলাগাছের ছায়ায় মধুর রসের পরিবেশন ঘটে। সচরাচর লামহাদার জীবনে এই মুহূর্তটিই সবচেয়ে মধুর। ভাবী শাশুড়ীর এই এক অজুহাত। বাড়িতে আর কে আছে যে খাবার নিয়ে যাবে? চয়নের ক্ষেত্রে এখানেও ব্যতিক্রম। ওর জওয়া নিয়ে আসে রঙিলা। মাল্কো নয়।

চয়নও প্রতিশোধ নিয়েছে। মুরিয়া সমাজ শুধু লামহাদা আর ভাবী বধুর সম্পর্কেই বিধিনিষেধের বেড়া তোলেনি। স্ত্রীর বড় বোনের সঙ্গেও, অর্থাৎ ‘আকোইনের’ সঙ্গেও সম্পর্কটা নিষেধের। স্ত্রীর ছোট বোনের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি চলতে পারে — বড় বোনের সঙ্গে চলে না। আমাদের সমাজে যেমন বৌদির সঙ্গে একটা কৌতুকের সম্বন্ধ পাতানো চলে, ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে কথাবাতাই প্রায় বলা চলে না, ওদেরও এক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা ঐ রকম। স্ত্রীর বড় বোনের সঙ্গে অর্থাৎ আকোইনের সঙ্গে ওদের ‘মুরিয়াল নেহানা’, অর্থাৎ ‘নিষেধের সম্বন্ধ’ — ভাণ্ডুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক। অবশ্য আকোইনের সঙ্গে কথা বলায় আপত্তি নেই — তাকে স্পর্শ করা বারণ। তাছাড়া বিয়ে হলে তবেই এসব বিধিনিষেধ প্রযোজ্য, তার আগে নয়। কিন্তু চয়ন অতি কর্তব্যভাবে এ নিয়ম মানতে শুরু করল — বিয়ের আগেই। রঙিলার সঙ্গে বাক্যালাপও

বন্ধ করে দিল ঐ অজুহাতে। সে লক্ষ্য করেছে, রঙিলার চোখ দুটো ওর উপর পড়লেই জ্বলতে থাকে।

আগেই বলেছি কারাংমেটা ঘটুল নয়-ঘটুল, জোড়িদার ঘটুল নয়। চয়ন এ গ্রামে আসার কিছুদিন পরেই পর্যায়ক্রমে একদিন রঙিলার দান পড়ল চয়নের মাসানিতে রাত্রিযাপনের। চেলিক-মোটয়ারীর সম-অধিকার বিষয়ে ঘটুলের দৃষ্টি সদাজাগ্রত। কোন চেলিক বলতে পারে না অমুক মোটিয়ারীকে নিয়ে আমি শোব না। ওদের ঝগড়া হলে, আড়ি হলে সেটার স্থায়িত্ব দান ফিরে আসা পর্যন্ত। চয়ন কিন্তু দৃঢ়ভাবে আপত্তি করল। রঙিলা মাল্‌কোর বড় বোন; দুদিন পরেই সে হবে চয়নের ‘আকোই’ — তাই তার আপত্তি। রঙিলা জ্বলে উঠেছিল এ অপমানে — কিন্তু ঘটুলের বিচারসভায় রায় দেওয়া হল চয়নের স্বপক্ষে। দিল শিরদার।

সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারেনি রঙিলা। এই ছেলেটির সঙ্গে তার ঠোকাঠুকির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রথম দর্শনের অন্তত মুহূর্ত থেকেই। রঙিলা হালপ করে বলতে পারে, প্রথম সাক্ষাতে সে চয়নের দৃষ্টিতে দেখেছিল একটা মুগ্ধ আর্তি! এমন ভাবে কেউ তার দিকে তাকায়নি মুরিয়া সমাজে। নারানপুরে অথবা কোকামেটায় অনেকবার অনেক পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে ধারাম্মান করেছে — কিন্তু তারা কেউই মুরিয়া নয়। রঙিলা বুঝতে শিখেছিল তার পিঙ্গল চুল, রঙ, নীলচে চোখ দেখে মুগ্ধ হবার মতো পুরুষ মানুষ আছে দুনিয়ায়। তারা মুরিয়া জাতির জানা দুনিয়ার বাইরের মানুষ। তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হাটবাজারে, মাড়াইয়ে। শহুরে মানুষের সে দৃষ্টির মর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওর। হৃদপিণ্ডে দোল দিয়ে উঠেছে জিপ্সী মায়ের রক্ত। নিজেকে সামলাতে পারেনি রঙিলা। সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সে প্রতিশোধ নিয়েছে ঘটুলের চেলিকদলের উপর! ঘটুলের অলিখিত আইন বলে — মোটিয়ারী নিজস্ব ঘটুলের বাইরের কোন পুরুষের মাসানিতে বসবে না। রঙিলা কিন্তু আইনের মর্যাদা রাখেনি। কেন রাখবে? ওর নারীত্বকেই কি তারা প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে? রঙিলা জানে, বার বার মাড়াইতে এসে সে বুঝেছে, ওর চির-উপেক্ষিত রূপের দিকেই শহুরে মানুষগুলো বারে বারে ফিরে ফিরে চোরা চাহনি হানে। হাজারটা মুরিয়া মেয়ের মধ্যে তার একটা বিশিষ্ট আসন আছে শহুরে মানুষের বিবেচনায়। রঙিলা জানে, তার নিজের দেহে মুরিয়া রক্ত নেই। ঐ শহুরে মানুষদের রক্তের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। তাই সেই মেলার মানুষদের পূজার নৈবেদ্যকে সে সব সময় প্রত্যাখান করতে পারেনি। বিদ্রোহী মেয়েটি তাই সবার দৃষ্টির অগোচরে গোপনে এভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে সমাজের অবিবেচনার বিরুদ্ধে।

চয়নই রঙিলার জীবনে প্রথম আদিবাসী পুরুষ যার চোখে সে দেখেছিল তেমনি মুগ্ধ দৃষ্টি। ভেবেছিল, যত বাধার সৃষ্টি করতে পারবে, ততই উদগ্র হয়ে উঠবে চয়ন। কাবোঙ্গার শিরদারের দুবার তারুণ্যের প্রতি বেশি আস্থা স্থাপন করেছিল রঙিলা। তাই চয়নকে এড়িয়ে কাবোঙ্গার কোতোয়ারের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিল। আশা করেছিল চয়ন তা সইবে না, চয়ন তাকে ছিনিয়ে নেবে। আঘাতে আঘাতে মানুষটাকে জর্জরিত করতে চেয়েছিল। বিশ্বাস কবেছিল খরজিহু ভিন্‌গাঁয়ের মেয়েটির কাছে বাকযুদ্ধে পরাস্ত

হয়ে চয়ন চাইবে প্রতিশোধ নিতে — বাহ্যুদ্ধে। বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে সে পলাতকা রঙিলাকে বন্দী করে ফেলবে, কঠিন আলিঙ্গনের নিষ্পেষণে গুঁড়িয়ে দিতে চাইবে রঙিলার বুকের পাঁজরা।

সেসব কিছুই হয়নি। দূরন্ত চয়ন শিরদার রঙিলাকে হতাশ করেছে। ভেড়ুয়ার মতো সে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে মেনীমুখো মাল্‌কোর আঁচলের তলায়। চয়নের সে কাপুরুষতাকে রঙিলা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। তার উপর পুষ্পার মিছানার ভুল বোঝাবুঝি! চৈতদাণ্ডার উৎসব-শেষে চয়ন জানাল কারাংমেটার গাইতা আয়েতুর মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়। কোণ্ডা ডেকে পাঠিয়েছিল বিণ্ডোকে। বিণ্ডো-কোতায়ার। বিণ্ডো চেনে গাইতার মেয়েকে, বললে — হ্যাঁ দেখেছি। তারপর মুখটা কানের কাছে এনে বলেছিল আয়েতুর মেয়ে হচ্ছে কারাংমেটার বেলোসা। কোণ্ডা খুশী হয়েছিল। পাশাপাশি গাঁয়ের শিরদার বেলোসার বিয়ে! রাজযোটক!

এসব ভিতরের কথা রঙিলা জানে না। তার ধারণা, তাকে অপমান করতেই চয়ন এমনটা করেছে। তাকে রসাতলে আছড়ে ফেলবে বলেই তুলেছে ‘পোড়ো-ভূমে’র উর্ধ্বলোকে! অরণ্য-পর্বতের আদিম নারী! ওদের হৃদয়বৃত্তি ক্ষণেক্ষণে রূপ বদলায়। প্রেমে পড়লে ভালও বাসতে পারে নিবিড়ভাবে — গীর্দা-আতোরের পথে যদি কোন বাধা এসে দাঁড়ায় তাকে সরিয়ে দিতে হাত রক্তাক্ত করে বসতেও দ্বিধা করে না। আবার প্রেম প্রত্যাখান হলে প্রতি-আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়ে ওঠে আচমকা। বন্য ওদের প্রকৃতি। চয়ন সতর্ক হয়, সাবধান হয়। শরাস্ত বাঘিনী জঙ্গলে গা-ঢাকা দিলে যেমন সজাগ দৃষ্টি মেলে জঙ্গলে ঘোরা-ফেরা করতে হয় চয়নের ভাবখানাও তেমনি। রঙিলা এখন আহত ব্যাঘ্রী। নখ-বিস্তার করে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে সে এখন।

চয়ন ভাবে আর ভাবে। রঙিলা এতটা আহত হল কেন? সে কি সত্যিই ভালবেসেছিল চয়নকে? না কি শুধুই লালসার দাহ, কামনার দহন? সে কি সত্যিই আশা করেছিল চয়ন তারই জন্য লামহাদা খাটতে আসছে? সেই আশাতে ছাই পড়াতেই কি সে এমনভাবে ক্ষেপে উঠছে? কিন্তু অমন অদ্ভুত প্রত্যাশাই বা করল কেমন করে রঙিলা? হ্যাঁ, চয়ন নিজের কাছে স্বীকার করে — ঐ মেয়েটাকে দেখে তার কেমন যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল সব। ওর পিঙ্গল চুল, নীল চোখ আর সাদা চামড়া দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল আর একটি প্রায়-ভুলে যাওয়া মেয়েকে। যার জন্য ওকে চাবুক খেতে হয়েছিল একদিন। সে অনেক অনেক দিন আগেকার কথা...

চয়নের কৈশোর-কালের এ অভিজ্ঞতার কথা অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম অনেকদিন পরে, গুপ্তেজীর কাছ থেকে। ডাক্তার পিল্লাই জেনেছিলেন আমার কাছ থেকে। গুপ্তেজী কিন্তু আমাকে সব কথা বলতে পারেননি। কারণ তিনি নিজেও জানতেন না সবটা। শুধু তিনি কেন, চয়ন নিজেও জানতে পারেনি তার অপরাধটা কী, কেন তাকে চাবুক খেতে হয়েছিল।

চয়নের বয়স তখন অল্প। ওদের গাঁয়ের সামনে একদিন অদ্ভুত-দর্শন একদল মানুষ এসে তাঁবু গাড়ল। তাদের গায়ের রঙ উদ্ভালা ফুলের মতো লালচে সাদা।

যবের শীষের মতো সোনালী চুল, বর্ষণশেষের নির্মেঘ পোড়োভূমির মতো নীল চোখের তারা। অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘোরঘুরি করত। সরকারী লোক এসে গাইতাকে বলে গিয়েছিল যে ওরা ভাল লোক। এসেছে ছবি তুলতে; কারও কোন ক্ষতি ওরা করবে না। গাইতা চয়নকে লাগিয়েছিল সেই বিদেশীদের সেবা করবার কাজে। ওদের জন্য চয়নকে জল নিয়ে আসতে হত, ওদের পিছন পিছন যন্ত্রপাতি ঘাড়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হত। ঐ অদ্ভুত-দর্শন মানুষগুলির মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীলোক ছিল। কত তার বয়স আন্দাজ করতে পারেনি, কিন্তু প্রথম দিনেই সে দেখেছিল মেয়েটি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার নিরাবরণ পাথরে কোঁদা বলিষ্ঠ দেহটার দিকে।

মেমসাহেবের খিদমৎ করতে হত। মেমসাহেবের ছিল ছবি আঁকার বাতিক। যেদিন আকাশে মেঘ থাকত সেদিন সাহেবরা যন্ত্রপাতি বার করত না। সেদিন ঐ মেয়েটি ছবি আঁকতে বের হত সারাদিনের জন্য। চয়ন বয়ে নিয়ে যেত ছবি আঁকার সরঞ্জাম, টিফিন ক্যারিয়ার, জলের বোতল, সাবান-তোয়ালে। মেমসাহেব বসে ছবি আঁকতেন, আর চয়ন বসে থাকত গাছের ছায়ায়। বেশি দূরে যেতে সাহস পেত না — দিনের বেলাতেও নারান্ধীর ওখানটায় ভালুক আসে জল খেতে। শুধু মেমসাহেব যখন নারান্ধীর ধারে কাপড়-জামা ছেড়ে স্নানে নামতেন চয়ন তখন সরে আসত একটা বড় পাথরের আড়ালে। তখনও সে অরক্ষিত মহিলাটিকে একা রেখে দূরে যেত না। নদীর ধারেই, পাথরের ওপিঠে বসে বসে শুনত জলের শব্দ।

স্নান শেষে মেমসাহেব ওর নাম ধরে ডাকত। ও বেরিয়ে এলে ওর হাতেও দিত নানান রকম অদ্ভুত খাবার। কেউ কারও ভাষা জানে না, তবু আকারে-ইঙ্গিতে বেশ কাজ চলে যেত ওদের।

একদিন চয়ন পাথরের আড়ালে বসে শুনছে জলকেলির আওয়াজ। আপনমনে বাঁশী বাজাচ্ছে সে। হঠাৎ শুনতে পেল মেমসাহেবের আর্ত-চিৎকার! মুহূর্তে টাঙিটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল চয়ন নদীর কিনারায়। নিশ্চয় কোন বন্যজন্তু।

ভুল হয়েছিল বেচারির। জন্তু নয়, মানুষ। বন্য নয়, সুসভ্য মানুষ। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়; — চয়নের মনে হয়েছিল তার মেমসাহেবকে সে লোকটা আক্রমণ করেছে বুঝি। ওর মুরিয়া রক্ত মাথায় উঠে গেল। ও আক্রমণ করে বসল আগন্তুককে।

তারপর যে কী হল চয়নের ভাল মনে নেই। অপরাধটা তার কী হল — তাও সে বুঝতে পারেনি। সে শুধু বুঝেছিল ব্যাপারটা লজ্জাকর। পারলে সে আদ্যোপান্ত ঘটনাটা সকলের কাছেই গোপন করে যেন — কিন্তু সাহেবের চাবুকের দাগটাকে লুকাবে কেমন করে? আর সবচেয়ে সে অবাক হয়েছিল এ কথা ভেবে যে মেমসাহেব কেন বাধা দিল না। চয়নের সাহায্য যদি সে নাই চাইবে তাহলে অমন চিৎকার করে উঠেছিল কেন?

হয়তো এই ঘটনার পর থেকেই চয়ন মেয়েমানুষ জাতটাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু হয়ত ওর মনের একটা আজন্ম সংস্কার — নারী জাতির প্রতি অনীহা এতে দৃঢ়মূল হল মাত্র। চয়নের মনের ভাব বোঝা অসম্ভব। তবে একথা নিশ্চিত যে, কারাংমেটার বেলোসাকে দেখে ওর নিশ্চয় মনে পড়ে গিয়েছিল কৈশোরে দেখা

আর একটি নগ্নিকা নারীমূর্তিকে। হয়তো তাই চ্যনের অন্তরাত্মা দুবার বেগে ছুটে যেতে চেয়েছিল ঐ আগুনবরন মেয়েটির দিকে। নারাক্ষীর তীরে নিরাবরণা একটি বিদেশিনীকে রক্ষা করবার জন্যে প্রথম কৈশোরে ওর যে একটা প্রেরণা জেগেছিল — যে অতৃপ্ত বাসনা প্রতিহত হয়েছিল সাহেবের চাবুকে — তাই হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল হয়তো বেলোসার সান্নিধ্যে। কে বলতে পারে কী হয়েছিল সেই আদিম অরণ্যচারীর মনের গহনে। কিন্তু সম্মিত ফিরে পেতে দেবী হয়নি চ্যনের। বিধি বাম। বেলোসা ওকে উপেক্ষা করে ধরা দিল কোতোয়ারের বাহুবন্ধনে। চ্যনের মনে হল — এই আগুনবরণ মেয়েগুলি সব এক জাতের। ওর অশান্ত হৃদয় আশ্রয় খুঁজলো মাল্কোর কাছে — নিকষ-কালো মাল্কোর চেনাজানা বন্দরে নোঙর ফেলবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠল চ্যন। সেদিন থেকে রঙিলার দিকে তাকালেই ও দেখতে পায় তার পিছনে রয়েছে একটা অদৃশ্য চাবুক! সে চাবুক যখন নামবে চ্যনের পিঠে, মাংস কেটে কেটে বসবে — তখন এই আগুনবরণ মেয়েটিও বাধা দিতে আসবে না।

ওরা বিশ্বাসঘাতকের জাত! ঐ উত্তালা ফুলের মতো ফর্সা মেয়েগুলি!

এতদিনে চ্যন বুঝতে পেরেছে সব কথা। রঙিলার আকর্ষণ ভালবাসার নয় — কামনার। যৌবনের ক্ষুধা। ক্ষুন্নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই রঙিলা চাবুকের ব্যবস্থা করবে। চ্যন তাই রঙিলাকে এড়িয়ে চলে। আর সেজন্য ক্ষেপে গেছে রঙিলা। আহত সর্পিণীর মত উদ্যতফণা। সর্পিণী নয়, ডাইনী! হ্যাঁ, ডাইনী। রূপক নয়, সত্য কথা। তবে কথাটা খুব গোপন। তবু তা একদিন জানতে পারল চ্যন। জানালো কারাংমেটার শিরদার। যেদিন শিরদার ওকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে বললে, তুই খুব চালাক! বেলোসাকে বেশ কায়দা করে পাশ কাটালি যা হোক! বেলোসা হচ্ছে তোর আকোইন! মুরিয়াল নেহানা! কী বুদ্ধি!

চ্যন একটু অবাক হয়ে বলে, কেন, এ জন্যে আমাকে বুদ্ধিমান বলছিস কেন?

শিরদার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললে, কথাটা খুব গোপন। তবে তোকে সব কথা বলব আমি। তুই হচ্ছেস কাবোঙ্গার শিরদার, আমাদের মাল্কোর লামহাদা। ঘটুলের কোতোয়ার। মাল্কো মাগীটা খুব লক্ষ্মী, খুব ভাল। তোর সব কথা জানা দরকার। সন্ধ্যাবেলা নারাক্ষী নদীর ধারে মছ্যা গাছতলায় আসবি, সব কথা বলব তোকে।

সন্ধ্যাবেলায় পায়ে-চলা পথ ধরে চ্যন এসে পৌঁছালো নারাক্ষী নদীর ধারে। গ্রাম থেকে অদূরেই বয়ে চলেছে স্বচ্ছতোয়া নারাক্ষী নদী। গাঁয়ের কাছাকাছি বিরাট এক বাঁক নিয়েছে। ওপারে বালির বিস্তৃতি, এপারে শেষ বসন্তের শীর্ণা নদীর স্ফটিকস্বচ্ছ জল। চ্যন বসল একটা পাথরের উপর। বাঁশীটা রয়েছে সঙ্গে। বাজাতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু না, বাঁশীর আওয়াজে অন্য কেউ আকৃষ্ট হয়ে এদিকে এসে পড়তে পারে। তার চেয়ে চুপচাপ বসে থাকাই ভাল। একটা বেনাঘাস নিয়ে অন্যমনস্কভাবে সে বালির উপর আঁচড় কাটতে থাকে। নদীর যেখান থেকে গাঁয়ের মেয়েরা জল নিয়ে যায় সেই প্রায়-ঘাট জায়গাটা এখান থেকে দেখা যায়। সূর্য অস্ত গেছে; আবছায়া

হয়ে এসেছে চারিদিক। তবু অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্য করা যায় জল ভরার পালা এখনও শেষ হয়নি। স্নান গোধূলির আলো। গোধূলি তো নয়, ‘হির্‌ড়ি পোড়’ — সবুজ-টিয়ের সময়। সন্ধ্যাবেলায় সবুজ টি়ের ঝাঁক ঘরে ফেরে। তাই গোধূলি লগ্নের নাম সবুজ টি়ের সময়; কিন্তু শিরদার আসছে না কেন? ভুলে গেল না তো? মছয়া গাছটার দিকে নজর রেখেই বসেছিল চয়ন। ঘটুলে যাবার সময় হয়ে এল এদিকে।

মছয়াগাছের ফাঁক দিয়ে উঠে এল শুক্লপক্ষের চাঁদ। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। পড়ো-ভূম রূপালী চাদর জড়িয়েছে যেন গায়ে। বনের এখানে-ওখানে ছোপধরা জ্যোৎস্না। মনটা উদাস হয়ে যায়।

ট্যাক থেকে গুডাটা বার ক’রে একটু তামাকপাতা বার করলে চয়ন। কী আর করা যায়? তামাকই চিবানো যাক খানিকটা। কিন্তু না, ঐ তো কে যেন আসছে। অবচেতন অনুপ্রেরণায় মাক্সুটা হাতে তুলে নেয়। খুব সম্ভব শিরদার আসছে, কিন্তু এ বন্য-মানুষগুলো জঙ্গলে অদৃশ্য প্রাণীর পদশব্দ শুনলেই বাগিয়ে ধরে টাঙিটা। না, কোন জানোয়ার নয়। মানুষই। কিন্তু নেমে এলো না কেন নদীগর্ভে? মছয়া গাছতলাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল মনে হচ্ছে।

পায়ে পায়ে উঠে এলো চয়ন। আশ্চর্য! শিরদার নয় — মাল্কো!

চয়ন ছুটে এসে ওর হাত দুটি চেপে ধরে — মাল্কো, মাল্কো!

উত্তেজনায়, ভয়ে মাল্কো কাঁপছে! ওর বুকে মুখ লুকিয়ে বললে — জল নিতে এসেছিলাম। দেখলাম তুই বলে আছিস চুপটি করে। তাই...

—রঙিলা? রঙিলা কোথায়?

—রঙিলা! — আশ্লেষ বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলো মাল্কো। ও নাম শুনলেই সে চম্কে ওঠে। বললে, দিদি আসেনি। বাড়িতেই আছে। মাঠ থেকে তুই বাড়ি আসবি, তাই পাহারা দিয়ে বসে আছে।

হি হি করে হাসলে চয়ন। খুব জব্দ হয়েছে রঙিলা। মাঠ থেকে সে আজ বাড়ি যায়নি। সোজা চলে এসেছে নারান্দীর ধারে। খুব খুশী হয়ে উঠল চয়ন।

মাল্কো বললে, একটা কথা বলব?

—কী? বল্‌না!

—তুই আমার জন্যে লামহাদা খাটতে এলি কেন?

হো হো করে হেসে ওঠে চয়ন। কী বোকুর মতো প্রশ্ন! তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, তোকে জব্দ করব বলে।

—জব্দ? কেমন করে? কেন?

—তুই বলেছিলি ‘ইয়ে ধান্দারি নিজান্‌বি বাইলো চো নাককি কাটি’। তা ধাঁধার জবাব তো আমি দিতে পারিনি। তাই ঠিক করেছি, তোকে বিয়ে করব, করে বলব এবার নিজের নাক নিজেই কাট।

মাল্কোও হেসে ওঠে খিলখিল করে।

কিন্তু ঐ আবার কার পায়ের শব্দ। নিশ্চয়ই শিরদার। চয়ন বলে, শিগগির পালা! কাল ঠিক এই সময়ে এখানে আসবি। চুপি চুপি!

চকিতে কৃষ্ণসার মৃগীর মতো বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল মাল্‌কো।

হ্যাঁ, শিরদার।

শিরদার এগিয়ে এসে বসল আর একটা পাথরের উপর। চ্যনের পাগড়ি থেকে গুডার কৌটাটা তুলে নিয়ে এক টিপ তামাকপাতা বার করে চিবাতে থাকে। চ্যন ঘনিয়ে এসে বলে, রঙিলার কথা কী বলবি বলেছিলি?

—বলছিঁ কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব — সত্যি কথা বলবি?

—বল না, কী বলবি।

চৈত-দাণ্ডার রাত্রে একসময় দেখেছিলাম ঘটুলঘরে আমাদের বেলোসা ছিল না, লক্ষ্য করে দেখলুম তুইও নেই — তোরা দুজন কি...

—দূর বোকা! — ধমক দিয়ে ওঠে চ্যন —! না, না, সে-সব কিছু হয়নি।

—বাঁচলাম। খবরদার! তারপর মুখটা কাছে এনে চুপি চুপি বলে — রঙিলা আসলে ডাইনী, মন্তুর-জানা ডাইনী! পাংনাহিন। ধুরবান ছুঁড়তে পারে।

—কী করে জানলি?

—বলি শোন।

রঙিলার জীবনের আদিকাণ্ডের কথা শোনাতে থাকে শিরদার! তখন সে নিজেও খুব ছোট, সব কথা জানতে বুঝতে পারেনি, পরে বড় হয়ে শুনেছে বাপ-দাদার কাছে। জানতে পেরেছে রঙিলা মুরিয়া বংশের মেয়ে নয় — আয়েতু গোণ্ডের পালিতা বন্যা। আয়েতু যখন কুড়িয়ে পাওয়া জিপসির মেয়েটিকে মানুষ করতে শুরু করে তখন প্রবল আপত্তি হয়েছিল কারাংমেটার আদিবাসী সমাজে। এমন কাণ্ড আগে কখনও হয়নি। কিন্তু আখালী ততদিনে বঞ্চিত মাতৃত্বের সবটুকু স্নেহ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে সদ্যোজাত শিশুটিকে — তার বুকের বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এমন সাধ্য কারও ছিল না। শেষ পর্যন্ত সমাজপতিরা আঙ্গোপেনের দ্বারস্থ হল। তাঁর পূজা দেওয়া হল সাড়ম্বরে। গুণিয়ার উপর আঙ্গোপনের ভর হল। ভাবাবেশে মাথা ঝাঁকিয়ে রক্তচক্ষু গুণিয়া ঘোষণা করলে — রঙিলা হচ্ছে বিষকন্যা, পাংনাহিন!

রঙিলার সম্বন্ধে এমন ভয়াবহ কথা শুনেও আয়েতু কিন্তু তাকে ত্যাগ করতে রাজী হল না। ততদিনে বুড়ো গাইতা রেণোর মৃত্যু হয়েছে। আয়েতু বসেছে সেই শূন্য সিংহাসনে। ফলে গাইতার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারল না কেউ। আয়েতু বুদ্ধি করে একটা ভোজ লাগিয়ে দিল! দেবতার নামে একজোড়া শুয়োর বলি দেওয়া হতেই গুণিয়া ঘোষণা করলে দোষ কেটে গেছে।

আখালী বাচ্চাটাকে বুক জড়িয়ে বলে — হ্যাঁরে, তুই নাকি পাংনাহিন হানার?

ফুলের মতো সুন্দর শিশু নিদন্ত হাসি হাসে ফ্যাক্ করে।

গাইতার ভয় আর অপদেবতার ভয়। দুটোই দুর্জয়। তাই কারাংমেটার মনের অন্তঃস্থলে দুর্ভাবনার বীজ রয়েই গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে। রঙিলা ক্রমে বড় হল। ঘটলেও ভর্তি হল। চটপটে, বুদ্ধিমতী মেয়ে। অল্পদিনেই তার ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হল। দিন দিন পদোন্নতি হতে থাকে তার, ক্রমে হল ঘটুলের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা — ঘটুল-বেলোসা। কিন্তু তবু অরণ্যপর্বতের আদিম মানুষগুলির বুকের

মধ্যে যে অজানা আতঙ্কের বাসা, সেখান থেকে কুসংস্কারকে কেউ তাড়াতে পারল না। রঙিলাকে তাই কেউ আপন করে নিতে পারে না। সে যে বিষকন্যা, সে যে ডাইনী — এ কথাটা মনের গভীরে রয়ে গেল। তাই সব কিছু পেয়েও রঙিলার মনে হয় কী-যেন পাওয়া হয়নি। মেয়েরা আড়ালে একত্র হয়, ফিসফিসানি শুরু হয়ে যায়, গরবিনীরা সখীদের শোনায় নীরঙ্ক অন্ধকারের বুকে ঘটুল জীবনের গোপন কথা। রঙিলা সে কাহিনীর সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিতে চায়—বোঝে ঘটুলের রানী হয়েও সে উপেক্ষিতা, ব্যর্থ তার যৌবন! মনে মনে ফুঁসতে থাকে। তবু ওদের কাছে সে কথা স্বীকার করা চলে না। সে যে বড় লজ্জার কথা — সে যে তার নারীত্বের অপমান। তাই কোন অভিযোগও আর চলে না। সে কথার উচ্চারণ করা মানেই নিজের যৌবনকে লজ্জা দেওয়া, নিজের নারীত্বকে ভুলুণ্ডিত করা। তাই রঙিলাও প্রথম প্রথম মোটিয়ারীদের গোপন আসরে বানিয়ে বানিয়ে বলত তার কল্পিত অভিজ্ঞতার কাহিনী। নিজেই কাঠের কাঁকুই বানিয়ে পরত মাথায় আর বলত, কাল রাতে কী হয়েছিল জানিস, — কাল তো আমি শুয়েছিলাম কোতোয়ারের মাসানিতে, এমন অসভ্য কোতোয়ারটা, করলে কি....

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুদ্ধিমতী রঙিলা বুঝতে শিখল, সবাই ওর চালাকিটা ধরে ফেলেছে। প্রকাশ্যে কেউই সেটা স্বীকার করে না — আড়ালে হেসে লুটিয়ে পড়ে এ-ওর গায়ে। সব চেলিকই সব মোটিয়ারীকে গোপনে বলেছে, রঙিলা যেদিন তাদের মাসানিতে শুতে আসে, সে-রাত্রিটা তারা আড়ষ্ট হয়ে কাটিয়ে দেয়! যায় না, জেগে থাকে। পাশে শোওয়া ডাইনীটা যেন মাঝরাতে উঠে বুকের রক্ত না চুষতে আরম্ভ করে! রঙিলা সংযত হয়, কঠোর হয় — প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিশ্চি পিশ্ করতে থাকে। কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে কার উপর? ওরা সবাই যে একদলে! ওরা যখন জোড়ায় জোড়ায় ঘুমাতে থাকে বাহুবন্ধের আল্পেষ-আলিঙ্গনে, আর সে যখন বিনিদ্র নয়নে ছটফট করতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে হয়, চুপিসারে বেরিয়ে আসে বাইরে। আগুন লাগিয়ে দেয় ঘটুলের চালায়! মরুক পুড়ে আগুনের বেড়াজালে ঐ স্বার্থপর ছেলেমেয়েদের দল! কিন্তু! তারপর তাকেও যে পুড়িয়ে মারবে কারাংমেটার বিক্ষুব্ধ মানুষগুলো। মরুক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ, তা হলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে — সে সত্যিই ডাইনী। পাংনাহিন হানার! একঘর জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পারে কখনও কোন মানুষ? এ-কাজ করলে জিত হবে তার ভিতরে বাসা-বাঁধা ডাইনীটার, হার হবে সেই সত্তাটার, যে গান গায়, যে নাচে, যে ভালবাসতে চায়, যে ভালবাসা পেতে চায়!

চয়ন বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু কথাটা কী? রঙিলা কি সত্যিই ডাইনী?

—আমি তা কেমন করে জানব? — প্রতিপ্রশ্ন করে শিরদার।

—এই যে বললি — ও তো সত্যিই ডাইনী নয়?

—আহা! ও তো নিজে তাই ভাবে।

—ও নিজে জানে না — ও ডাইনী কি না?

—তাই কি কেউ কখন জানতে পারে?

—তা হলে ও যে ডাইনী তার কোন প্রমাণ নেই? এক গুণিয়ার কথা ছাড়া?

—না, আছে। সে কথা আর কেউ জানে না। আমি জানি। কাউকে বলিনি। তোকে বলি শোন।

শিরদার তখন বলতে থাকে তার অভিজ্ঞতা। গতবার নারানপুরে মাড়াইয়ের কাহিনী। কাবান্দোতে যে রাত্রে ওরা আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, ঠিক তার পরের রাত্রে ঘটনা। হাটের উত্তর দিকের মাঠে গাছতলায় ওরা আড্ডা গেড়েছিল। শিরদার বলে, লক্ষ্য করেছিলাম একজন শহুরে মানুষ প্রায় সারাদিনই ঘুরঘুর করছে আমাদের আস্তানার কাছে। লোকটার হাতে একটা ছোট্ট কালো মতন বাস্র। সেটা দিয়ে বারে বারে আমাদের টিপ করছে। টিপই করছে। তার থেকে কিছুই বের হচ্ছে না অবশ্য।

চয়ন বলে, ওকে বলে ক্যামেরা। ওতে ছবি আঁকা যায় যন্ত্র দিয়ে।

শিরদার বলে, হাঁ হাঁ, ঠিক কথা। আমিও পরে শুনছিলাম, ওটা ছবি আঁকার যন্ত্র। তুই কী করে জানলি?

—কত নাড়াচাড়া করেছি ও যন্ত্র! যাক, তারপর কী হল বল?

—দেখলাম সারাটা দিনই ছোকরা যন্ত্র হাতে ঘুরঘুর করছে। ইচ্ছে করছিল দিই ব্যাটাকে সাবড়ে একটি টাঙ্গির ঘায়ে, কিন্তু গাইতার বারণ আছে। মাড়াইয়ে এলে সংযত হয়ে থাকতে হয় আমাদের। শহুরে মানুষের সঙ্গে কোন কারণেই মেলামেশা করা বারণ, ঝগড়াঝাঁটি তো একেবারে নয়। খানিকটা নজর করেই বুঝতে পারলাম আমরা কেউ নেই, ওর লক্ষ্যস্থল আমাদের বেলোসা। তাই হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যেমন মোটিয়ারীদের নিকষ-কালো গায়ের রঙ পছন্দ করি, তেমনি ওরা, মানে শহুরেরা, পছন্দ করে সাদা চামড়া।

চয়ন বলে, এ রাম! তাই নাকি!

—হ্যাঁ তাই। এ-জিনিস আমি আগেও দেখেছি। মানে আমাদের আগের বারের মাড়াইতে। তা সে যাই হোক, ছোকরা যে আমাদের বেলোসাকে দেখে মজেছে, সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দুপুরে যখন মেয়েরা নারানপুরের বড়-তালাওয়ে স্নান করতে গেল, তখন একচোট ঝগড়াও হয়ে গেল। রঙিলা যখন স্নান করে উঠে কাপড় ছাড়ছে, ওই ছেলেটা তখন সেই যন্ত্রটা দিয়ে ওকে টিপ করছিল। রঙিলা ক্ষেপে গেল। একটা মাটির ঢেলা তুলে মারলে ছুঁড়ে। ঢেলাটা ওর গায়ে লাগেনি। হি হি করে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল ছেলেটা। তারপর শোন — বিকেল বেলা মোটিয়ারীর যখন দল বেঁধে মেলাতলায় ঘুরছে, তখন সেই ছেলেটা আবার ওদের পিছু নেয়। রঙিলা ঘুরে দাঁড়াতেই ও তার হাতে গুঁজে দেয় একছড়া পুঁতির মালা। রঙিলা সেই মালাটাই ছুঁড়ে মারলে ছেলেটাকে। এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। পুঁতিগুলো ছিটিয়ে পড়ল রাস্তার।

চয়ন বলে, তুই কী রে? আমাদের কোন মোটিয়ারীকে এমন করলে ঝাড়তাম মাকসুর এককোপ! ঘাড় থেকে মাথার বোঝাটাকে নামিয়ে দিতাম।

শিরদার বলে, আরে, আমিও তাই দিতাম, কিন্তু কী হল জানিস, সারাদিন বুঝতে পারিনি। তারপর শোন! সন্ধ্যার দিকে বেলোসার স্বর মত হল। বললে, নাচবে

না। আমরা দল বেঁধে চলে গেলাম হাটের পূর্ব দিকের মাঠে। বেলোসা একাই শুয়ে রইল। রাত তখন উঁইষা হিকং। হঠাৎ একটা ছেলে এসে বেলোসাকে বললে — শিগগির এস, তোমাদের শিরদারকে সাপে কামড়েছে! ছেলেটাকে বেলোসা চেনে না। পরিষ্কার আমাদের ভাষায় কথা বলল সে। বেলোসার কোন সন্দেহ হয়নি। ছেলেটার পিছন পিছন চলে গেল বনের দিকে। তার একটু পরেই আমি ফিরে এলাম আস্তানায়। মেয়েটা স্বর গায়ে একা পড়ে আছে। আমি শিরদার, ও আমার বেলোসা। তাই নাচের আসরে মন লাগল না। ফিরে এসে দেখি, গাছতলায় কেউ নেই। এদিক-ওদিক খুঁজছি, ভানপুরীর শিরদার আমাকে দেখে বললে — কী খুঁজছ? বললুম — আমাদের বেলোসাকে দেখেছ? বললে — হ্যাঁ, এই তো এইমাত্র কে যেন এসে ডেকে নিয়ে গেল। বুকের মধ্যে কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিশ্চয় কিছ একটা হয়েছে। ভানপুরীর শিরদার বনের যদিকে নির্দেশ করল ছুটলাম সেদিকে

ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে শুনেছিলাম শিরদারের জবানিতে সে-রাত্রের দুর্ঘটনাটা। শিরদার উদ্ধার করতে পেরেছিল বেলোসাকে। অবশ্য ঘটনাস্থলে সে গিয়ে পৌঁছেছিল অনেক দেরীতে। গামছা নিংড়ে যেমন করে জল ঝরানো হয়, তার আগেই তেমনি করে তাকে নিংড়ে শেষ করেছিল সেই সভ্য-জগদের অসভ্য মানুষটা। বেলোসার তখন প্রবল স্বর — বাধা দিতে পারেনি। ঘটনাচক্রে আর-একজন সভ্য-জগতের মানুষও নাকি সেখানে গিয়ে হাজির হয়। শয়তানটা তখন পালায়।

শিরদার বলে, বেলোসা চিনতে পেরেছিল লোকটাকে। সেই ছোকরাই, সারাদিন যে ঘুরঘুর করছে তার পিছনে! বেলোসার চোখ দুটি স্বলে উঠেছিল : বলে, চল! ওকে খুঁজে বার করব! আর সবাইকে ডাক!

কিন্তু গাইতার কঠিন বারণ আছে। মাড়াইয়ে গিয়ে মারামারি করলে কঠিন শাস্তি দেবে গাইতা। তাছাড়া এখনও বাইরের লোক কিছু জানে না। কথাটা চেপে যেতে পারলেই সব দিক থেকে মঙ্গল। শিরদারের নেশা ছুটে যায়, বেলোসার হাত দুটি ধরে বলে, ছেড়ে দে বেলোসা! ছেড়ে দে। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না একথা। জানাজানি হলে কারাংমেটার মাথা হেঁট হয়ে যাবে!

বেলোসা ওকে ধমকে ওঠে, তুই ভেড়া হয়ে গেছিস! তোদের বেলোসার ইজ্জৎ যে নিল, তাকে ছেড়ে দিবি? তাহলে টাঙি কাঁধে নিয়ে ফিরিস কেন ‘ঘোরিয়া মাঙ্কা’র বাচ্চা!

শিরদার বলে, ওরা শহুরে মানুষ! মাথার বদলি ওরা মাথা নেয় না। ওদের কিছু বললেই হবে থানা-পুলিশ। আমাদের গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। তোর পায়ে ধরছি—এবারকার মতো ক্ষান্ত দে!

বেলোসা বললে, নিয়া মিয়ার না তিতি গুটা!

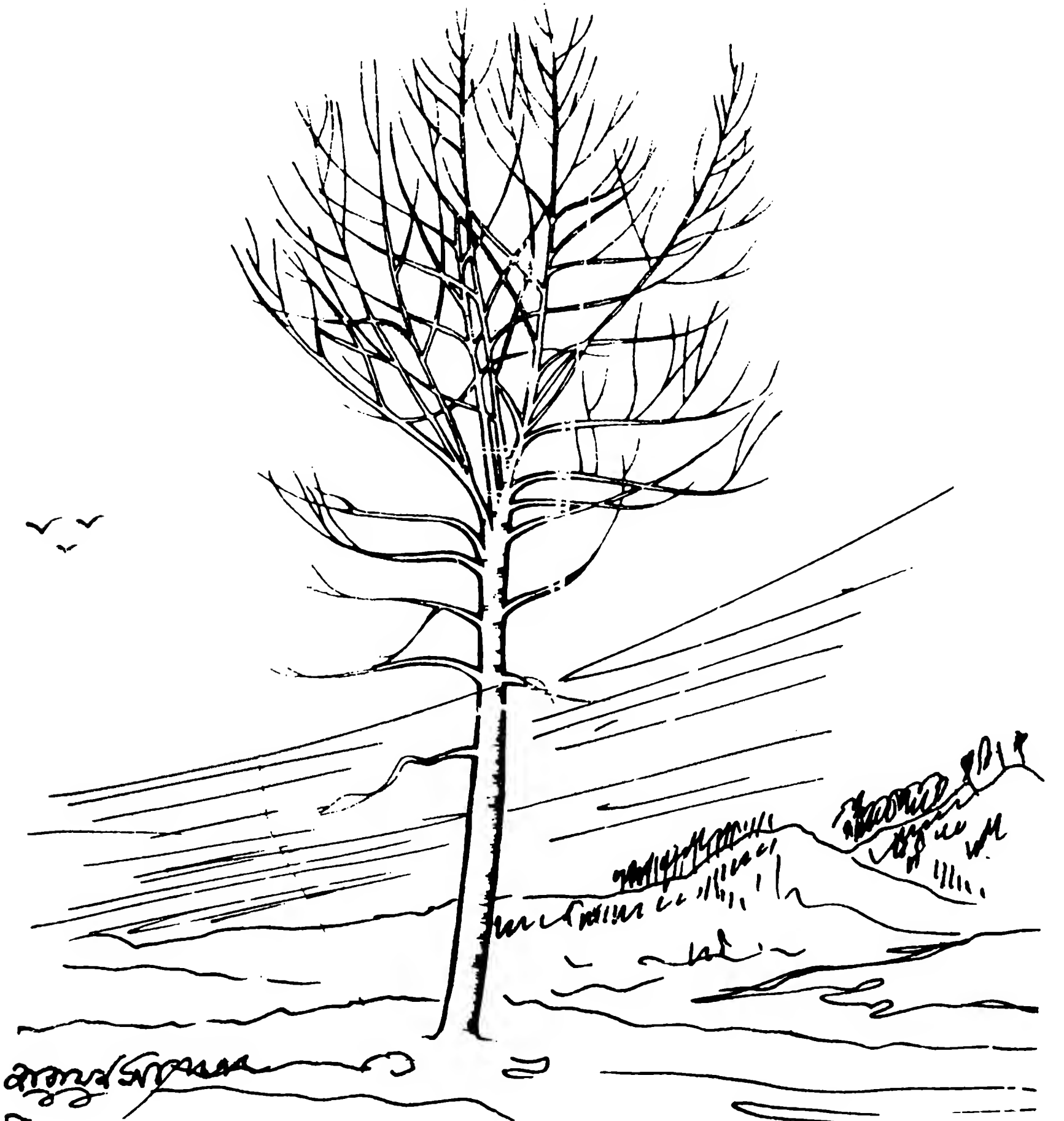
অশ্লীলতম গালাগালটাও হজম করে নিয়েছিল শিরদার! কেন করবে না? বাঘ-সাপ, দতী-দানো, দস্যু-ডাকাত — এদের বিরুদ্ধে তবু লড়াই দেওয়া যায়; কিন্তু থানা-পুলিশ! শাস্তি-শৃঙ্খলার প্রতিনিধিরা যে অশাস্তি সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার

পাবে কোথায় ? গাঁয়ে একটা খুন হলে ওরা দশ-বিশজন মানুষের মাজায় দড়ি বেঁধে কোথায় যেন নিয়ে যায়। তারপর ? তারপর কী হয়, কেউ তা জানে না। যারা বেঁচে ফিরে আসে, তাদের কোন প্রশ্ন করতে সাহসে কুলায় না। তাই শহুরে অসভ্যদের অসভ্যতা ওরা উপেক্ষা করে — শহুরে মানুষদের এড়িয়ে চলে শুধু। রঙিলা ক্ষেপে গিয়ে শিরদারের গায়ে থুথু দিল। বললে, ভেড়ার বাচ্চা ! যা যা আমার সমুখ থেকে ! আমি একাই এর বদলা নেব। আমি যদি সত্যিই ‘পাংনাহিন হানার’ হই, তবে আমার ‘ধুর-বান’ ব্যর্থ হবে না ! কুষ্ঠ হবে ওর মুখে।

এই বলে মটমট করে আঙুলগুলো ফোটালো রঙিলা — মানে — ‘চুটকি-ধুর’ ছুঁড়ে মারল আরকি। ডাইনীরা যেমন মন্ত্রঃপুত ধুরবান ছোঁড়ে।

চয়ন বললে, তাতে কী প্রমাণ হয় ? ধুরবান কার্যকরী হল কি না, কে জানে ?

শিরদার বলে, সেই কথাই তো বলছি। মাসকয়েক পরের কথা। নারানপুরের হাটে গিয়েছিলাম নুন আনতে। সেই ছোকরাটাকে দেখলাম। মুখে কুষ্ঠ হয়েছে তার !



॥ পনেরো ॥

ডাক্তারবাবুর মুখে এ কাহিনী সেদিন নিশ্চুপ শুনে গিয়েছিলাম। তাঁকে বলিনি যে, নারানপুরে রঙিলা বেলোসার সে নির্যাতনের আমিই ছিলাম অপর সাক্ষী। মনকে তখন বুঝিয়ে ছিলাম — কী লাভ অহেতুক বাগাড়ম্বরে। আজ এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে বসে একটু আত্মবিশ্লেষণের লোভ জাগছে। কেন সেদিন সে কথা স্বীকার করিনি? আজ বুঝতে পারি। সেদিন সে কথা স্বীকার করতে পারিনি লজ্জায়, সঙ্কোচে! গুপ্তেজীর কাছে ধমক খেয়ে আমি সতর্ক হয়েছিলাম। চेतন মনে স্বীকার না করলেও অবচেতন মনের গভীরে একটা অপরাধবোধ ছিল আমার। বুঝতে পেরেছিলাম ওটা নিঃসংশয়ে আমার পক্ষে ভীকৃতার কথা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড খাড়া করে প্রতিবাদ করতে পারিনি আমি। ডাক্তারবাবুও একরোখা সিঁধে মানুষ। তাই তাঁকে ভরসা করে বলতে পারিনি যে, সে অত্যাচারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেও চেপে গিয়েছিলাম আমি। স্বীকার করলে বেলোসার উচ্চারিত অশ্লীলতম গালাগালটা আমার গায়েও এসে লাগত যে!

কিন্তু ডাক্তারবাবুর কাছে সে কথা স্বীকার না করায় যে কারও কোন ক্ষতি হতে পারে, তা জানা ছিল না আমার। সে কথা তখন জানলে আমি নিশ্চয় স্বীকার করতাম।

ডাক্তারবাবু অনেকদিন পরে একবার আমাকে লিখেছিলেন, ও কথা যদি সেদিন আমাকে জানাতেন তাহলে চয়নের ইতিহাস অন্য রকম হত। তখনই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যেত আমার কাছে। হয়তো বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম তাকে। কিছু মনে করবেন না এঞ্জিনিয়ার-সাহেব — গুপ্তেজী কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন সেদিন, ক্যালেন্ডারখানা আপনার পক্ষে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শোভন হত না।

স্বীকার করি, সর্বান্তঃকরণে আজ স্বীকার করি সে কথা। আর এও বুঝি কী মর্মান্তিক অভিমানে ডাক্তার পিল্লাই ও কথা লিখেছিলেন আমাকে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে — ঠাট্টা ঠাট্টাই যতক্ষণ না সেটার পুনরুক্তি হয়। একই ঠাট্টার ছলে দ্বিতীয়বার পা-টানাকে আর রসিকতা করা বলা চলে না — সেটা হচ্ছে লেঙ্গি মারা। সেটা ইচ্ছাকৃত অপমান। আমি বিশ্বাস করি, ওঁরা কেউই নিছক রসিকতা করতে আমাকে ও কথা বলেননি। দুজনেই দুরন্ত অভিমানে ও কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। অপরাধ করায় যেটুকু পাপ, অপরাধ গোপন করার চেষ্টার পাপ তার চেয়ে কিছু কম নয়। ‘হিমালয়ান ব্লাভারের’ও ধার ক্ষয়ে যায় অপরাধের অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে। আমি সে সুযোগ দু’দুবার হারিয়েছি। মিস্টার গুপ্তে অবশ্য বাঙলা হরফ চেনেন না। ডাক্তার পিল্লাই কোথায় জানি না — যদি ঘটনাচক্রে ‘দণ্ডকেশবরী’র এই পরিচ্ছেদটা তাঁর হাতে পড়ে — তবে সে পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে।

কিন্তু মনে হচ্ছে কাহিনীর পারম্পর্য হারিয়ে ফেলছি আমি। ডাক্তারবাবু আমাকে ও কথা লিখেছিলেন অনেক পরে — তার আগে পেয়েছিলাম গুপ্তেজীর চিঠি — এবং তারও আগে ঘটেছিল জয়পুরের ডাকবাঙলোর সেই বিস্তীর্ণ ঘটনাটা। কিন্তু এসব কথা বলার আগে সে যাত্রায় নারানপুরে সংগ্রহ করা চয়নের কাহিনী যতটুকু শুনেছিলাম তা বলা উচিত।

চয়ন প্রায় বছরখানেক ছিল আয়েতু গোণ্ডের বাড়িতে। মাঝে মাঝে নারাজী নদীর ধারে সেই গুপ্তস্থানে সে দেখা পেত মাল্কোর। মাঠ থেকে ফেরার পথে সেখানেই অপেক্ষা করত। মাল্কো সারাদিনের সব কাজ ভুললেও সাঁঝের বেলা ‘জল্কে-চল’ কর্তব্যটা ভুলতো না। কিন্তু রঙিলার পিঙ্গল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে বেশিদিন ফাঁকি দেওয়া গেল না। রঙিলা ওদের চালাকিটা ধরে ফেলল! এরাও সতর্ক হয়ে গেল। হাতে-নাতে ধরতে না পেরে রঙিলা শুধু ঝাঁপিবন্ধ সাপিনীর মতো অপমানে ফুঁসতে থাকে।

বছর ঘুরে আবার এল ‘উইজ্জা-পাণ্ডাম’ মাস। চৈত-দাণ্ডার পরব এল, গেল। মছয়া আর কেন্দুপাতা সংগ্রহের মাস এল, গেল। তারপরেই ‘উইজ্জা’-উৎসব। মাঠে বীজ ছড়াবার শুভলগ্ন। বীজ বোনার আগে ওরা একটা বাৎসরিক শিকার অভিযানে বার হয় — ‘উইজ্জা-ওয়েতা’ শিকার। চেলিকের দল শিরাহার দ্বারস্থ হয়। শিরাহা ধ্যানে বসে, তার উপর আঙ্গোপেনের ভর হয়। শিরাহার কণ্ঠে গোনা যায় দেব ‘কাদরেঙ্গালের’ আদেশ — জঙ্গলের কোন অংশে শিকারে গেলে লাভবান হওয়া যাবে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। উইজ্জা-ওয়াতে শিকারে কোন ভাল শিকার না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে এবার মাঠে ভাল ফসল হবে না। সেটা ভারি দুর্লক্ষণ। শিকারের দেবতা হচ্ছেন দেব কাদরেঙ্গাল, দেবী তাল্লুর-মুটাইয়ের ভৈরব। শিকার পেলে প্রথমেই কাদরেঙ্গাল দেবকে কিছুটা মাংস উৎসর্গ করতে হবে। তারপর গাইতা ভাগ করে দেবে বাকি মাংসটা। যার তীরবিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে প্রাণীটা সে নেবে চামড়াখানা।

এ বছর উইজ্জা-উৎসবে ওরা পেল দুটো খরগোশ, একটা হরিণ আর একটা বুনো-শুয়োর। বুনো-শুয়োরটা মেরেছিল চয়ন। নিজেও আহত হয়েছিল দাঁতাল শুয়োরটার আক্রমণে। বাঁ-পায়ের উরুতে হল বৃহৎ ক্ষত। ধরাধরি করে ওকে সবাই নিয়ে এল বাড়িতে। আখালী কারও কথা শুনলে না। মাল্কোর উপর দিল আহত মানুষটার শুশ্রূষার ভার।

রঙিলা ক্ষেপে গেল সে কথা শুনে। তেড়ে গিয়ে আখালীকে বলে, তুই নাকি গুম্বরিকে বলেছিস্ চয়নকে দেখভাল্ করতে?

গুম্বরি হচ্ছে মাল্কোর পিতৃদত্ত নাম।

আখালী গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ। পরদেশী ছেলেটাকে না হলে দেখভাল্ করে কে? দাঁতালে ওর পা একেবারে ফেড়ে ফেলেছে!

রঙিলা রুখে ওঠে, এরপর দেখেছি তোর জ্বালায় সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না। চয়ন হল ওর লামহাদা....

আখালীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। বললে, রঙিলা! এই হিংসার জন্যেই তোর গায়ের রঙ হয়েছে পাংনাহিনের মতো!

রঙিলা স্তম্ভিত হয়ে যায়। আখালী কখনও ওকে রুঢ় কথা বলে না।

—তুই আমাকে ডাইনী বললি?

—না পাংনাহিন বলিনি, বলেছি পাংনাহিনের মতো হিংসুটে হয়ে উঠেছিস তুই। গুম্বরির লামহাদা এসেছে, তাতে তোর বুক ফাটে কেন রে? সারাদিন তুই ওদের

দুজনকে আগলে রাখিস্ কেন ? আমি কিছুই বুঝি না, নয় ?

ঝড়ের বেগে স্থানত্যাগ করল রঙিলা। কিন্তু সংকল্প ত্যাগ করল না। দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকে ওদের দুজনকে।

মাস দুই ভুগল চয়ন। মনে মনে ধন্যবাদ দিল দাঁতাল শুয়োরটাকে। ভাগ্যে সে অখম হয়েছিল। তাই রোগশয্যায় শুয়ে এতদিনে সে মাল্কোকে পেল নাগালের মধ্যে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি পিঙ্গলনয়না বড়বোনের পাহারা এড়িয়ে বেশি কাছে যেতে অবশ্য সাহস পায় না মাল্কো — তবু ওরই মধ্যে দুটো চুপি চুপি কথা, একটু সোহাগ, একটু স্পর্শ — তাই বা কম কী ? আর এই দুর্ঘটনার জন্যেই বোধকরি নরম হল আয়েতু। স্থির হল চয়ন ভালো হয়ে উঠলে মাল্কোর সঙ্গে তার শুভবিবাহ হবে। ‘ইরপু পাণ্ডাম’ মাস থেকে শুরু বিয়ের মরশুম। শেষ হয় বর্ষাগমে। বর্ষাকাল এসে গেল প্রায়। অবিলম্বে বিয়ে না হলে আবার এক বছর বিবাহ নাস্তি। তাই আয়েতু সন্মতি জানাল এবার। খবর পাঠালো কোণাকে, কাবোঙ্গায়।

চয়ন আজকাল একটু ওঠা-হাঁটা করতে পারে। আজকাল ও আয়েতুর বাড়িতেই থাকে। ঘটলে নয়। ঘটলে দিনের বেলা কেউ থাকে না। অসুস্থ মানুষটা একা পড়ে থাকবে কেমন করে ? আয়েতু সম্পন্ন গৃহস্থ। তার বাড়িতে দুখানি ঘর। সামনের ঘরে থাকে চয়ন। ভিতরের ঘরখানির নাম ‘আঘা’ — মাস্টার্স-বেডরুম। মেয়েরা শোয় ঘটলে। আয়েতুর অবিবাহিত ছেলে থাকলেও ঘটলে রাত কাটাতে যেত। বিবাহিত ছেলে থাকলে তাকে তুলতে হত নতুন ছাপরা — বিবাহিত মেয়ে থাকলে যেত পামীর ঘরে। এছাড়া মুরিয়ার বাড়িতে থাকে হাঁস-মুরগী শুয়োরের ঘর আর আসকালোন। চয়ন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মাল্কো শোয় মায়ের কাছে — আঘা ঘরে। দেখাদেখি রঙিলাও ঘটলে যাওয়া বন্ধ করল। সেও শোয় ঐ ঘরে — মাল্কোর গা ঘেঁষে। না হলে রাতে পাহারা দেবে কেমন করে ? বাইরের ঘরখানি ছোট। আলগির দিকে একটা খোপ — জানলার বিকল্প। সেই ফোকর দিয়ে তারায় ভরা আকাশের একটা ছোট্ট আভাস।

এতদিন অতটা উতলা হয়নি চয়ন। যে মুহূর্তে শুনল আয়েতু কন্যা সম্প্রদানে রাজি হয়েছে অমনি কেমন করে যেন আনমনা হয়ে গেল সে। আর যেন তার ধৈর্য বাঁধ মানে না। খবরটা জানাজানি হয়ে যাবার পর থেকে মাল্কো আর এ ঘরে আসছে না। যা লাজুক মেয়ে ! আখালীই নিয়ে আসে তার ওষুধ। আকোইন রঙিলার সঙ্গে সে আজও কথা বলে না।

গভীর রাত। ছোট্ট কাটুলে শুয়ে শুয়ে উশখুশ করছিল চয়ন। আর মাত্র একমাস। তারপরেই তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ। ধরা দেবে মাল্কো। পাহাড়ী জোয়ানী। চয়ন ছোট্ট ফোকর দিয়ে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঝুম পড়ে আছে। চাঁদের আবছা আলোয় বনেপাহাড়ে মাখামাখি। ঘটলঘরের দিক থেকে ভেসে-আসা সোরগোলটা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। জোড়ায়-জোড়ায় ওরা শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়। যৌবনপুষ্ট মাল্কোর দেহটা মনের গোখে ভেসে ওঠে। আর একমাস। তারপর আর বাধা থাকবে না, আর রঙিলা এসে মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে না। মাল্কোকে সে

সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তার গাঁয়ে, কাবোদায়। ছোট্ট একটা কুটির বাঁধবে। লাজুক মিষ্টি মাল্কোর হাতে এনে দেবে নানা সম্পদ। ওদের দুজনের সংসারে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে সহ্য করবে না। নিভৃতে থাকবে ওরা দুটিতে গাঁয়ের একান্তে। না, তা কেন? অতিথি বন্ধু আসবে বইকি! অতিথি-অভ্যাগতের সেবায়ত্নই যদি না করল তবে কেমন মুরিয়ার সংসার গড়ে তুলবে ওরা! আর তাছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি তো আসবেই! মাল্কোর বাচ্চা হবে না? চয়নের হাসি আসে! তারও বাচ্চা হবে! চয়ন তাকে শেখাবে তীর-ছোঁড়া, শিকার করা! পাঁচগাঁয়ের মানুষ অবাক হয়ে যাবে চয়নের ছেলেকে দেখে। ছেলে না মেয়ে? মাল্কো কী চাইবে? মেয়ে না ছেলে? আচ্ছা মাল্কো কি চয়নের কথা ভাবে এমনি করে? এভাবে রাতের পর রাত সেও কি আকাশের তারা গোনেন? পাশের ঘরেই শুয়ে আছে মাল্কো। একবার চুপিসারে গিয়ে দেখে আসবে? কিন্তু ঐ ঘরেই আছে রঙিলা। পাংনাহিন হানার! শোনদৃষ্টি মেলে বসে আছে পাহারায়। থাক্, কাজ নেই। পাশ ফিরে শোয় চয়ন, অশ্রুট উচ্চারণ করে — মাল্কো, মাল্কো! যেন ঐ মিষ্টি নামের অশ্রুট উচ্চারণের মধ্যেও একটা তৃপ্তি আছে!

রাত কত হয়েছে খেয়াল নেই। বোধহয় ওরই মধ্যে একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে খুঁট করে একটা শব্দ হওয়ায় আচমকা ঘুমটা ভেঙে যায়। উঠে বসে। দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাল্কো। অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না অবশ্য। চাঁদ অস্ত গেছে। আবছা তারার আলোয় মনে হল মাল্কো একটা আঙুল রেখেছে ঠোঁটের উপর। চয়ন কাটুল ছেড়ে উঠে পড়ে। হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় মাল্কোর শাড়ির আঁচল। চকিতে সরে যায় মাল্কো। চয়নের নাগালের বাইরে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। টলতে টলতে চয়ন এগিয়ে আসে ওর দিকে। কিন্তু ধরা না দেবার খেলায় যেন মেতেছে মাল্কো। সেও ধীরপদে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। নেমে পড়ে উঠানে।

চয়ন একটু অবাক হয়েছে। মাল্কোর যে এতটা সাহস হতে পারে তা যেন ওর ধারণা ছিল না। মাল্কো লাজুক, মুখচোরা — বোধ করি সেও মাতাল হয়ে পড়েছে বিবাহের দিন স্থির হওয়ায়। বোধ করি সেও আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। আবছা আলো-আঁধারিতে চয়ন দেখল, উঠানটা পার হয়ে মাল্কো ঢুকে গেল ও পাশের একচালাটায় — ‘আসকালোন’ ঘরে। হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে!

চয়ন সাবধানে নামল উঠানে। শরীর তার এখনও দুর্বল। পায়ে জোর পাচ্ছে না। কিন্তু মাল্কোর ঐ হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে এমন ক্ষমতা নেই চয়নের। পায়ে পায়ে সেও এগিয়ে যায় আসকালোন ঘরের দিকে।

নীরঞ্জ অন্ধকার আসকালোন ঘরটা। একটাও জানলা নেই। একবার চয়নের মনে হল, কাজ নেই — ফিরে যাই। ‘আসকালোন’ ঘরটা অশুচি, অপবিত্র। কোন পুরুষমানুষের আসকালোন ঘরের চৌকাঠ পার হবার আইন নেই। তাতে অমঙ্গল হয়। মনটা খুঁতখুঁত করছে। কিন্তু মাল্কোর সে হাতছানিকে উপেক্ষাই বা করে কী করে?

নিশ্চিহ্ন অন্ধকার। মেঝেতে ছড়ানো আছে খড়ের বিছানা। অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। শীতল একটা নারীদেহ। উন্মুখ প্রতীক্ষায় সেও বুঝি নিমেষ গুনছিল। অন্ধ আদিম আবেগ। অন্ধকারের বুকে নিঃশেষ হয়ে যায় দুজনে.....

কতক্ষণ কেটেছে? হঠাৎ বাইরে খুট করে একটা শব্দ হল। সম্বিত পেয়ে চয়ন উঠে বসে! কে যেন আসছে! অন্ধকারের মধ্যে মাল্কোও নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ালো! অতি সম্ভূর্ণে খুলে গেল আসকালোন ঘরের বাঁপের দরজা। অন্ধকারে চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। তাই অস্পষ্ট আলোয় চয়ন দেখল একটি নারীমূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারের কাছে। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। নির্ঘাৎ রঙিলা। সর্বনাশ!

কোথাও কিছু নেই মাল্কো সেই নারীমূর্তিকে একটা ধাক্কা মেরে ছুটে বেরিয়ে গেল। ধরা পড়ে গেছে চয়ন। আর রক্ষা নেই। চয়নও উঠে আসে পায়ে পায়ে। আত্মরক্ষার তাগিদে কাজ। আর লজ্জা-সঙ্কোচ করে লাভ নেই। রঙিলা যদি এখন ক্ষমা না করে তাহলে আর বাঁচবার কোন পথ নেই। শুধু লামহাদা একা নয়, তার ভাবী পত্নীকেও কঠিন শাস্তি পেতে হবে! মুহূর্তে মনস্থির করে চয়ন। ক্ষমাই চাইবে সে রঙিলার কাছে। ধাক্কা খেয়ে রঙিলা বসে পড়েছে খড়ের গাদায়। চয়ন এগিয়ে এসে তার হাত ধরে তোলে, কিন্তু ও কাঁপছে কেন?

চয়ন কাতর স্বরে বলে, এবারকার মতো মাপ কর রঙিলা!

—রঙিলা? —চমকে ওঠে আগন্তুক মেয়েটি!

সে কণ্ঠস্বরে কিন্তু তার চেয়েও বেশী চমকে ওঠে চয়ন! এ তো রঙিলা নয়।
—কে? কে তুমি?

ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যে মেয়েটা এখন কাঁদছে সে আর কেউ নয় — মাল্কো! কিন্তু তা কেমন করে হবে? অবাক হয়ে চয়ন ভাবে। তাহলে, তাহলে সে মেয়েটি কে? যে অন্ধকারের মধ্যে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছিল? এইমাত্র গায়ের কাপড় সামলে যে ছুটে বেরিয়ে গেল আসকালোন ঘর থেকে? যার সঙ্গে এতক্ষণ সে...

হঠাৎ ওর বুক থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মুখ তুললো মাল্কো। মুখচোরা লাজুক মেয়েটা বুঝি ক্ষেপে গেছে। দু হাতে চালাতে থাকে চড়-চাপড়-কিল-ঘৃষি!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল চয়ন। কোন প্রতিবাদ করল না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে!

সেই কালরাত্রির পর থেকেই কী যেন হল চয়নের! পরদিন তাকে দেখে মনে হল সারারাত তার উপর দিয়ে বুঝি প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে। সমস্ত দিন সে কারও সঙ্গে কথা বলেনি। খায়নি, ঘুমায়নি, ঘর ছেড়ে একবারও বার হয়নি। তারপর কী ঘটেছিল মাল্কো জানে না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ।

আয়েতু শিরাহাকে ডেকে পাঠালো, গুণিয়াকে খবর দিল। যথাবিধি ‘বোহোরানির’ আয়োজন করল। বোহোরানি হচ্ছে রোগমুক্তির জন্য পূজাঅর্চনা। কিন্তু কিছুই ফল

হল না।

কিছুদিনের মধ্যে বাধ্য হয়ে কোণাকে আয়েতু খবর পাঠালো। চয়ন পাগল হয়ে গেছে। তাকে কাবোদ্দায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। সেখানেও শিরাহা আর গুণিয়ার দল নতুন করে বোহোরানির আয়োজন করল; কিন্তু কোন ফল হল না। অবশেষে ওরা শরণ নিল ডাক্তার পিল্লাইয়ের কাছে।

ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রঙিলার জবানবন্দী নিয়েছিলেন? সে কিছু আলোকপাত করতে পারেনি?

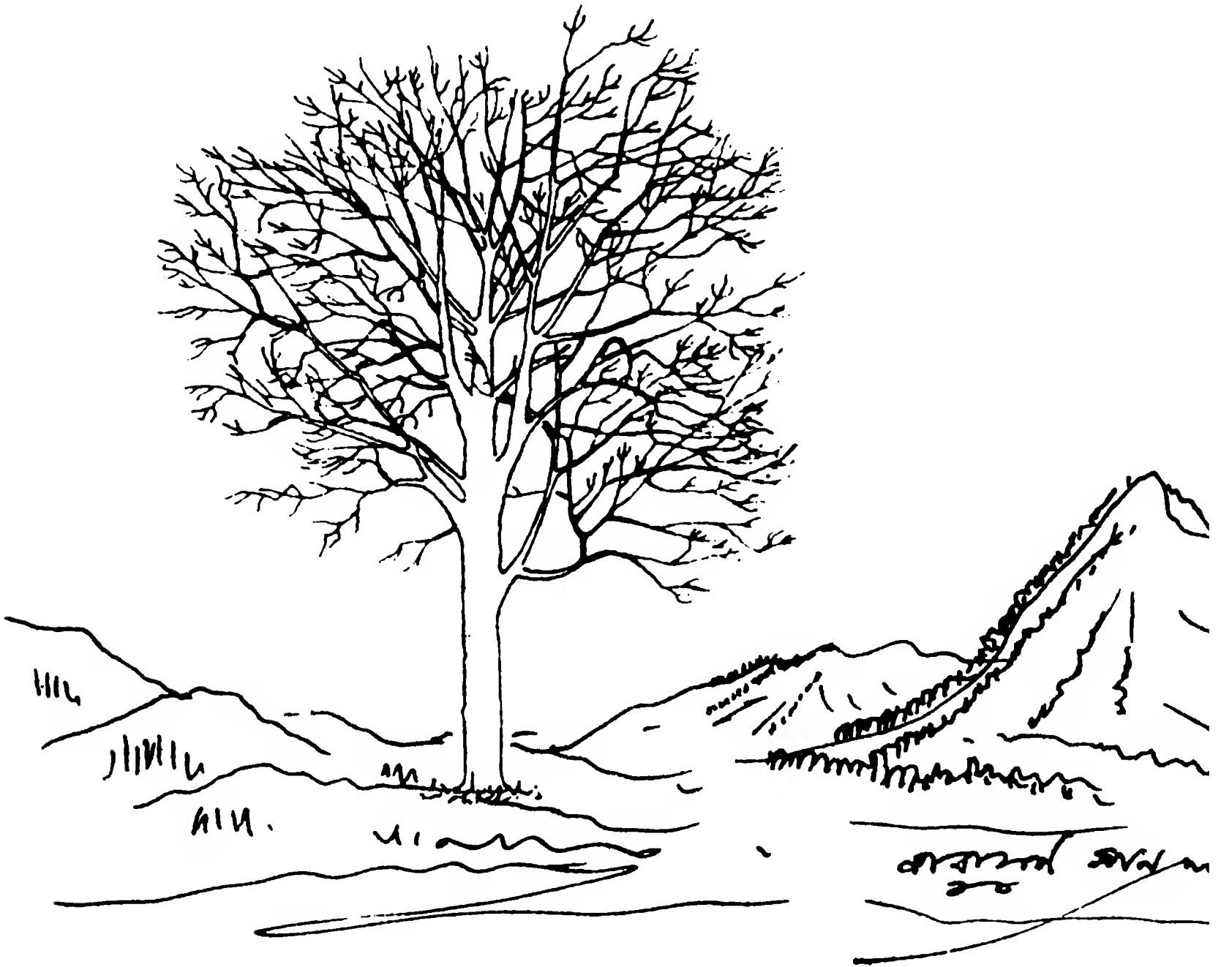
—রঙিলাকে আমি কোনদিন দেখিনি।

—সে কি এখন কারাংমেটায় নেই?

—না! আয়েতু তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আয়েতুর বিশ্বাস রঙিলাই ধূরবাণ ছুঁড়ে গুণ করেছে চয়নকে!

—কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়?

—তা কেউ জানে না।



॥ ষোলো ॥

প্রায় মাসছয়েক পরের কথা।

নিজের ধান্দায় ভুলেই গেছি নারানপুরের আধ-শোনা গল্পটা। ইট-কাঠ-সিমেন্ট-লোহার স্তূপে ডুবে আছে আকণ্ঠ। ঘটনাচক্রে আবার দেখা হয়ে গেল গুপ্তেজীর সঙ্গে, জয়পুরের গেস্ট হাউসে। জয়পুর উড়িষ্যায়। জয়পুরের মহারাজার তৈরী অতি সুন্দর একটি গেস্ট-হাউস আছে এখানে। সেকালের দামী দামী আসবাব। প্রকাণ্ড অয়েল-পেন্টিং, ঝাড়-লণ্ঠন, দামী কাপেট — সবই ধীরে ধীরে জীর্ণ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। জয়পুর থেকে মাইল সাতেক উত্তরে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার কেন্দ্রীয় কারখানা তৈরী হচ্ছে — আশ্বাশুড়ায়। আগামীকাল উড়িষ্যার রাজ্যপাল আসছেন দ্বারোদঘাটনে। কাজটির তদারকির ভার আমার উপর। ফলে ছোট্টাছুটি করতে হচ্ছে উদযাস্ত। কদিন ধরে জয়পুরের রাজার অতিথিশালায় আছি। এখানে থেকেই ভিত্তিপ্রস্তর বসাবার আয়োজন তদারকি করছি। সেদিন কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যাবেলায় গেস্ট হাউসে ফিরে এসে দেখি বারান্দায় চেনা মুখের জটলা। ডাক্তার পিল্লাই, মেহ্‌রা সাহেব আর গুপ্তেজী। দণ্ডকারণ্যে এ অভিজ্ঞতা খুব স্বাভাবিক। বিশাল এলাকা। যে যার নির্দিষ্ট পথে চক্রাবর্তন করে চলেছে। দিনান্তে যখন হাতের কাছে-পাওয়া ডাকবাঙলোতে রাতের মতো মাথা গুঁজতে আসি তখন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এ পাড়ার লোক ও পাড়ার খবর নেয়, ও পাড়ার লোক এ পাড়ার। খুশী হয়ে উঠলাম তাঁদের দেখে। রাতে আড্ডাটা জমবে ভাল। নেপথ্যে বিধাতাপুরুষ বোধ করি হেসেছিলেন।

ডাক্তারসাহেবকে বললাম, আপনার রুগীর খবর কী ?

—যথাপূর্বম।

—আর রোগীর ডাক্তারের ?

—বহাল তবীয়ৎ।

মেহ্‌রা সাহেবকে বলি, মধ্যপ্রদেশের মানুষ উড়িষ্যায় যে ?

শুনলাম উনি এসেছিলেন কোরাপুটে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন-সংস্থার চীফ অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে দেখা করতে। পারলকোটের জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে।

—আর গুপ্তেজী ? আপনি কী মনে করে ?

—আমি এসেছি ভালুক নাচ দেখাতে।

—ভালুক নাচ ! সে আবার কী ? কাকে দেখাতে ?

গুপ্তেজী বললে, কাকে আবার — দর্শকদের। ভালুকওয়ালা যখন পথের ধারে নাচ দেখাবার আয়োজন করে তখন কি সে জানে — কে কে দেখবে নাচ ? সে জানে, তার নিয়তি ডুগুড়ুগি বাজিয়ে ভালুক নাচানো। দর্শক ? ও আপনি জুটে যায় !

কথাটা ভাল লাগল না ! অবশ্য গুপ্তেজী চিরকালই এ রকম সিনিক। সোজা কথা বাঁকিয়ে বলেন। বুঝলাম, আগামী কালের উৎসবে আদিবাসীদের বোধ হয় কোন নাচের প্রোগ্রাম আছে। গুপ্তেজী একটি নাচের দল নিয়ে এসেছেন আশ্বাশুড়ায় ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন উপলক্ষে।

বললাম, এটা কিন্তু অন্যায় বলছেন। যে চোখ দিয়ে আমরা ভালুকনাচ দেখি — আদিবাসীদের নাচ নিশ্চয় আমরা সে চোখ দিয়ে দেখি না।

গুপ্তেজী বললেন, সকলে আপনার মতো সহস্রলোচন না হতে পারেন। আমি তো দেখি বাঁদর-নাচ, ভালুক-নাচ, আদিবাসী নাচ একই জোড়া চর্মচক্ষুতে সকলে দেখে থাকে।

আমি প্রতিবাদ করতে যাই। উদয়শঙ্কর, অ্যানা প্যাব্লোভার নাচও মানুষে ঐ চোখেই দেখে থাকে। কিন্তু আমার আগেই মেহ্রাসাহেব বলে ওঠেন, সত্যিকথা! কেন যে কতারা এই নাচের আয়োজন করেন বুঝি না। কী আছে ঐ নাচে, বাইরের লোক এলেই একদল অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়ে জড়ো করে তাদের নাচাতে হবে?

ডাক্তার পিল্লাই বাধা দিয়ে বলেন, কিছুই কী নেই? ওদের ঐ নাচের মধ্যে দর্শনীয় কিছুই কি নজরে পড়েনি আপনার?

মেহ্রা বিচিত্র হেসে বলেন, একেবারে কিছুই নেই তা বলি না। ও নাচ দেখতে বেশ নেশা ধরে। কিন্তু ঐ অগ্নীল দৃশ্য বাইরের লোককে ডেকে দেখানোর কী দরকার? মুখটা কালো হয়ে ওঠে গুপ্তেজীর।

পিল্লাই কিন্তু তবু হাল ছাড়েন না। বলেন, আমি তো অগ্নীল কিছু দেখিনি।

—আপনি বোধকরি শুকদেব গোস্বামী!

এর উপর কথা চলে না। তবু বললেন পিল্লাই। বলেন, ওদের নাচের রিদম, ছন্দ আর সুর সত্যিই অনবদ্য!

হা হা করে হেসে ওঠেন মেহ্রা। বলেন, মনকে চোখ ঠারছেন কেন ডাক্তার-সাহেব? সত্যি কথাটা স্বীকার করুন। রিদম, ছন্দ আর সুর তো উপভোগ করেন না। আসলে দেখেন অন্য কিছু! হাটে-বাজারে পথে-প্রান্তরে যৌবনবতীদের যা কিছু তবু রাখা-ঢাকা থাকে — নাচের উদ্দামতায় প্রকাশ হয়ে পড়ে! অবদমিত কামনার মূলে সুড়সুড়ি লাগে — আরাম পান — আর মুখে বলেন নৃত্যরসের স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছেন!

এবার পিল্লাই-সাহেবের মুখখানাও কালো হয়ে ওঠে!

বেয়ারা কফির ট্রে এনে নামিয়ে রাখে। সুন্দর কফি সেট, দুর্লভ-ট্রে। কিন্তু জরাজীর্ণ। মহারাজার আমল গেছে। রাজতন্ত্রের যুগ আর নেই। আমরা বারান্দায় বসেছিলাম বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে। সামনেই প্রশস্ত লন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফুলের গাছগুলো আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। শুধু মৃদু একটা সৌরভ ভেসে আসছে বাগানের দিক থেকে। আকাশে শুক্রপক্ষের চাঁদ — আবছা আলোয় বাগানটা মোহময়। কিন্তু সবই কেমন যেন বিষিয়ে উঠল।

একপাত্র র-কফি ঢেলে নিয়ে মেহ্রা জুত করে বসেন। বলেন, আমি মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে একমত। আদিবাসী বাঁদরগুলো জঙ্গলে আছে, জঙ্গলেই থাক। সভ্য-জগতে তাদের ধরে এনে বাঁদর-নাচ দেখানো আমার বরদাস্ত হয় না। ওদের ওসব কলেঙ্কারি বাইরের দুনিয়ার মানুষ যত কম জানতে পারে ততই মঙ্গল!

গুপ্তেজী নির্বাক। নিঃশব্দে কফি কাপে চামচ নাড়তে থাকেন। একবারও বলেন

না — এটা তাঁর মত নয়। অথচ মনে আছে, একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, বাইরের দর্শক যখন আদিবাসী গাঁয়ে যায়, তখন গুপ্তেজী তাদের চোখে দেখেছেন সেই দৃষ্টি যা লক্ষ্য করা যায় চিড়িয়াখানার দর্শকের চোখে, পাগলা-গারদের ভিজিটরের চাহনিতে।

মেহরার যেন আশ মেটেনি, বলেন, কেন যে সরকার এর পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করছেন জানি না। ওদের মধ্যে স্কুল খুললে, ওদের কাপড় পরাতে শেখালেই ওরা সভ্য হয়ে উঠবে? অসম্ভব। ওরা মনেপ্রাণে বর্বর! ওদের শোধরানো যাবে না। শুধু দেখতে হবে, এ কেলেকারির কথা যেন বাইরের জগতে জানাজানি না হয়ে পড়ে।

মনে হল মেহরা ইচ্ছে করে গুপ্তেজীর গায়ে পা তুলে দিচ্ছেন। তাই বললুম, সে ক্ষেত্রে আপনাদের পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্ট আদিবাসী জীবনের যে প্রামাণ্য চিত্র তুলে এনেছে সেটা অন্যায় হয়েছে নিশ্চয় আপনার মতে।

—হয়েছেই তো!

আমি হেসে বললুম, ভাগ্যে শুটিঙের সময় আপনি ছিলেন না। থাকলে নিশ্চয়ই এক্সপোসড্ স্পুলটা ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে কেড়ে নিতেন। অর্ধনগ্ন আদিবাসী রমণীর ছবি নিশ্চয় সভ্য জগতে আনতে দিতেন না!

এতক্ষণে মেহরা-সাহেবের মুখটা কালো হয়ে উঠল। গুপ্তেজী আড়চোখে একবার চাইলেন আমার দিকে। অস্বস্তিকর নীরবতাটাকে স্বাভাবিক খাতে আনবার জন্যই পিল্লাই তাড়াতাড়ি বলেন, কিন্তু কেলেকারী আপনি কোনটাকে বলছেন?

প্রসঙ্গান্তরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন মেহরা। দ্বিগুণ উৎসাহে বলেন, কোনটা নয়? যেমন ধরুন মুরিয়াদের ঘটল। এমন বিস্ত্রী ব্যাপারের কথা সভ্য দুনিয়াকে জানিয়ে কী লাভ? ঘরের কেচ্ছা লুকানোর প্রচেষ্টাই স্বাভাবিক। এই কু-প্রথাটাকে যতদিন না আমরা সমূলে উৎপাটিত করতে পারব ততদিন ওটার কথা চেপে যাওয়াই তো উচিত।

ডাক্তার-সাহেব দৃঢ় প্রতিবাদ করেন, আমি অন্তত আপনার সঙ্গে একমত নই। প্রথমত, এটাকে আমি বিস্ত্রী ব্যাপার বলে মনে করি না, দ্বিতীয়ত বিস্ত্রী হোক, সুস্ত্রী হোক — ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। গোপন করে যাওয়ায় কোনও মঙ্গল নেই।

মেহরা বলেন, বিচার করার আবার আছে কী? অবিবাহিত নরনারী একসাথে রাত্রিবাস করে — তাতে সমাজের প্রত্যক্ষ অনুমোদন আছে — এর চেয়ে নৈতিক অবনতি আর কী হতে পারে?

পিল্লাই হেসে বলেন, আর কী হতে পারে আলোচনার আগে আমি প্রশ্ন করব — এটাকে নৈতিক অবনতির শেষ দৃষ্টান্ত আপনি মনে করছেন কেন? নীতির কোন্ সংজ্ঞায়?

—নীতির সার্বজনীন সংজ্ঞায়। সর্বদেশে সর্বকালে সতীত্বের যে সংজ্ঞা স্বীকৃত, সেই সংজ্ঞায়।

—কিন্তু সতীত্বের সংজ্ঞাটা তো দেশকাল-নিরপেক্ষ একটা কনসেপ্ট নয়। ওদের সমাজে সতীত্বের ধারণাটা অন্যরকম। যেহেতু সেটা আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে না সেই হেতু সেটা খারাপ, এ কথা বলার মধ্যে আর যাই থাক, যুক্তি নেই। দেখতে হবে ওরা যে সংজ্ঞাটা মেনে নিয়েছে তাতে ওদের সমাজজীবনে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে — কেমন করে ওরা তার সমাধান করেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ওদের ঐ ব্যবস্থায় কি আমাদের চেয়ে বেশী শান্তিতে আছে? সভ্য জগৎ আমাদের শিখিয়েছে, প্রাক-বিবাহ জীবনে ছেলেমেয়েদের কোন প্রত্যক্ষ যৌন-অভিজ্ঞতা থাকবে না, দুনিয়ায় প্রায় প্রত্যেকটি সভ্যসমাজ এ নির্দেশ স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিয়েছে। ওরা এটাকে বিনা প্রমাণে মেনে নিতে নারাজ। ওরা জানতে চায় তার কারণ!

মেহ্ৰা-সাহেব নাটকীয় ভঙ্গিতে কানে হাত চাপা দিয়ে বলেন, ইয়ে বাৎ শুন্নাভি গুণাহ্ হ্যায়।

পিল্লাই হেসে বলেন, সিরেফ কান বন্দ্ করনেসে নেহী চলগা মেহ্ৰা-সাব — দো আঁথে ভি বন্দ্ কিজিয়ে।

আমি বললুম কেন চোখ বন্ধ করতে যাব কোন্ দুঃখে?

—চোখ-কান খোলা থাকলে যে ধরা পড়ে যাবেন। ও আইন কেউই মানে না। অবশ্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন সে অপ্রিয় সত্যটাকে চাপা দিতে। মেহ্ৰা সাহেবের ভাষায় ‘ঘরের কেচ্ছা লুকানোর চেষ্টাই স্বাভাবিক।’ আপনারা ভাবেন এতেই সমাজের কল্যাণ। ওরা সেটাকে চাপা না দিয়ে সরাসরি অনুমোদন করে। এই তো তফাত?

আমি তর্কের খাতিরে বলি, কিন্তু আপনি কি একটু বাড়িয়ে বলছেন না?

—আমি তো তা মনে করি না। ১৯৩৮ সালে মিস্ ডারোথি ব্রমলি নামে একজন যৌন-বিজ্ঞানী মহিলা ছয় শ’ জন আমেরিকান ছাত্রের কাছে চিঠি লিখে জানতে চান তাদের অভিজ্ঞতা। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা সত্তরজন চিঠির জবাবে জানিয়েছে প্রাক-বিবাহ জীবনেই তারা জীবনের মূল সত্যের বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। ডাক্তার ডিকিন্সন, ডাঃ কিনসের স্ট্যাটিসটিক্স খুলে দেখুন...

মেহ্ৰা-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, আমেরিকাই সভ্য জগতের একমাত্র প্রতিনিধি নয়।

—মানলাম, বলেন ডাক্তার পিল্লাই। কিন্তু ওরা সত্যবাদী জাত। আমাদের দেশে এ ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স জোগাড়ই করতে পারবেন না। আপনি যদি ছয় শ’ জন ভারতীয়ের কাছে চিঠি লেখেন, তাদের প্রাক-বিবাহ জীবনের অভিজ্ঞতা জানাতে, তা হলে দেখবেন অর্ধেক লোক জবাবই দেবে না সঙ্কোচে — বাকি অর্ধেক সত্য গোপন করবে লজ্জায়।

—আমি বললুম, বাস্তবে কী হয়, কী হচ্ছে, সে কথা বাদ দিয়েও যদি আমি প্রশ্ন করি কী হওয়া উচিত, তাহলে আপনি কী বলবেন? বিবাহপূর্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জিনিসটা বাঞ্ছনীয়, না অবাঞ্ছনীয়?

ডাক্তারবাবু বলেন, আপনারাই বলুন আপনাদের মত। আপনারা কি এটাকে

বাঞ্ছনীয় মনে করেন ?

আমি বললুম, আলবাৎ ! না হলে বিয়ে জিনিসটার খিলটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

আর গুপ্তেজী ? আপনার মত ?

কিছু কোথায় গুপ্তেজী ? তিনি নিঃশব্দে উঠে গেছেন কখন। খটকা লাগল। এমন ভেবে হওয়ার কথা নয় ? যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি তাতে তো গুপ্তেজীর অনাসক্ত হয়ে পড়ার কথা নয় ?

ডাক্তার-সাহেব কিন্তু ক্রমশঃ করলেন না। তর্কে মেতে উঠেছেন। বলেন, তর্কশাস্ত্র বলে বিচারকের কোনরকম ‘বায়াস’ থাকলে একটা ব্যবস্থার ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার থাকে না। আপনারা একটা পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে এ কথা বলছেন !

—এ কথা কেন বলেছেন ?

—হিন্দুসমাজ আমাদের শিখিয়েছিল হিন্দু নারীর একবার মাত্র বিয়ে হবে, বিবাহের পর স্ত্রী হবে একমাত্র স্বামীর ভোগ্যা। স্বামীর মৃত্যুতে সে আবার ব্রহ্মচর্য পালন করবে। এই আইনকে ঘিরে দানা বেঁধে উঠেছিল সতীত্বের ধারণা। মনে হয়েছিল এ ব্যবস্থা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং অনড়। বিধবাবিবাহ এই ধারণাটায় হানল প্রথম আঘাত। হিন্দু কোড বিল দ্বিতীয়। বিদ্যাসাগরমশাই সতীত্ব কথাটার সংজ্ঞাটাকে দিলেন অনেকখানি বদলে — হিন্দু কোড বিল দিল আর এক ধাপ এগিয়ে। প্রতিবারেই পরিবর্তনের প্রস্তাব ওঠামাত্র সমাজ হাঁ হাঁ করে তেড়ে এসেছিল ! মনে হয়েছিল

এ অসম্ভব। মেহরাজীর ভাষায় এতে সভ্য দুনিয়ার বনিয়াদ যাবে ধ্বসে ! তা গায়নি কিন্তু। নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর সমাজ তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েনি। এতদিন আমরা জানতাম, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে প্রজননের গুপ্ত সত্যটা গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যে কত ছেলের জীবন যে আমরা বিষময় করে তুলেছি, কত কুমারী মেয়েকে বলি দিয়েছি ‘উদাসীর মাঠে’ তার লেখাজোখা নেই। তবে হ্যাঁ, আমরা আশ্রয় চেষ্টা করেছি, খবরটা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে। ঘরের কেচ্ছা লুকানোর চেষ্টাই নাকি স্বাভাবিক ! আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, সাম্প্রতিকালে একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন — এ ভুল পথ। ছেলেমেয়েদের ছোট বয়স থেকেই জীবনের মূল সত্যটার বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। জীবনের তথাকথিত গোপন সত্যটা তাঁরা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আপনারা কী মত ? তাঁরা ভুল করেছেন ?

মেহরা সাহেব জবাব দিলেন না।

—আর আজ যদি একদল বৈজ্ঞানিক আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন — কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চাই শুধু থিয়োরিটিক্যাল লেকচারে শেখানো যায় না। যদি, ম্যাজিক-লিগন আর বক্তৃতায় এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার আয়োজন হবে তলে-না-নেমে সাঁতার শেখানোর চেষ্টা — তাহলে আপনি কী বলবেন ?

মেহরা সাহেব আর ধৈর্য সংবরণ করতে পারেন না। তিক্তকণ্ঠে বলেন, দেখুন ডাক্তার-সাহেব, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে.....

বাধা দিয়েই পিছুলাই বললেন, আই বেগ টু ডিফার ! দুনিয়ায় এমন অনেক জিনিস

আছে যার নিজস্ব সীমারেখা নেই — আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী সীমারেখা টানি। অনন্ত আকাশকে বলি সিলেস্টিয়াল স্ফিয়ার, আবাত্তমানসগোচরকে গুটিয়ে আনি নারায়ণ-শীলায়! বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধবাবিবাহের প্রস্তাব আনেন তখন সেটাকে দিক্চক্রবালের শেষ সীমান্ত বলে মনে হয়েছিল। হিন্দু কোড বিল যখন এল তখন বুঝলাম যেটাকে সেদিন দিগন্তের বন্ধিরেখা মনে হয়েছিল আসলে সেটা চশমার ব্রীজ! বিবাহবিচ্ছেদ আইন পাস হবার পর আপনি এখন বলছেন এইটেই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত! মেনে নিই কোন্ যুক্তিতে? দিগন্তরেখার তো কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই — ওটা একটা সাব্জেকটিভ কনসেপ্ট। ওর পরেও দুনিয়া আছে! ওটা আপনার বদ্ধমূল সংস্কারের দিগন্ত মাত্র!

ডাক্তারবাবু থামলেন। মেহ্‌রা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। গুপ্তেজী আগেই রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে গেছেন। আমি বললুম, বেশ যদি মেনেও নিই, তবু বলব — আপনি যে প্রস্তাব করছেন তাতে অনেক নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

—পারেই তো! কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান তো সহজ হল। নতুন যে সমস্যা দেখা দিল, দেখতে হবে তার নতুন সমাধান কেমন করে পাওয়া যায়।

—কিন্তু নতুন সমস্যা মূল সমস্যার চেয়ে কঠিনতর হতে পারে। ছেলেমেয়েদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় যে ক্ষতি হচ্ছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যবস্থায় তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অবাঞ্ছিত শিশুর বন্যায় সমাজ ভেসে যেতে পারে। ভ্রূণ-হত্যার হার বেড়ে যেতে পারে...

বাধা দিয়ে ডাক্তার সাহেব বলেন, যেতে পারে, আবার নাও পারে। সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, ভেরিয়ার এলুইন সাহেব দুই হাজারটি মুরিয়া বিবাহ পরীক্ষা করেছিলেন — তার মধ্যে মাত্র ছাব্বিশটি ক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনার জন্যে চলিক বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল। মাত্র শতকরা 1.3 ক্ষেত্রে। খুব বেশী নয় নিশ্চয়। আর লক্ষ্য করার বিষয় — এই ছাব্বিশটি ক্ষেত্রেই সহজ সমাধান হয়েছিল বিবাহের মাধ্যমে।

আমি বললুম, কিন্তু এত অবাধ মেলামেশা সত্ত্বেও সে দুর্ঘটনা এত কম ক্ষেত্রে ঘটছে কেন?

—সেই রিসার্চই তো করছি। কয়েকটি কারণ আন্দাজও করেছি, তবে মতামতটা জানাবার মতো সংখ্যাতত্ত্ব এখনও হাতে নেই। সেই জন্যই তো বলছি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর বিচার করতে হবে। আধুনিকতার প্রতিযোগিতায় এই আদিম মানুষগুলি আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে এ কথা সবিনয়ে স্বীকার করে নিন। ভারতবর্ষের স্কুল-কলেজে বাৎসরিক পড়ানো হয় না, পশ্চিমের আধুনিক বিদ্যায়তনে ওরা থিওরেটিক্যাল ক্লাস খোলার সাহস দেখিয়েছে। মানবিকতার উৎসমুখের এ মানুষগুলি মোহনার মানুষদের উপর টেকা দিয়ে এগিয়ে গেছে আরও এক ধাপ। প্রাকটিকাল ল্যাবরেটরি খুলে বসে আছে কয়েক শ', অথবা কয়েক হাজার বছর আগে। তার ফলাফল আমরা দেখে শিখতে পারি, ঠেকে শেখার আগে!

—বেশ তো, বলুন না কী শিখলেন ?

—দেখাও শেষ হয়নি, শেখাও নয়। তবে এ পর্যন্ত শিখেছি অনেক কিছু। প্রথমত, সাম্যের চূড়ান্ত জয়। ঘটুলের প্রত্যেকটি সভ্য-সভ্যা যাতে সমান অধিকার পায় সেদিকে ওদের কড়া নজর। মার্কস-এঙ্গেলস্ আমাদের অর্থনৈতিক সাম্য দিয়েছেন — কিন্তু একটি সুন্দরী মেয়েকে একটি রূপহীনা হতভাগিনীর সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসাতে পারেননি। একটি পশু ছেলের অন্নের সংস্থান করেছেন — কিন্তু মানুষ কি শুধু উদর নিয়ে বাঁচে ? মুরিয়া সমাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছে। ঘটুলের সব ছেলেমেয়ের ওপর সব মেয়ে-ছেলের সমান অধিকার। শিরপুরী ঘটুলের একটা সত্য ঘটনা বলি। সেখানে একটি চেলিক ছিল, তার নাম চেয়াং। হঠাৎ তার বসন্ত হল। বেঁচে গেল প্রাণে, কিন্তু একটি চোখ কানা হয়ে গেল — মুখেও হল বিস্ত্রী বসন্তের দাগ। শিরপুরী ঘটুলে সবচেয়ে সুন্দরী মোটিয়ারী দুলোসা। দীর্ঘ রোগভোগের পর চেয়াং যেদিন প্রথম ঘটুলে এল সেদিন কোতোয়ার নির্দেশ দিল, সে দুলোসাকে নিয়ে শোবে। আহা, বেচারী কতদিন পর ঘটুলে এল ! কিন্তু বাধ সাধলো দুলোসা নিজেই। বেঁকে বসল সে। কিছুতেই যাবে না চেয়াঙের ‘মাসানি’তে। সবাই ছি-ছি করে ওঠে। দুলোসা কিন্তু অটল। সুন্দরী দুলোসার প্রতি সবাই অনুরাগী — সেই মূলধনের ভরসায় সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল চেয়াঙের ‘মাসানি’তে যেতে। এ ক্ষেত্রে শিরদারের বিচার করে রায় দেবার কথা। শিরদার বলল, সে নিজে বিচার করবে না। সে জানতে চায় পাঁচজনে কী বলে। আপনারা যাকে ভোট দেওয়া বলেন, তাই দিল সকলে। ব্যালট-ভোট নয়, প্রকাশ্যে হাত তুলে। একজনও সুন্দরী দুলোসার পক্ষে ভোট দিল না। তাকে যেতেই হল চেয়াঙের মাসানিতে। অসংখ্যবার এ দৃশ্য দেখেছি আমি। ভানপুরী ঘটুলের দারোগা ছেলেটি অন্ধ। চক্রবেড়া ঘটুলের কোতোয়ারের একটি পা নেই। চক্রবেড়া হচ্ছে জোড়িদার ঘটুল। সে ঘটুলের সবচেয়ে

ভেরিয়ার সাহেবের সংকলিত একটি হিসাব :

সর্বসম্মত পরীক্ষিত বিবাহিত মুরিয়া রমণী	...	2,000
বিবাহের এক মাসের মধ্যে প্রথম সন্তান	...	1
দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে ঐ	...	7
চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে ঐ	...	21
সাত থেকে নয় মাসের মধ্যে ঐ	...	17
অর্থাৎ বিবাহের নয় মাসের মধ্যে ঐ	...	46
		(2.3 শতাংশ)
এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ঐ	...	1,692
		(84.6 শতাংশ)
সন্তান জন্মানোর সঠিক সময় জানা যায় না	...	112
		(5.6 শতাংশ)
সন্তান আদৌ জন্মায়নি	...	150
		(7.5 শতাংশ)

সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কোতোয়ারের জোড় হয়েছিল। সভ্য দুনিয়ায় আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন পঙ্গু ছেলেমেয়েরা মুখ চুন করে ঘুরে বেড়ায়...

মেহরা বাধা দিয়ে বলেন — কিন্তু আমরাও পঙ্গু ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে উদাসীন নই। মুক-বধির-অন্ধদের স্কুল সভ্য জগতেও আছে। আমরাও ছেলেমেয়েদের শেখাই, ‘কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না।’

ডাক্তার-সাহেব জোর দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু একটু তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি ‘কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না’ — এ উপদেশের হাইপথেটিক্যাল অ্যাসাম্পশন হচ্ছে ‘কানাখোঁড়া একগুণ বাড়া!’ তবে নাকি আমরা সভ্য, তাই প্রকাশ্যে কানাকে বলি পদ্মলোচন, খোঁড়াকে বলি টেনজিং নোরকে! আড়ালে তাই নিয়ে হাসাহাসি করি, তাতে দোষ নেই। কারণ সভ্য সমাজের মূল শিক্ষাটাই হচ্ছে ভিতরে ‘ছুঁচোর কেতন’ চলে চলুক — বাইরে ‘কোঁচার পতনটা চাই’। এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলেছেন আপনি, ‘ঘরের কেচ্ছা লুকাতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক!’ ওরা কিন্তু মনে-মুখে এক। তাই চেয়াং ওদের কাছে কানা নয়, চেলিক-কোতোয়ার খোঁড়া নয়, সে মানুষ।

আমি বলি, ডাক্তারসাহেব, আপনি মোদা কী বলতে চাইছেন? এই মাড়িয়া-মুরিয়া-ভাত্রা শবরদের সব ব্যবস্থাই ভাল? আমাদের অনুকরণযোগ্য? ‘দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর?’

—আমি তো তা বলিনি। মাড়িয়াদের মধ্যে নরবলি দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল। ওদের বিশ্বাস, নতুন, অকর্ষিত জমিতে প্রথম চাষ করার আগে ভূমিমাকে রক্তপান করাতে হয়। জোর করে এ প্রথা রদ করা হয়েছে। এখনও ওরা কুমারী ভূমি কর্ষণ করার আগে বলি দেয় — তবে মানুষ নয়, মুরগী। এ পরিবর্তনে আমি তো কোন আপত্তি করিনি। কিন্তু তাই বলে উন্নাসিক অভিমানে দূর থেকে ওদের সব কিছুকেই আদিম অসভ্যতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বরতা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। খোলা মন নিয়ে ওদের প্রতিটি ব্যবস্থা যদি বিচার করে দেখবার ক্ষমতা আপনার না থাকে তবে আমি বলব — আপনার মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন!

আলোচনায় বাধা পড়ে। গেস্ট হাউসের স্টুয়ার্ড এসে সবিনয়ে নিবেদন করে, ডিনার রেডি!

উঠে পড়তে হল। গুপ্তেজীকেও ডেকে পাঠালাম। চারজনে উঠে গেলাম ভিতরের বড় খানা-কামরায়।

আমার আর পিল্লাই সাহেবের বিছানা হয়েছে এক ঘরে। আদালী নন্দু থাপা বিছানা পেতে রেখেছে। আহাঙ্গাদির পর জামা-কাপড় বদলে শোবার উপক্রম করছি, পিল্লাই সাহেব বলেন, আপনারা বন্ধু গুপ্তেজীর কি মাথা খারাপ?

চমকে উঠে বলি, হঠাৎ এ কথা কেন?

—খাবার পরে বাইরের নির্জন বারান্দা দিয়ে আসছি, অন্ধকারের মধ্যে ভদ্রলোক এসে চেপে ধরলেন আমার হাত দুটো! বললেন — ‘কংগ্র্যাচুলেশন্স!’ আমি বললুম — ‘কিসের জন্য’? তার জবাবে ভদ্রলোক বললেন — ‘ঈশ্বর আপনার মঙ্গল

করবেন।' বলেই ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে।

আমি বললুম, ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে!

—তাইতো মনে হয়।

পিল্লাই সাহেব বাতি নিবিয়ে দিলেন!

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে সেই একই প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। ডাক্তার পিল্লাই বললেন, আমার একটা পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে করে।

—কী পরীক্ষা?

—একটি মাড়িয়া ছেলে বা মেয়েকে সভ্য জগতে নিয়ে এসে মানুষ করলে কী হয়।

রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে মেহ্ৰা সাহেব বলেন, আমি একটি ঘটনা জানি! এক ভদ্রলোক সে চেষ্টা করেছিলেন — কিন্তু ফল হয়েছিল করুণ।

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে সাতটা। নটার সময় আবার বের হবার কথা। সুতরাং উস্কে দেওয়া চলতে পারে মেহ্ৰা-সাহেবকে। বললুম, ঘটনাটা আমরা শুনতে পাই না?

মেহ্ৰা বলেন, আমার আপত্তি নেই। তবে আপনাদের হাতে সময় আছে তো?

ডাক্তার-সাহেব বলেন, আমার তাড়া নেই।

গুপ্তেজী হাঁ-না কিছুই বলেন না।

গল্প শুরু করেন মেহ্ৰা সাহেব।

—আপনারা জানেন নিশ্চয় — এই দণ্ডকারণ্য থেকে নানান জাতের আদিবাসীকে চালান দেওয়া হত আসামের চা বাগানে। দেশ স্বাধীন হবার পর চা-বাগানের সাহেবরা অনেকে বাগান বেচে দিয়ে বিলেতে ফিরে গেল। এখানে শ্রমিক-সরবরাহের যে বিলাতী প্রতিষ্ঠানটি ছিল তারাও চাটি-বাটি গোটালো। সরকার সমস্ত সম্পত্তিটা কিনে নিলেন। আমাকে পাঠান হল সম্পত্তির দখল নিতে। কোম্পানির মালিক মিস্টার স্যামুয়েল বারওয়েল মধ্যবয়সী অমায়িক ভদ্রলোক। আমাকে সম্পত্তি হস্তান্তরিত করে বিলেত চলে গেলেন। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দখল নিতে গিয়ে দেখি এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা অক্শান করে বেচে দিতে হবে। গল্ফ স্টিক, বিলিয়ার্ডস্ টেবিল, পিয়ানো, গ্রামাফোন। গুদামঘর থেকে বের হল পুরানো 'পাঞ্চ' আর 'লন্ডন টাইমস্'। আরও কত ধূলিজীর্ণ নথিপত্র। ঘাঁটতে ঘাঁটতে উদ্ধার করলাম খান-চারেক প্রাচীন ডায়েরি। লেখকের নাম আর্নেস্ট স্টোন। সম্পত্তির বর্তমান মালিক স্যামুয়েল বারওয়েলের বাপের নাম দলিলে দেখছি ডেভিড বারওয়েল। অথচ ডায়েরি পড়ে মনে হয় এই স্টোন-সাহেব ছিলেন এককালে সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক। কোন সূত্রে সেটা হাত বদলিয়ে এল বারওয়েল পরিবারের হাতে? যাই হোক, ডায়েরির কয়েকপাতা পড়েই মনে হল ভদ্রলোক গহন অরণ্যে শ্রমিক সংগ্রহ ব্যবসা না করে যদি ইংরাজি উপন্যাস লিখতেন তাহলে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

...ঐ ডায়েরি চারখানি পরবর্তীকালে আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। মেহ্ৰা সাহেবের কাছ থেকে সেই চারখানি ডায়েরি এনে পড়েছিলাম জগদলপুরে গিয়ে।

সত্যকথাই বলেছিলেন মেহূরা-সাহেব। অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বিজন অরণ্যের মধ্যে কয়েকটি বিদেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল দিনলিপির যাদুস্পর্শে। এ কাহিনীর শুরুও জানি না, শেষও জানি না — কিন্তু ঐ জরাজীর্ণ ডায়েরির পাতায় বিধৃত হয়ে আছে ‘দি নুকের’ হাসি-অশ্রু বিজরিত এক খণ্ডকালের ইতিকথা।

‘উনিশশ’ সাত, আট, নয়, আর দুই বছর বাদ দিয়ে বারো।

‘উনিশশ’ সাতের ডায়েরিতে দেখি বিপত্নীক এক প্রবাসী খাঁটি ইংরাজ ভদ্রলোককে। আর্নেস্ট স্টোন। নিজের চেহারার বর্ণনা নেই দিনলিপিতে। বয়স তখন বাহান্ন। সংসারে একমাত্র অবলম্বন তাঁর মেয়ে ডেইজি। তার বর্ণনা আছে। কিন্তু বর্ণনা থাক। ‘উনিশশ’ সাতের বারোই মার্চ মিস্টার স্টোন দিনপঞ্জিতে লিখেছেন :

“ডেইজি আজ একুশ বছরে পড়ল। ওরা মা নেই। আমিই ওর বাপ, আমিই ওর মা। ডেইজির যদি একটা ভাই অথবা বোন থাকত, তাহলে সে হয়তো এমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ত না। ওর সঙ্গী নেই—এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয়। বাহান্ন বছরের বুড়ো বাবা কেমন করে পাল্লা দেবে একুশ বছরের মেয়ের সাথে। তাই বোধ হয় আমরা দুজনেই আত্মকেন্দ্রিক। ‘দি নুক’কে কেন্দ্র করে আমরা একটা বৃত্ত টেনেছি। তার বাইরে আমরা সচরাচর যাই না। না, ভুল বললুম। বৃত্ত নয়, উপবৃত্ত। ইলিপস! দি নুক হ্যাজ নো সেন্টার — ইট হ্যাজ টু ফোসাই, বেবি অ্যান্ড হার পুয়ের ওন্ড ড্যাডি।

“যাক, যা বলছিলাম। বেবি আজ একুশ বছরে পড়ল। ছোট্ট আয়োজন করেছিল তার বাপ। ফাদার জোনস্ এসেছিলেন, মিস্টার এন্ড মিসেস বারওয়েল এসেছিলেন, গেরিয়েল, ডক্টর স্টিভেনস — আর আমরা দুজন। না ভুল হল আবার, বাদ দিয়েছি বারওয়েল জুনিয়রকে। মারাত্মক ভুল। মিসেস বারওয়েল বেবিকে যে চমৎকার ব্রোচটা দিলেন সেটা পেয়ে বেবি যত খুশী হয়েছে, তার চেয়ে বেশি খুশী হয়েছে বারওয়েল দি জুনিয়ারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। বস্তুত বুড়োবুড়ির সমাবেশে ডেভিড বারওয়েলের এই ভাইপোটিকে আমার ভালো লেগেছে। চমৎকার ছেলে। সম্প্রতি এসেছে বিলেত থেকে। ভারতবর্ষ দেখতে এসেছিল, এখন বলছে এখানেই থেকে যেতে চায়। আমার মতো ও বোধহয় এই অদ্ভুত দেশটার প্রেমে পড়ে গেছে। সাবধান ডেভিড, এ বড় সাংঘাতিক দেশ — একেবারে অক্টোপাস। যাকে ধরে, তাকে আর ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত আমার মতো পচে মরতে হবে অরণ্য-পর্বতে!”

বোধকরি নেপথ্যচারী একজন সেদিন হেসেছিলেন। সেই উনিশ শ সাত সনের বারোই মার্চ, আর্নেস্ট স্টোন যখন ডায়েরির পাতায় ডেভিডের উদ্দেশে এ সাবধানবাণী লেখেন। বারওয়েলের ভাইপো ডেভিড বারওয়েল উত্তরকালে এই অরণ্য-পর্বতের মায়াবন্ধন সত্যিই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সেই ‘বারওয়েল-ভিলা’ থেকে সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসতো ‘দি নুকে’। আর্নেস্ট স্টোনের আইভি-লতায় ঘেরা পাথরের বাংলো- বাড়ির ফটকে সন্ধ্যা হলেই ঝলতো একটা কেরোসিনের বাতি। ডাইনোমো তখনও বসেনি! ফটকের পিলারে একটা কুলুঙ্গি! তার ভিতরে ঝলে সন্ধ্যাপ্রদীপ। কাঁচের গায়ে লেখা ‘দি নুক’। ফটক থেকে লাল

কাঁকরের পথটা এসে আশ্রয় খুঁজেছে মোটা মোটা ‘ডোরিক’ থামওয়ালা গাড়িবারান্দার তলায়। দুধারে নানান জাতের ফুলের গাছ — বিলাতী মরশুমি চারা, আর ক্যাকটাস। বৃহদায়তন টব, নানান জাতের পাম। গেটের উপর লতানে জুঁই। ডানহাতি দারোয়ানের কুটুরি, বাঁয়ে একটি ছোট ঘর, তার গায়ে কাঠের ফলকে লেখা ‘কেনেল’। একজোড়া পুড়ল থাকত তাতে। গাড়ি-বারান্দা পার হলেই সামনের বড়-কামরা। ড্রইংরুম। দেওয়ালে ট্যান করা বাঘ-ভালুক আর হরিণের চামড়া, মোষের শিং, সম্বরের স্টাফ্‌ড মাথা। পিয়ানো, বুককেস আর ডোম বসানো সেজবাতি।

এই ছিল রাজ্য। রাজ্যে রানী নেই। রাজা দিবারাত্র কোম্পানির কাজে ব্যস্ত। এ রাজ্যের নিঃসঙ্গ বাসিন্দা ছিল রাজকুমারী ডেইজি, বুড়ো আর্নেস্টের বেবি। পোষা হরিণ, খরগোশ, এক ঝাঁক পায়রা আর পুড়ল দুটো ছাড়া আর কোন বন্ধু নেই তার। এমন নিঃসঙ্গ মিরান্ডার জীবনে এল নায়ক। ডেভিড বারওয়েল। সাতাশ বছরের তারুণ্যের প্রতীক। পক্ষিরাজ ঘোড়ায় নয়, সাইকেলে চেপে সে আসত সাতমাইল পথ পাড়ি দিয়ে।

তারপর যা হয়ে থাকে। সাতই আগস্ট আর্নেস্ট স্টোন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন :

“যা অনুমান করেছিলাম তাই হল। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। ডায়েরির এই পাতাটা কালো কালিতে নয়, সোনার জলে লেখা উচিত ছিল আমার। আজ ডেভিড এসে আমাকে জানালে সে আমার বেবিকে বিয়ে করতে চায়। বললুম, ডেইজির কাছে প্রপোস করেছ? ডেভিড বললে — সে ভরসা না দিলে কি এ দুঃসাহস দেখাতে পারি?

“দুজনকে ডেকে এনে আশীর্বাদ করলাম। কাল একবার বারওয়েল ভিলায় যেতে হবে। ডেভিড ছেলেটি বেশ ভাল। বিনয়ী, বুদ্ধিমান, দরদী আর কর্মঠ। আমি নিশ্চিত। বেবির মা বেঁচে থাকলে এমন জামাই পছন্দ হত তার। বেবি সুখী হবে। করুণাময় ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।

“কিন্তু তুমি? তোমার কী গতি হবে আর্নেস্ট স্টোন? এই নির্বাক পাষণপূরীতে তুমি কী নিয়ে বেঁচে থাকবে? সারাদিনের শ্রমে ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে যখন ফিরে আসবে ‘নুকে’ তখন দেখতে পাবে না, দক্ষিণের ঘরে কোনও আলোর রেখা। ড্রইংরুমে বসে থাকবে না কোন অভিমানিনী — কেন রাত হল ফিরতে তার কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে! ব্যালেন্স শীট যখন মিলতে চাইবে না তখন কেউ খাতাপত্র কেড়ে নিয়ে বলবে না — উলের গুলি পাকিয়ে দাও দেখি, তোমার জন্যে একটা দস্তানা বুনব। মধ্যরাত্রে নাইট-গাউন-পরা কোন অভিভাবিকা এসে সেজবাতি নিবিয়ে দিয়ে বলবে না — এত রাত জেগে কাজ করলে শরীর খারাপ করবে!

“কিন্তু এসব তুমি কী বলছ, স্টোন? এ চিন্তা যে তোমাকে দুর্বল করে দেবে। মেয়েকে বিদায় জানাতে যে তোমার চোখে জল এসে যাবে! তুমি না ডেভনশায়ারের বিখ্যাত স্টোন বংশের ছেলে? তোমার পূর্বপুরুষ না ট্রাফালগারের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে? তোমার চোখে জল? ছিঃ!”

বুড়ো স্টোনের আশঙ্কা কিন্তু সত্য হল না। মেয়ে বেঁকে বসল। বাপকে ছেড়ে

সে কিছুতেই যাবে না। বুড়ো তাকে কত বোঝাল ! এই হচ্ছে পুরুষ মানুষের জীবন। মেয়ের বিয়ে হলে বাপকে একলা থাকতে হয়। এই হচ্ছে মেয়েমানুষের নিয়তি। পুরাতন আবাস ছেড়ে তাকে নতুন নীড় রচনা করতে হয়। বুড়ো স্টোন বললে, বেবি, আমি শুধু তোমার বাপ নেই, আমি তোমার মাও। আমি বলছি—তুই ওকে বিয়ে কর, তুই সুখী হবি।

মেয়ে বললে, ড্যাড ! কিন্তু আমি যে শুধু তোমার মেয়ে নেই, আমি যে তোমার ছেলেও ! তার পর বাপের বুকে মুখ লুকিয়ে বললে, — তোমার বেবিকে না দেখলে তুমি আর পাঁচ বছরও বাঁচবে না বাবা !

জবাব দেবে কি, ট্রাফালগার যুদ্ধের বীর সৈনিকের অধঃস্তন পুরুষ হু হু করে কঁদে ফেললে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

সমাধানের পথের সন্ধান দিল ডেভিড বারওয়েল। বললে, মিস্টার স্টোন তোমার বয়স হয়েছে। এতবড় ব্যবসা তোমার পক্ষে একা দেখাশোনা করা সম্ভবপর নয়। যু নিডঅ্যান অ্যাসিস্টেন্ট। তুমি আমাকেই নাও না ? আমাকে তোমার ফার্মের পার্টনার করতে পার, কর্মচারীও করতে পার। আমি সবচেয়েই রাজি। আমার তরফে শুধু একটিমাত্র শর্ত !

হাতে স্বর্গ পেল স্টোন। তবু দূর দূর বুকে বলে, কী শর্ত ?

—মিস স্টোনের পরিচয় এরপর থেকে হবে মিসেস ডেভিড বারওয়েল।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বুড়োর। হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে বললে — সো যু প্রপোজ টু সার্ভ অ্যাজ লামহাদা ?

—লামহাদা ? হোয়াসার্ট ? — নবাগত ডেভিড বুঝতে পারে না রসিকতাটা।

বুঝেছে ডেইজি। বাপের গালে একটা চুমু খেয়ে বলে, যু নটি ওল্ড বয়।

আনন্দের জোয়ার এসে লাগল অরণ্যপ্রান্তের নিভৃত ‘নুকে’-এ। রোজই পার্টি, পিকনিক, শিকার। রায়পুর থেকে, ভাইজাগ থেকে এমনকি সুদূর কলকাতা থেকে এলেন বন্ধু-বান্ধব — নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানাতে। বৃদ্ধ ফাদার জোনস নিজে বিবাহ দিলেন ওদের।

ডায়েরির বাকি কয় মাসের পাতা ছাপিয়ে আনন্দশ্রোত যেন উপছিয়ে পড়েছে পরের বছরের ডায়েরিতে। ডেভিড অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অত্যন্ত পরিশ্রমী, ডেভিড তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করবে। বাবুর চুরি সে বন্ধ করেছে, বাবুর অত্যাচার সভয়ে থেমে গেছে।

বাবু বলতে ম্যানেজার পি. এল. মিশ্র। কলকাতাবাসী বন্ধুদের অনুকরণে আর্নেস্ট স্টোন তাঁর দেশীয় কর্মচারীকে ‘বাবু’ বলে ডাকতেন। মিশ্রজী লোকটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন দিনপঞ্জিতে। মিশ্র ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। তাঁর প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। আর্নেস্ট স্টোন বহুবার বহুজনের মুখে শুনেছেন মিশ্রের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ। মিশ্র এ প্রতিষ্ঠানের অর্থ বেনামীতে খাটাচ্ছে। মিশ্র আদিবাসী গ্রামে অন্যায় অত্যাচার চালিয়ে চা-বাগানের শ্রমিক সংগ্রহ করছে। সবই শুনেছেন, হাতে-নাতে ধরতে পারেননি। তাছাড়া ঘাঁটাতেও সাহস

হত না মিশ্রকে। মিশ্র শুধু ভয় করত ডেইজিকে। তবু সে মেয়েমানুষ — কতটুকু প্রতিবাদের সহস হবে তার? তা সত্ত্বেও, একদিন, মনে আছে স্টোনের — ডেইজি এসে বাপের সামনেই কঠিন ধমক দিয়েছিল মিশ্রকে; বলেছিল, ছোট্ট পারাণ্ডের চায়েতুকে নাকি আপনি মদ খাইয়ে অচৈতন্য মাতাল অবস্থায় রিক্রুট-ভ্যানে তুলে দিয়েছেন?

মিশ্র খতমত খেয়ে বলেছিল, কে বললে?

—কে বললে সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করতে কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে?

মিশ্র সামলে নিয়ে বলেছিল, বাজে কথা! এইতো টিপছাপ দেওয়া চুক্তিপত্র আছে আমার কাছে। চায়েতু স্বেচ্ছায় দাদনপত্র নিয়ে টিপছাপ দিয়ে গাড়িতে উঠেছে।

সোনালী চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে ডেইজি বলেছিল, ছি, ছি, ছি! আপনি না ভারতবাসী? আমরা ইংরাজ হয়ে যা করতে চাই না আপনি টাকার লোভে তাই করেছেন? চায়েতুর বৌ আমার কাছে এসে সব কথা বলেছে। আই ওয়ার্ন যু মিস্টার মিশ্র। দ্বিতীয়বার আমার বাবার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেন এ কথা না শুনি!

স্তুভিত হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন আর্নেস্ট স্টোন। ডেইজির বয়স তখন কত হবে? পনের? ষোলো?

সেই মিশ্রকে সায়েস্তা করে দিয়েছে ডেভিড। হান্টার দেখিয়ে বলেছে, এ কথা যদি তোমার নামে দ্বিতীয়বার শুনি তাহলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব!

মিস্টার স্টোন জনান্তিকে ডেভিডকে ডেকে বলেছিলেন, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ডেভিড? লোকটা যদি ইস্তফা দিয়ে বসে? তাহলে কী করবে?

—তৎক্ষণাৎ রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করব। — ডেভিডের সাফ জবাব। আপনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী। ঐ রকম অর্থলোভী অত্যাচারী নীচ ম্যানেজার না থাকলে আপনি আরও সহজে আরও অনেক বেশি শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারতেন।

মিশ্র পদত্যাগপত্র পেশ করতে আসেনি। সাবধান হয়ে গিয়েছিল সে।

বৃদ্ধ স্টোন দ্বিগুণ উৎসাহে ব্যবসা বিস্তারে মন দিলেন।

কিন্তু বিধাতা এবার বাধ সাধলেন!

উনিশ'শ আট সনের সতেরই ডিসেম্বর। আর্নেস্ট স্টোনের ডায়েরিতে অল্প কয়েকটি ছত্র লেখা আছে — ‘কোরাপুটের সিমেটারিতে আমার বেবিমাঙ্গিকে শুইয়ে রেখে এলাম। শ্বেত-করবী গাছের তলায়। সাদা ফুল খুব ভালবাসত বেবি!

ডিসেম্বর মাসের বাকি কটা পাতা শ্বেত-করবী ফুলের মতই সাদা।

পরের বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আর্নেস্ট স্টোন লিখছেন:—

“মুশ্কিল হয়েছে বাচ্চাটাকে নিয়ে। অতটুকু বাচ্চাকে আমি কেমন করে মানুষ করব? অথচ প্রায় মাসখানেক হতে চলল। হাসপাতাল থেকে মেজর গেব্রিয়েল তাগাদা দিচ্ছেন। যা হয় মতিস্থির করতে হবে। মিসেস বারওয়েল ডেভিডের পরামর্শটাই গ্রহণ করতে বলেছেন। কিন্তু তা কেমন করে হবে? আমার বেবি মায়ের ছেলে ‘নুকে’ মানুষ হবে না? বেবিও শৈশবে মাতৃহারা। তাকে তো মানুষ করে তুলেছিলাম।

এবার সাহস পাচ্ছি না কেন ? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি ? কিন্তু ডেভিড বন্ধপরিকর। ছেলেকে সে কোনও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে চায়। যায় যাক ! আমি বাধাদেব না। এ অরণ্যপর্বতের সঙ্গে ডেভিডের নাড়ির যোগ নেই। সে এখানে নোঙর গেড়েছিল ডেইজির আকর্ষণে। ডেইজি নেই — তাই জাহাজও আর বন্দরে থাকতে চাইছে না। কিন্তু আর্নেস্ট ? তুমি কী করবে ? তুমি তো জাহাজ নও, তুমি গাছ। এই অরণ্যে শিকড় গেড়েছ তুমি — এর আলো-বাতাস, জ্যোৎস্না, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত তোমাকে প্রাণের নিবিড় টানে একান্ত করে বেঁধে রেখেছে। তোমার তো মুক্তি নেই !”

অরণ্যের একটা প্রাণময় সত্তা আছে। মানুষের মতো সেও জানে নিবিড় করে ভালবাসতে। স্থাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্য রমণীর হৃদয়ের মতোই দুর্গম, রহস্যময়ী। তার আকর্ষণও তেমনি অমোঘ। আর্নেস্ট স্টোন এ অরণ্যের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছেন। মুক্তির স্বপ্ন তাই তিনি দেখেন না। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার পালা যৌবনের প্রারম্ভেই একদফা হয়ে গেছে। হার মানেননি। জীবন-সঙ্গিনীকে হারিয়ে হাল ছাড়েন-নি। বেবিকে জড়িয়ে খাড়া হয়েছিলেন এতদিন। আজ আর সে বয়স নেই — না থাক, তবু তিনি ডেভনশায়ারের স্টোন পরিবারের ছেলে, নতি স্বীকার করলেন না নিয়তির কাছে। জীবনের অপরাহ্নে এসে নতুন করে শুরু করলেন খেলা — এবার আবার নতুন ঘুঁটি — বেবির বাচ্চা: স্যাম !

বুড়ো স্টোন দিনসাতেক পরে ডায়েরিতে লিখেছেন, “ডেভিডকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিই দিলাম। যে কাণ্ডটা করেছে তারপর তাকে যেতে দেওয়াই মঙ্গল। ও পাগল হয়ে যাবে এখানে থাকলে। কাল সন্ধ্যাবেলা হল বিদ্রোহী কাণ্ডটা। অফিসের বাবুরা এল দল বেঁধে। মিশ্রের জামা তুলে দেখালে আমাকে। পিঠে সত্যি চাবুকের দাগ। বাবুরা বললে — এর প্রতিকার না হলে তারা থানায় যাবে। অনেক বুঝিয়ে শেষে তাদের ঠাণ্ডা করি। গভীর রাত্রে ডেভিড ফিরল। মদে চুর হয়ে আছে। তবু তখনই তাকে ডেকে পাঠালুম। এসে দাঁড়ালো ঘোলা চোখ দুটো আমার মুখে মেলে। বললুম, মিশ্রকে চাবকেছ ?

বললে, হ্যাঁ।

—কেন !

—ইট ওয়াজ দ্য লাস্ট ডিজায়ার অফ ডেইজি !

—বুঝতে পারিনা ও মাতলামি করেছে, না পাগলামি ! কী আর বলব, তবু বললুম, তুমি কি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত নও ?

ও বললে, হ্যাঁ অনুতপ্ত। আই শুড্ রাদার হ্যাভ ইউস্‌ড মাই রিভলভার।

বললুম, তুমি মুক্তি চেয়েছিলে ডেভিড ! তোমাকে মুক্তিই দিলুম আমি।

মাতালটা বললে, “থ্যাংক্স !”

ডায়েরির পরের কয় পৃষ্ঠা পড়ে বুঝতে পারি পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন তিনি। ডেভিড নয়, আর্নেস্ট স্টোন। কিন্তু ডেভিড থাকেনি। ফিরে গিয়েছিল স্বদেশে। মিশ্রের অপরাধটা শুনেছিলেন পরে। মেয়েটিকে নিয়ে এসে তুলেছিলেন নিজের বাড়িতে।

শুনেছিলেন তার করুণ ইতিহাস :

মেয়েটির নাম লিখমু। আর্নেস্ট তাকে বরাবর মেরিয়া নামে উল্লেখ করে গেছেন! বোধকরি লিখমুর এ নামকরণ তিনিই করেছিলেন। মেরিয়ার বাড়ি ছিল বড়া পারাও গাঁয়ে। মাত্র দু বছর হল বিয়ে হয়েছে। ডেইজির চেয়ে অল্প ছোট হবে হয়তো বয়েসে। স্বামী ছিল ঘটুলের কোতোয়ার। মিশ্র তাকে দাদন দিয়ে টিপছাপ নিয়েছিল। মেরিয়া বলে, কোতোয়ার জানত না — এ দাদনের অর্থ কী! স্বামী-স্ত্রী দুজনের ধারণা দাদন নেওয়া হয়েছে বিড়ি-পাতা সরবরাহের জন্য। মিশ্র বেনামীতে বিড়ি-পাতা, হরতুকি-মজুয়া সরবরাহের ব্যবসা করত। তারপর যেদিন মিশ্র দলবল নিয়ে গ্রাম থেকে ওকে ধরে আনতে যায় — তখন সে বুঝতে পারে এ দাদন হচ্ছে আসামে কাজ করতে যাবার জন্য। মিশ্র দয়া করেনি। ওরই মতো অনেকগুলি হতভাগ্যকে মিশ্রের লোকেরা টেনে-হিঁচড়ে ভ্যানে তুলে ফেলে। সে রাতে মেরিয়া ছিল প্রসব-বেদনায় শয্যাশায়ী। স্বচক্ষে সে কিছু দেখেনি — শুনেছে শুধু আর্তনাদ আর কান্না। সব কথা সে জানে না। শুধু এটুকু জানে গ্রামের লোক বাধা দিতে গিয়েছিল — একটা খণ্ডযুদ্ধও হয়ে যায়। মধ্যরাত্রে নবজাতকের ক্রন্দনধ্বনি শুনেছিল একবার, আর ভোর রাতে দেখে তার খড়ের চালায় আগুন! আর কিছু সে জানে না। জ্ঞান ফিরে এলে সে জানতে পারে — তার স্বামীকে চালান দিয়েছে কোন চা-বাগানে — আর তার সদ্যোজাত সন্তান পুড়ে শেষ হয়েছে স্বামীর ভিটের সঙ্গে!

আর্নেস্ট নিরাশ্রয় মেয়েটিকে এনে তুললেন দি নুকে। তারই হাতে তুলে দিলেন ডেইজির স্মৃতিচিহ্নটুকুকে — স্যামুয়েল বারওয়েলকে। বারণ করেছিল সবাই। আদিবাসীদের প্রতিশোধ প্রবণতা ভয়ানক বেশি। সে হত্যা করবে শিশুকে! কিন্তু আর্নেস্ট স্টোন কারও কথায় কর্ণপাত করেননি। বলছিলেন, মেরিয়া জানে আমি মেরিয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমার হারানো মেয়েকে — তাই আমিও জানি, স্যামের মধ্যে মেরিয়াও খুঁজে পাবে তার হারানো ছেলেকে। অদ্ভুত যুক্তি। কিন্তু দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়। তাই হল শেষ পর্যন্ত।

অসাধ্য সাধন করলেন আর্নেস্ট স্টোন। চুয়ান বছরের যুবক! ডেভিড নেই। না থাক। একাই সব দেখা শোনা করেন। এদিকে মেরিয়াকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব আছে। মেরিয়া এ-বি-সি-ডি চিনল, আঁক কষতে শিখল। তিলে তিলে একটি পিতৃহৃদয়ের শূন্য স্থান দখল করে নিল সেই প্রকৃতির সন্তান। শুধু তাই নয়। স্টোনের দৌহিত্রকে নিজের বুকের অমৃত পান করিয়ে মানুষ করে তুলল সে। অদ্ভুত এক পরীক্ষার নেশায় মেতে উঠলেন স্টোন। ব্রিটিশ-ধমনী নিঃসৃত রক্তের সঙ্গে মাড়িয়া যুবতীর বুকের দুধের কক্টেলে কী দাঁড়ায় দেখবেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ আদিবাসীর মনে বাইবেলের প্রতিক্রিয়া।

স্যাম হাঁটতে শিখল — মেরিয়া শিখল বুকের উপর কাপড় তুলতে। স্যামের দাঁত আর মেরিয়ার হাতে ছুরি-কাঁটা উঠল প্রায় একই সঙ্গে। স্যাম যেদিন শিখল এ-বি-সি-ডি, মেরিয়া সেদিন শিখল ‘লাভ দাই নেবার।’ মিসেস বারওয়েল বলেন, অদ্ভুত তোমার মনের জোর আর্নেস্ট। সব খুইয়েও তুমি ভেঙে পড়নি।

কিন্তু বৃদ্ধ আর ব্যবসায়ের দেখা-শোনা করে উঠতে পারেন না। সব দায়িত্ব এখন মিশ্রের উপর। ডেইজি নেই — মিশ্রের তো পোয়া বারো। মনের আনন্দে চুটিয়ে ম্যানেজারি করতে বসল সে! কিন্তু গোল বাধল হঠাৎ! মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতে দৈবক্রমে বেঁচে গেল মিশ্র। সে আসছিল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে সন্ধ্যার পর। একাই। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কী দেখছিল। হঠাৎ একটা ধারালো তীর তার কান ঘেঁসে বিঁধল ইউক্যালিপ্টাস গাছের গায়ে। মাড়িয়া তীর। বিষাক্ত। এসেছে সাহেবের বাড়ির দিক থেকেই।

মিশ্র ভয়ে কঁকড়ে গেল একেবারে। সাহেবের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল — তাকে ব্রাঞ্চ অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। সাহেবও চিন্তায় পড়লেন। মেরিয়াকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। সরাসরি অস্বীকার করল মেরিয়া। বাড়ি তল্লাসী করে কোন মাড়িয়া ধনুক পাওয়া গেল না। সাহেব জানতেন, মেরিয়া কোনদিন মিশ্রকে ক্ষমা করতে পারেনি। অরণ্যসমূহতার রক্তে প্রতিশোধের আদিম আকাঙ্ক্ষা একেবারে চাপা দেওয়া যায়নি ‘লাভ দাই নেবার’ মন্ত্রে। মেরিয়ার মরদ আর ফিরে আসেনি কোনদিন। চা-বাগান থেকে অধিকাংশ অবশ্য ফেরে না। আর্নেস্ট স্টোন এ ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু খবর পাননি। ধূর্ত মিশ্র চালান করবার সময় নাম-ধাম এমনভাবে পাল্টাত যে দূর থেকে আর কোন মানুষকে সনাক্ত করার উপায় থাকতো না। মিশ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন— সেও আদ্যোপান্ত অস্বীকার করে গেছে ঘটনাটা। বড় পারাণ্ডের কোতোয়ারকে নাকি রিক্রুটই করা হয়নি আদপে। আর্নেস্ট স্টোন বাইবেল পাঠের সময়টা বাড়িয়ে দিলেন শুধু। পড়াতেন — পরমকরণাময় যীশু বলেছেন : এক গালে চড় মারলে আর এক গাল বাড়িয়ে দিতে হবে — অত্যাচারীর সম্বন্ধে ঈশ্বরকে ডেকে বলেছেন : ওরা জানে না ওরা কী করছে। প্রভু! ওদের তুমি ক্ষমা কর।

মেরিয়া নতজানু হয়ে চোখ বুজে সাহেবের সঙ্গে উচ্চারণ করত সেই অহিংসার মন্ত্র। স্যাম দু-একটা কথা বলতে শিখেছে। সে শুধু বলে : আমেন।

বৃদ্ধ তাকে বুকে তুলে নিয়ে বলতেন, ইয়েস, ইয়েস। আমেন! হিংসার বদলে হিংসা নয়: ক্ষমা — করুণা!

কিন্তু তবু কিছু হল না। দ্বিতলের বোলা বারান্দা থেকে মেরিয়ার হাত ফসকে বিরাট একটা পাম-গাছের টব আবার পড়ল মিশ্রের মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে! বাইবেলের প্রভাব দেখবার মতো মনের জোর আর ছিল না মিশ্রের। সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে সে বদলি হয়ে গেল ব্রাঞ্চ অফিসে।

বহরতিনেক পরের কথা। সেবার বাস্তারে ভীষণ গণ্ডগোল। প্রজারা বিদ্রোহ করেছে। সাহেব অসুস্থ। উত্থানশক্তি রহিত। এদিকে ওঁদের প্রতিষ্ঠানের নামে কারা সব গোপনে নালিশ জানিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। তদন্তে আসছেন উপরঅলা। আর্নেস্ট স্টোন নিরুপায় হয়ে ডেকে পাঠালেন মিশ্রকে। এতদিনের প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে ছুটে আসতে হল মিশ্রকে। কিন্তু সাবাধানী লোক সে। দুজন বডিগার্ড নিয়ে সে দেখা করতে এল সাহেবের বাংলোতে তদন্তকারী অফিসারকে নিয়ে। নিচের বড় হল কামরায় বসে এতলা পাঠালো উপরের ঘরে। সাহেব তখন দ্বিতলের ঘরে

শয্যাশায়ী। উপর থেকে নেমে এল মেরিয়া — ভায়োলেট রঙের একটা স্কার্ট-গাউন পরেছে সে। গলায় জড়োয়া নেকলেস। সেজবাতির আলোয় বিকমিক করে উঠল। দীর্ঘদিন পরে চার চক্ষুর মিলন হল আবার। মিশ্র দেখল — ডেইজির নেকলেস উঠেছে মেরিয়ার গলায়। মেরিয়া দেখল — মিশ্রের চোখে সেই ত্রুর দৃষ্টি আজও তেমনি আছে। তদন্তকারী অফিসার অবাক হয়ে মিশ্রকে জনান্তিকে বললে— ইনি কে ?

মিশ্র মেরিয়ার প্রতিগোচর করেই জবাব দিলে, এ বাড়ির আয়া !

মেরিয়া অপমানটা হজম করে নিলে। মনে মনে সে করুণাময় যীশুর ভালো ভালো উপদেশগুলি আওড়াতে থাকে। হিংসা নয়, ক্ষমা — করুণা ! রাগ সে করবে না, সে তো সত্যই আর্নেস্ট স্টোনের কন্যা নয়, সে এ বাড়ির আয়াই।

অফিসার বললে, স্টেঞ্জ গার্ল !

সাহেবের সঙ্গে ওদের দেখা হল। মিশ্র জনান্তিকে মেরিয়াকে বললে— আমাকে এখানে কিছুদিন থাকতে হবে। কিন্তু অজানা হাতের তীর অথবা ফুলের টব যদি আমার কাছ ঘেঁষে ছুটে যায় তাহলে বড়া পারেঙের কোতোয়ারের ঘরের মতো এই নুকটিকেও পুড়িয়ে শেষ করব আমি ! মনে রেখ, এখন ডেভিড নেই, মিস্টার স্টোনও এখন শয্যাশায়ী !

মেরিয়ার চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল, হঠাৎ সেও বলে, তুমিও মনে রেখ, ডেভিড নেই — কিন্তু যাবার সময় সে চাবুকটা আমাকে দিয়ে গেছে ! ড্যাভি শয্যাশায়ী, কিন্তু তাঁর পিস্তলে মরচে ধরতে দিইনি আমি !

বলেই উঠে চলে গিয়েছিলে নিজের ঘরে। সেখানে ঘুমাচ্ছিল ওর কুড়িয়ে পাওয়া ইংরাজ সন্তান। স্যামুয়েল বারওয়েল। তাকে জড়িয়ে ধরেছিল বুক। তারপর উঠে গিয়ে নতজানু হয়ে বসেছিল মেরীমাতার ছবির সম্মুখে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেছিল, আমাকে তুমি বল দাও। আমি অন্যায় করে ফেলেছি ! আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতিশোধ নয় — করুণা ! হিংসা নয়: প্রেম !

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

তদন্তকারী অফিসার ভাল রিপোর্টই দিয়ে গিয়েছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। সফল হয়েছিল মিশ্রের কারসাজি।

আমি বললুম, কিন্তু মিস্টার মেহ্‌রা, আপনি গল্পটা শুরু করার সময় বলেছিলেন আদিবাসীদের শিক্ষিত করলেও তারা আদিম থেকে যায় — সে সিদ্ধান্তের তো কোন যীমাংসা হল না।

মেহ্‌রা বলেন গল্পটা আমার শেষ হয়নি এখনও। তদন্তকারী অফিসার চলে যাবার পরেই খুন হয়েছিলেন মিশ্র। আমূল বিদ্ধ হয়েছিল একটা বিষাক্ত তীর তার কণ্ঠ নালীতে !

ডাক্তারসাহেব বলেন, মেরিয়ারই জিত হল শেষ পর্যন্ত ? দ্বৈরথ সমরে মিশ্রই হারল ?

—একেবারে যে হারল তা নয়। মিশ্র তার আগেই একটা চাল চলেছিল। তদন্তকারী

অফিসারের ভাল রিপোর্টের পিছনেও কিছু ইতিহাস আছে। শুধু দামি মদ আর নগদ মূল্য দিয়েই অমন একখানি হয়-কে-নয়-করা রিপোর্ট আদায় করা যায়নি। সে রাত্রে অফিসার ভদ্রলোকটিকে সরবরাহ করতে হয়েছিল আরও একটি ম-কারযুক্ত পদার্থ! মাড়িয়া যুবতী মেরিয়া!

—আমি বললুম, তারপর?

—তারপর আবার কী? এখানেই তো গল্পের শেষ।

—কিন্তু বুড়ো আর্নেস্ট স্টোনের কী হল? মেরিয়ার? ফাঁসি?

—বুড়ো স্টোনের কথা জানি না। তবে মেরিয়ার ফাঁসি হয়নি। বেকসুর খালাস পেয়েছিল সে। বিচারে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।

—তাহলে সে নিশ্চয় ফিরে এসেছিল স্টোনের কাছে।

—না। ফিরে সে আসেনি।

—তাহলে কোথায় গেল সেই মেয়েটি?

—তা আমি জানি না। আন্দাজ করতে পারি! এজাতীয় একটি মেয়ের যাবার মতো একটিমাত্র রাস্তাই এরপর কল্পনা করা যায়। সম্ভবত কোন ব্রথলে গিয়ে নাম লিখিয়েছিল!

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে ওঠেন গুপ্তেজী, শাট আপ!

ঘরে সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা! বেয়ারাগুলোও এগিয়ে এসেছে সে চীৎকারে। মেহ্রা উঠে দাঁড়িয়েছেন। বিস্মিত হয়ে বলেন, হোয়াট ডু যু মিন?

—আই সে, যু উইথডু দ্যাট ইনসালটিং রিমার্ক!

মেহ্রা আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন প্রতিপক্ষকে। তারপর ধীরে-সুস্থে বললেন, আপনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন নাকি?

গুপ্তেজী টেবিলে একটা প্রচণ্ড মুষ্টিঘাত করলেন। ঝন্ঝন্ করে উঠলো কাচের পাত্রগুলো। তাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে এক আদিম বর্বরতা। কঠিন কণ্ঠে উনি বলেন, আমি জানতে চাই, সেই মাড়িয়া ভদ্রমহিলার নামে যে কুৎসিত কথা আপনি উচ্চারণ করেছেন তা প্রত্যাহার করবেন কি না?

ডাক্তার-সাহেব ঔর মুষ্টিবদ্ধ হাতটা চেপে ধরে বলেন, আপনি কি ক্ষেপে গেলেন মিস্টার গুপ্তে?

মেহ্রা কিন্তু মেজাজ ঠিক রেখেছেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেই খুনে মাগী কোন ব্রথলেই আশ্রয় নিয়েছিল!

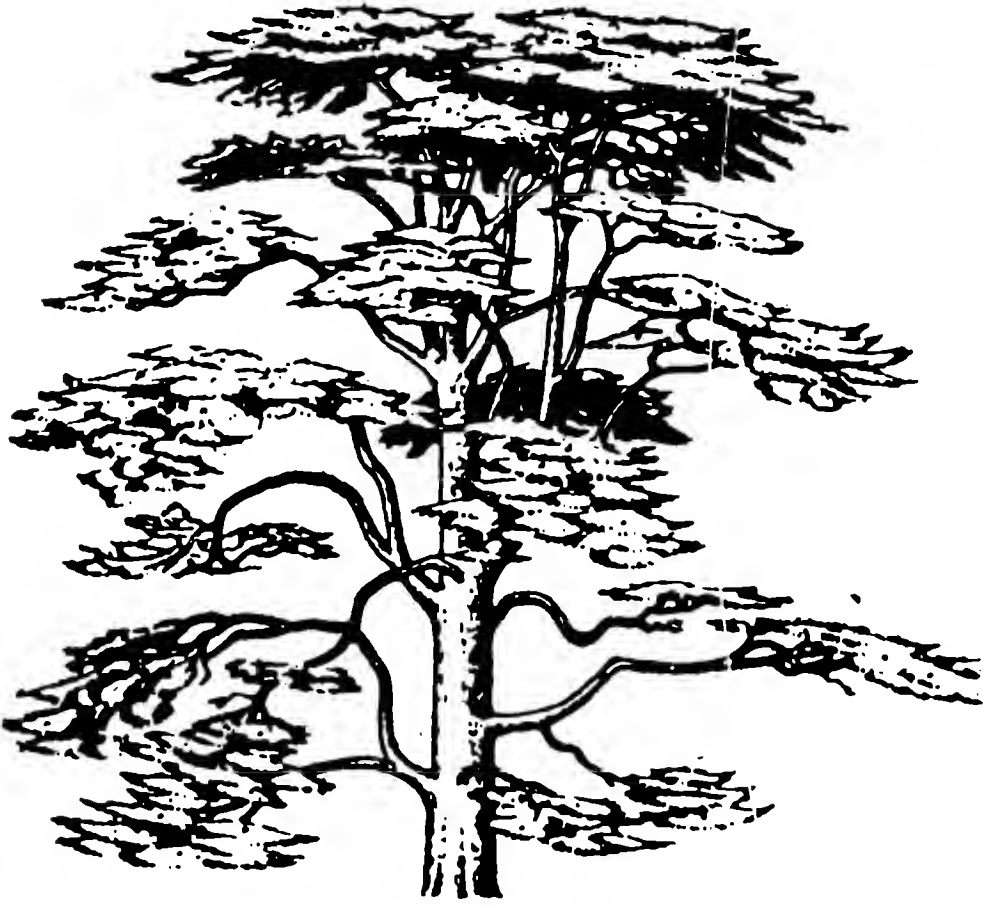
এবং সে কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তেজী যা করলেন তা পাগল অথবা মধ্যযুগীয় নাইট ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারে না। বাঁ-হাতে ধরা জলের গেলাসটা থেকে আধ গ্রাস এঁটো জল ছুঁড়ে দিলেন প্রাতরাশ টেবিলের অপর প্রান্তে জয়দীপ মেহ্রার মুখে।

আমি আর ডাক্তার-সাহেব দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওঁদের মাঝখানে। হাতাহাতিটা আর হল না।

কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত! আর তা হল, এক গাদা পিয়ন-আদালির সামনে।

মেহুরা জামাটা পালটে যখন গাড়িতে উঠলেন তখন তাঁর মুখ দেখে বিদায় সম্ভাষণের কথাও বের হল না আমার মুখ দিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনি শাসিয়ে গেলেন — এর শোধ তিনি নেবেন। গুপ্তেজী যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তাঁর পিয়ন এক টুকরো কাগজ এনে দিল আমার হাতে। সেই কাগজের উল্টো পিঠে শুধু লিখে দিলাম, আপনার ব্যবহারে আমরা লজ্জিত। আপনি মেহুরা সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

ডাক্তার-সাহেব গাড়িতে উঠবার সময় গত রাত্রে কথাকাটা বললেন আবার, আপনার বন্ধুটি কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ !



॥ সতের ॥

দণ্ডকারণ্যের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি আর সংগ্রহ করেছি ওদের টুকরো কাহিনীর ইতিকথা। ঐ ভাত্রা-পরজা-শবর-বোণ্ডা-মাড়িয়া-মুরিয়াদের গল্প। এসেছিলাম আদিম অসভ্যদের জগতে আধুনিক সভ্যতার স্থায়ী নিদর্শন রেখে যেতে। ইট-পাথরের ইমারৎ, কালো পীচমোড়া সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট-ফ্যাক্টরি বানাতে। উদ্ভাস্তদের পুনর্বাসনে সাহায্য করতে। সেই কাজের ফাঁকে দেখলাম এক অজানা জগতকে — যার কথা কলকাতায় বসে কল্পনাও করতে পারতুম না। আমাদেরই দেশে আমাদেরই কালের এক দল অজানা মানুষকে দেখবার দুর্লভ সুযোগ পেলুম অতি নিকট থেকে। ওরা নাকি মানবিকতার উৎসমুখের বাসিন্দা। মোহনার মানুষদের রীতি-নীতি চাল-চলন ওদের স্বপ্নের অগোচর। ওদের এ-নির্জন অরণ্যের বুক বারে বারে কেঁপে উঠেছে আমাদের বুলডোজারের গর্জনে, রোড রোলারের চিৎকারে আর গানপাউডারের বিস্ফোরণে। আমাদের বুলডোজার যতই এগিয়ে গিয়েছে ওরা ততই পিছিয়ে গিয়েছে আরও অভ্যন্তরভাগে। যারা পালাতে পারেনি তারা নতি স্বীকার করেছে বুলডোজারের মুখে মহীকুহের মতো। ওদের কিছুটা অংশ পালায়নি, মিশতে চেষ্টা করেছে আমাদের সঙ্গে। তারা সভ্য হয়ে উঠেছে। তারা আমাদের থিওডোলাইট বয়ে বেড়িয়েছে অরণ্য পর্বতে, তারা আমাদের নির্দেশে পুঁতেছে লাল নিশান পাহাড়ের মাথায়। জানি না তাতে কতটা ভাল হয়েছে, আর কতটা মন্দ। কিন্তু একথা ঠিক, আজ আমার যা দেখবার সৌভাগ্য হল, আগামী দিনের দর্শক তা দেখতে পাবে না। দ্রুত বদলে যাচ্ছে আদিম দণ্ডকারণ্য। এদের মাড়াই, এদের উইজ্জাওয়েতা, এদের হুলকি-রেলো-গোড়-এণ্ডানা নাচ হয়তো গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে পড়বে দু-দশ বছর পরে।

কিন্তু ওরা কি ভাল মনে মেনে নেবে এ পরিবর্তন? ওরা কি বরণ করে নেবে পূর্ব বাংলার বাস্তব্যত ভাইবোনদের?

সে কথাই সেদিন আলোচনা করছিলাম পণ্ডিত তারাপ্রসন্নের সঙ্গে। তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম নতুন পত্তন হওয়া উদ্ভাস্ত গ্রামে। সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ অধিকার। আমি বলেছিলাম, ভয় হয়, আদিবাসীরা যদি কোনদিন এই নতুন বাসিন্দাদের উপর টাঙি-বল্লম হাতে চড়াও হয়?

তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন, আমি সে ভয় করি না। ওরা শান্তিপ্রিয় জীব। সভ্যজগত থেকে আমরাই যুগে যুগে এসে ওদের উপর অত্যাচার চালিয়েছি। ওরা মুখ বুজে সয়ে গেছে। আমরা যদি ওদের গায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া না করি, তাহলে ওরাও স্বেচ্ছায় আমাদের ক্ষতি করবে না।

তর্কের খাতিরে আমি বলেছিলুম, ইতিহাস কিন্তু সেকথা বলে না। শ্রীরামচন্দ্র একদিন দণ্ডকারণ্যে কুটির নির্মাণ করে শান্তিময় জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে সুখের সংসারে দেখা দিয়েছিল নির্লজ্জ আদিবাসী শূর্ণগথা। রামচন্দ্রের সুখের সংসার সে ছারখার করে দিয়েছিল।

তারাশ্রম্ন আমার এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। মূল রামায়ণ থেকে শ্লোক উদ্ধার করে প্রমাণ করেছিলেন প্রথম অপরাধ শূর্ণগথা করেনি, করেছিলেন আর্যসন্তান — শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।

সেই প্রসঙ্গে তারাশ্রম্ন বলেছিলেন, শুধু কি শূর্ণগথার উপাখ্যান? আদিবাসীরাজ বালির প্রতি আমাদের আদর্শপুরুষের ব্যবহারটা লক্ষ্য করে দেখুন। বালি আর সুগ্রীবের গৃহযুদ্ধে তৃতীয়পক্ষ রামচন্দ্র যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সেটাও আর্যসভ্যতার গৌরববাহী নয়। শরাস্ত্র মহারাজ বালি মৃত্যুর পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছিলেন: কেন তুমি অতর্কিত আক্রমণে আমাকে বধ করলে? আমি পঞ্চনখ হলেও আমার মাংস অভক্ষ্য, আমার চর্ম লোম অস্থি কিছুই তোমার কাজে লাগবে না। তাহলে কেন তুমি চোরের মতো গুপ্ত স্থান থেকে আমাকে হত্যা করলে? রামচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন— কেন তোমাকে বধ করেছি তার কারণ শ্রবণ কর। তুমি পাপাচারী, মহাত্মা সুগ্রীবের পত্নী কুমা তোমার পুত্রবধূ স্থানীয়া, কামবশে তুমি তাকে অধিকার করেছ। —কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তো জানতেন, তাঁর কাছে যা সনাতন ধর্ম আদিবাসী বালির কাছে সেটাই ভয়াবহ পরোধ্য। ভবিষ্যতে বালির বিধবা পত্নী তারাকে যখন সুগ্রীব অধিকার করে বসল তখন তো তিনি আপত্তি করেননি। তাহলে এ মনগড়া যুক্তির অর্থ কী? সোজা কথাটা রামচন্দ্র স্বীকার করেননি। করলেও বালি তা বুঝতো না। পলিটিক্যাল মার্ভার' কাকে বলে ঐ অসভ্য অনার্য মানুষটি তা জানতো না।

কিংবা ধরুন শম্বুকের কথা।

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলুম, কিন্তু শম্বুক তো আদিবাসী ছিল না। সে আর্যসমাজেরই নিম্নস্তরের লোক। শম্বুক শূদ্র ছিল।

তারাশ্রম্ন বললেন, আমার তো ধারণা শম্বুক ছিলেন একজন আদিবাসী সাধক। এই দণ্ডকারণ্যেরই মানুষ। এখানেই তপস্যা করেছিলেন তিনি।

—এ ধারণার পিছনে কোন যুক্তি আছে?

—আছে বইকি। বাল্মীকি রামায়ণ খুলে দেখুন, অকালমৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ-প্রজা মহারাজের কাছে অভিযোগ আনল। শ্রীরামচন্দ্র শুনলেন রাজ্যের কোথাও না কোথাও গোপনে অনাচার হচ্ছে। তাই এই অকালমৃত্যু! কে করেছে এ অনাচার? স্বয়ং তদন্ত করতে বের হলেন। ঘুরে দেখলেন সারা রাজ্য। পুষ্পক রথে উঠে রাম চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে খুঁজতে থাকেন অপরাধীকে। বাল্মীকি বলছেন, মহারাজ নরনাথ শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পকরথ থেকে প্রথমে পূর্বদিকে দৃষ্টি দিলেন। তারপর উত্তরে, তারপর পশ্চিমে — কিন্তু না, কোথাও কোন অনাচার তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না। অতঃপর রাজর্ষিতনয় রাম দক্ষিণাভিমুখে চলতে শুরু করলেন। হ্যাঁ, এইবার তাঁর নজরে পড়ল একটি দৃশ্য:

দক্ষিণাং দিশমাক্রামন্ততো রাজর্ষনন্দনঃ।

শৈবলস্যোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎসরঃ॥

বিজ্ঞা পর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবল গিরির উচ্চ মালভূমির উত্তরপার্শ্বে এক সুমহৎ সরোবর দেখতে পেলেন। শ্রীমান রঘুনন্দন সেই স্বচ্ছতোয়া সরোবর তীরে দেখলেন

একজন তপস্বী বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কঠিন তপস্যায় নিরত।

রামচন্দ্র সেই তপস্বীর সন্নিকটস্থ হয়ে বললেন, হে তাপস, তোমার পরিচয় দাও। আমাকে ভয় পেও না, তোমার সত্য পরিচয় আমাকে জানাও এবং বল, কেন তুমি এমন কঠিন তপশ্চর্যা করছ।

শ্রীরামচন্দ্রের অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে তপস্বী বললেন, আমার নাম শম্বুক। আমি শূদ্র সন্তান। শূদ্র জাতির দুঃখ-দুর্দশা দেখে আমি নিতান্ত পীড়িত হয়েছি — তাই তপশ্চর্যার মাধ্যমে এই জাগতিক দুঃখের পথ থেকে কেমন করে শূদ্র-সন্তান মুক্তি পেতে পারে সেই পথের সন্ধান করছি।

কথা শেষ হতেই ঝলসে উঠল আর্যনৃপতির তরবারি। লুটিয়ে পড়ল শম্বুকের ছিন্নশির। আর সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শূদ্র-তপস্বীর সত্য সন্ধানের মহৎ প্রচেষ্টা।

আমি বললুম, আপনি কিন্তু শম্বুকের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে রামচন্দ্রের প্রতি অবিচার করছেন। শ্রীরামচন্দ্র যুগপ্রথা মেনে চলেছিলেন শুধু।

—মানুন, তাতে তো আপত্তি করছি না আমি। সীতাবর্জনের মতো অন্যায়কেও যখন প্রজানুরঞ্জনের যুগধর্ম বলে মেনে নিয়েছি তখন এ তো সামান্য কথা। আমার আপত্তি অন্যত্র। আমার আপত্তি রামচন্দ্রের রসিকতায় — যখন তিনি শূর্ণগথাকে বলেন ‘আমার ভ্রাতা অকৃতদার, তুমি তার উপযুক্ত পত্নী হতে পার’ ; আমার আপত্তি তাঁর নীতি ব্যাখ্যায় যখন তিনি বালিকে বলেন— ‘তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করেছ বলেই তোমাকে হত্যা করলাম’, আমার আপত্তি তাঁর মিথ্যা আশ্বাসে যখন তিনি তপস্যানিরত শম্বুককে বলেন ‘আমাকে ভয় কর না, তোমার সত্য পরিচয় দাও।’

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন, এর মধ্যে নতুন কথা কিছু নেই। সত্যযুগ থেকেই এই হচ্ছে দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস। সভ্যতার অভিমানে আমরা ওদের চিরকাল ছোট করে দেখেছি — ওদের উপেক্ষা করেছি, ঘৃণা করেছি, আর উপকার করবার অছিলায় ওদের শাস্তিময় জীবনে অশান্তিকে আমদানি করেছি শুধু।

আমি বললুম, সত্যযুগ নয়, বলুন ত্রেতাযুগ থেকে। শ্রীরামচন্দ্র সত্যযুগের মানুষ ছিলেন না।

তারাপ্রসন্ন হেসে বলেন, কিন্তু দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্র তো প্রথম বহিরাগত আর্যসন্তান নন। তার আগের ইতিকথা খুঁজে দেখুন — দেখবেন সেই একই করুণ কাহিনী। এ অঞ্চলের নাম দণ্ডকারণ্য হল কেন জানেন ?

—মহারাজা দণ্ডের রাজ্য বলে।

—হ্যাঁ, কিন্তু কে সেই মহারাজ দণ্ড ? কী তাঁর উপাখ্যান ?

স্বীকার করতে হল — সে কাহিনী আমার অজানা।

নিপুণ কথকের মতো তারাপ্রসন্ন শোনালেন দণ্ডকারণ্যের আদিকথা :

সত্যযুগের কথা। দেবারিগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের আশ্রম ছিল এই আরণ্যক ভূমির দক্ষিণাঞ্চলে। স্ফটিকস্বচ্ছ সরোবরের তীরে শান্ত তপোভূমি। বেদমন্ত্রের ছন্দে উষা সে আশ্রমের প্রতিটি দিনের ডালা বয়ে নিয়ে আসেন — গৃহপ্রত্যাগত পাখির কুজনের সঙ্গে সন্ধ্যার সমাগম যখন মিশে যায় তখন আশ্রমের কর্মবিসান ঘটে। দেশ-দেশান্তর

থেকে মহর্ষি শুক্রাচার্যের আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করতে আসেন অযুত শিক্ষার্থী, — দেব-নর-নাগ-গন্ধর্বেরা। ঋষি শুক্রাচার্যের দুই কন্যা — এক বৃন্তে দুটি ফুল, স্থির দীপশিখার মত উজ্জ্বল জ্যোষ্ঠা অরজা, আর রাকারজনীর কৌমুদীকণিকার মত কনিষ্ঠা দেবযানী। দিনে দিনে দুটি ঋষি-কন্যা যৌবনের মধ্যাহ্ন গগনে এসে উপনীত হল। একদিন মহর্ষি দুই আত্মজাকে কাছে ডেকে এনে সন্মুখে বললেন, আমি আমার কন্যাভাগ্য বিচার করে দেখেছি। জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে জানতে পারলেম যে, আমার এই আশ্রমে কালে দুজন শিক্ষার্থী আসবেন। একজন উদয়ভানুর মত আনন্দ-কান্তি তেজদীপ্ত দেবশিশু — তিনি জয়ন্তপ্রতিম শালগ্রামশু জিতেদ্রিয় তরুণ, আসবেন অমৃত আহরণের ব্রত নিয়ে, অপরজন কাম-ক্রোধ-লোভের বশীভূত সামান্য মানবসন্তান, পার্থিব নৃপতি — আসবেন হলাহলের সন্ধানে। দেবশিশু থাকবেন তাঁর সাধনায় একনিষ্ঠ, শিক্ষা-সমাপনান্তে যেদিন তিনি পিতৃগৃহে ফিরে যাবেন সেদিন ত্রিভুবন তাঁর কীর্তিতে হবে রোমাঞ্চিততনু, অন্তরীক্ষ্যে দুন্দুভি বাজবে, দিগাঙ্গনার দল লাজবৃষ্টি করবে, মঙ্গলশঙ্খ বাজাবে। অপরজন এখান থেকে বিদায় নেবে আনতশিরে, ক্ষোভে লজ্জায় আত্মগোপনে উন্মুখ। দেবশিশু এ আশ্রম থেকে নিয়ে যাবেন অমৃত, আর মানবশিশু হলাহল। তবু ভাগ্যচক্রের নির্দেশে দেখছি এই দুই কুমার আমার দুই কন্যার রূপে মুগ্ধ হবেন। অরজা, দেবযানী, কোন সঙ্কোচ ক'র না, বল, কে কার প্রণয়ের প্রত্যাশী হতে চাও ?

অরজা অপাঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলেন সুযৌবনা প্রিয় ভগ্নীর তনুভঙ্গিমার রূপরূচির উপর সরমের রক্তিমাভা। রাত্রি-হৃদয়ে গোপনচারী উদয়ভানুর আভাস যেমন উষামুহূর্তে ফুটে ওঠে পূর্বদিগন্তে, তেমনি লজ্জার এক সূক্ষ্ম চীনাংশুকে ঢেকে গেছে দেবযানীর মুখপদ্ম। অরজা ধীরে ধীরে বলে, প্রগল্ভতা ক্ষমা করুন পিতা, কিন্তু এ আপনার কেমন শিশুসুলভ প্রশ্ন ? নন্দন-বনের পারিজাত আর পুতিগন্ধময় পুরীষ, অমৃতপয়স্বিনী সুরভী কামধেনু আর মলদলিত শুকরী, প্রস্ফুটিত কল্লতরু আর বিষমুখ কণ্টক গুল্ম—এ দুইয়ের মধ্যে নির্বাচনের অবকাশ কোথায় ?

অরজার প্রশ্নে মহর্ষি শুক্রাচার্য লজ্জা পেলেন।

অরজা পুনরায় বলে, দেবযানী আপনার আদরিণী কনিষ্ঠা কন্যা। আমার মাতৃহীনা অনুজাকেই তাই আমি নির্বাচনের সুযোগ দিলাম।

মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি দেবযানী সলজ্জে বললে: দেবশিশুর প্রণয়ভীরু দৃষ্টিতে অবগাহন-স্নান করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্যা মনে করব।

শুক্রাচার্য বললেন, তথাস্তু ! কিন্তু এই দুই শিক্ষার্থীর কেহই আমার জামাতা হবেন না। ভাগ্যলেখা বিচারে দেখছি, আমার একটিমাত্র কন্যার বিবাহ হবে — এবং আমার সেই পৃথিবীপতি জামাতা অনন্ত যৌবনের অধিকারী হবেন, জরা তাঁর ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না। অপর পক্ষে আমার অপরা কন্যার ভাগ্যে স্বামীলাভ ঘটবে না। পিতার অবর্তমানে চিরকুমারী আমার সেই আত্মজাকে আমৃত্যু এই আশ্রমের পরিচর্যা করতে হবে। তারই পুণ্যে এ অরণ্যের নিষ্পাপ পশুপক্ষী আশ্রমচারীরা একদিন দাবানলের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। কন্যা অরজা, এবার আমি তোমাকেই

বিশেষভাবে নির্বাচন করতে বলছি, তুমি ভাগ্যের কোন নির্দেশ বরণ করতে চাও ?

অরজা পুনরায় অপাঙ্গে কনিষ্ঠা ভগ্নীর দিকে দৃকপাত করেন। দেখতে পান দেবযানীর পদ্যনেত্রে প্রত্যাশা কাঁপছে পদ্যপত্রে শিশিরবিন্দুর মত। একদিকে অনন্তযৌবন স্বামীর সঙ্গসুখ সোহাগ-সৌভাগ্য আর অন্যদিকে ঋষিকুমারীর আশ্রয় ব্রহ্মচর্যের উষর মরুভূ। অরজা দেখলেন — নীরব দেবযানীর অক্ষিতারকার দর্পণে প্রত্যাশাম্পন্দিত প্রাণের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়েছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে অরজা বললেন, হে অক্লিষ্টকর্মা ভার্গব, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হক। আমিই নির্বাচন করছি। আমি বরণ করে নিলাম আশ্রয় ভর্তৃহীন আশ্রমকুমারীর জীবন। আমার এ পুণ্যে আশ্রম যদি দাবানলের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় তাহলেই আমার জন্ম সার্থক বলে মানব !

অন্তরীক্ষ্যে দুন্দুভি বেজে উঠল — দিঙনাগাচার্যরা সাধুবাদ দিয়ে ওঠেন — দিগাম্বনার দল অরজার আশ্রয়ত্যাগের গৌরবে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন। আনন্দে মহর্ষি অরজার শিরশ্চুম্বন করে বললেন, অরজা, কেন সুযোগ পেয়েও তুমি স্বেচ্ছায় এ কঠোর জীবন বরণ করে নিলে ?

অরজা বললেন, দেবযানী কনিষ্ঠা, একজনের জীবনে যদি কঠোরতা অমোঘ হয় তবে তা জ্যেষ্ঠকেই সহ্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আপনি বলেন হবি প্রয়োগে হতাশনের মতো কখনো ভোগে কামনার উপশম হয় না। সুতরাং অনন্তযৌবন স্বামীলাভেও তৃপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু যদি আমার পুণ্যে এ আশ্রম রক্ষা পায় তাতে তৃপ্তি আছে। তৃতীয়ত, যে অনন্যচিন্ত একনিষ্ঠ দেবশিশু অমৃতের সন্ধানে এখানে আসবেন আমি তাঁর প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করছি না। বরং আমার কৌতুহল দেখতে — সেই কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের বশীভূত মানুষকে, যে আসবে হলাহলের আকর্ষণে ! আমার সাধনা হবে হলাহলের পরিবর্তে তার হাতে অমৃতের ভাণ্ড তুলে দেওয়া।

শুক্রাচার্য বললেন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। চক্রাবর্তনের পথে আশ্রমদ্বারে বারে বারে এসেছে পুষ্পভারনম্র বসন্ত, — আশ্রমতরুশাখা শীতের হিমেল হাওয়ায় অপর্ণার তপস্যায় মগ্ন থেকেছে, বর্ষার সমাগমে ঘনঘোর বর্ষণে অরজার অন্তরাত্মা মেঘডম্বরুর তালে তালে দুরু দুরু করে কেঁপেছে, বনকপোতের কুজনে খরমধ্যাহ্নের কমহীন অবসর হয়েছে রোমাঞ্চিততনু। দেবশিশু কচ এসেছেন দৈত্যগুরুর আশ্রমে — একমাত্র সহচরী ভগ্নী দেবযানীর সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিতা হয়েছে অরজা। নিরলস সেবায় আশ্রমের যাবতীয় কাজ সে করে যায় — আর একটি চক্ষু মেলে রাখে আশ্রমদ্বারের দিকে — কখন আসবেন সেই দোষেগুণে গড়া হলাহল সন্ধানী মোহান্ন মর-মানব।

মহর্ষি আশ্রমে নেই — তিনি গিয়েছেন মধুমন্ত নগরে মহারাজ দণ্ডের রাজ্যাভিষেকে ! অরজার উপর দিয়ে গিয়েছেন আশ্রমের দায়িত্ব। মহারাজ দণ্ড মহীপতি ইক্ষাকুর কনিষ্ঠ পুত্র — দণ্ডধর মনুর পৌত্র। মনু পৃথিবীদুর্জয় প্রিয়পুত্র ইক্ষাকুকে নিজ রাজ্যভার দিয়ে বলেছিলেন— ‘তুমি পৃথিবী মধ্যে রাজবংশগণের রাজা হও। পরমোদার ! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমি সহস্র বৎসরকাল প্রজাপালন কর। কিন্তু

অকারণে কাউকে দণ্ড দিও না। দণ্ডপ্রদান বিষয়ে তুমি যত্নপরায়ণ থাকবে। তাহলেই তোমার ধর্ম রক্ষা হবে।’

কালে সেই ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র হল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দণ্ড। শৈশব থেকে দণ্ড মূঢ় এবং অকৃতবিদ্য। এর ভাগ্যে নিশ্চয় দণ্ডভোগ আছে, এই কথা মনে করে মহারাজা পুত্রকে দূরে পাঠালেন। বিদ্যা এবং ঋষ্যমুক পর্বতের মধ্যে মধুমন্ত নামে এক নগরী নির্মাণ করে দণ্ডকে সেই জনপদের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন! দণ্ড মূঢ় এবং অকৃতবিদ্য, —কিন্তু পুরোহিত নির্বাচনে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল সে। কবিশ্রেষ্ঠ উশনা কবি অর্থাৎ মহর্ষি শুক্রাচার্যকেই সে পৌরোহিত্যে বরণ করে নিলে।

দীর্ঘদিন পরে আশ্রমে ফিরে এলেন মহর্ষি। তাঁর সঙ্গে এক অনিন্দ্যকান্তি তরুণ নৃপতি। বৃক্ষান্তরাল থেকে অতিথির দিকে দৃকপাত করে মুগ্ধ হয়ে গেল আশ্রমতনয়া অরজা। অন্তরালে পিতার কাছে আগন্তুক অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। ভার্গব বললেন, ইনিই ইক্ষ্বাকুপুত্র মধুমন্ত নগরাধিপতি মহারাজ দণ্ড। আমার হতভাগ্য শিষ্য।

অরজা সবিষ্ময়ে বলেন, আপনাকে পৌরোহিত্যে বরণ করবার সৌভাগ্য যার হয়েছে তাঁকে ভাগ্যহীন বলছেন কেন?

মহর্ষি বললেন, হতভাগ্য দণ্ড সুন্দরের উপাসক, কিন্তু তার উপাসনার মন্ত্র তামসিক। আশ্চর্য ওর চরিত্র। অতি উর্ধ্বলোকে উঠবার ক্ষমতা ওর আছে — কিন্তু গৃধ্রের মতো ওর দৃষ্টি শুধু মৃতদেহের দিকে। অমৃতে ওর রুচি নেই, — ও নীলকণ্ঠ শিবের মতো হলাহলের সাধনায় মত্ত।

শিউরে উঠল অরজা। এই কি তাহলে সেই কুমার, যার হাতে বিশ্বের পরিবর্তে অমৃতের ভাণ্ড তুলে দেবার সাধনায় সে প্রহর গুনেছে আযৌবন?

অরজার দিবসের কর্মে এবং রাতের অনিদ্রায় শুধু এক চিন্তা। কেমন করে ঐ দুর্মদ রাজকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা যায়। দণ্ডের চরিত্রে সাত্ত্বিকতার চিহ্নমাত্র নেই। রাজসিকতা অল্প — তামসতপস্যায় সে নিষাধের মতো বনে-বনান্তরে পশুপক্ষী শিকার করে ফেরে। অরজা অন্তরাল থেকে দেখে দূরন্ত-যৌবন রাজপুত্রের উদ্দাম মৃগয়া। অরজার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করতে থাকে, সে মনে মনে জপ করে: ‘হে ঈশ্বর, আমাকে বল দাও — আমি ঐ তামসতপস্বীকে এনে দেব সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান! প্রেমের স্পর্শমণির ছোঁয়ায় ওর লৌহকঠিন হৃদয়কে পরিবর্তিত করব হিরণ্ময় সম্পদে। প্রমাণ দেব ও মানুষ—ও অমৃতের পুত্র!’

তবু ঐ রাজপুত্রের সম্মুখে আসতে সাহস হয় না তার। পিতা বলেছেন দণ্ডও সুন্দরের উপাসক, কিন্তু তার সাধনার মন্ত্র তামসিক। অরজা সেই মন্ত্রের পরিবর্তন আনবে — কিন্তু কোন যাদুবলে? সে শুধু মনে মনে বলে: হে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও।

সেদিন রমণীয় চৈত্রসন্ধ্যা। মৃদুমন্দ বাতাসে বনপথে ঝরে পড়েছে অশোক, কিংশুক, পলাশ! মৃগয়া অস্তে মৃত পশু স্কন্ধে বহন করে শ্রান্ত দেহে মহারাজ দণ্ড আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করছেন। সহসা বনান্তরাল থেকে ভেসে আসা এক স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। বিজন অরণ্যে কে গাইছে এমন অপার্থিব সঙ্গীত! মুগ্ধ

হয়ে গেলেন তিনি। অন্তরালবর্তিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে সঙ্গীতমগ্না, তুমি কে ?

অকস্মাৎ অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায় অসমাপ্ত সঙ্গীত। বনান্তরাল থেকে ভেসে আসে ভয়ত্রস্ত বামাকষ্ঠ, হে মৃগয়াচারী মহারাজ, আমি এ অরণ্যের বনদেবী।

—কিন্তু তুমি অর্ধপথে সঙ্গীত সমাপ্ত করলে কেন ?

—সঙ্গীত নয় মহারাজ, এ আমার আত্মবিলাপ !

—বিলাপ ? —স্তম্ভিত হন মহারাজ দণ্ড — কেন ? বিলাপ কিসের ? বল কে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে ; আমি এক্ষণি তার শিরশ্ছেদ করব।

গোপনচারিণী অরজা বলে, এক অত্যাচারী নরপতি এসে এ অরণ্যের পশুপক্ষীর প্রাণ হনন করে চলেছেন ক্রমাগত। তাই আমার এ শুধু সমবেদনার অশ্রু ! করুণার উৎসমুখে আমার এ সঙ্গীতের জন্ম।

সমবেদনা ? করুণা ? অর্থগ্রহণ হয় না মুঢ়মতি দণ্ডের। বলেন, তোমার সঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তুমি আবার আমাকে গান শোনাতে পার না ?

অন্তরাল থেকে অরজা বলে, পারি। যদি তুমি অত্যাচারীর ভূমিকা ত্যাগ করে সঙ্গীতপিপাসুর মতো আমার গান শুনতে আস।

—আমাকে কী করতে হবে ? —অকৃতবিদ্য দণ্ডের সরল প্রশ্ন।

—অকারণ পশুবধ বন্ধ করতে হবে। বনচারিণীর সঙ্গীতের মতো বনচারী পক্ষীকেও ভালবাসতে হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় দণ্ড সেই অরণ্যের একান্তে এসে দাঁড়ালেন, অন্তরীক্ষ্য-চারিণীকে সম্বোধন করে বলেন, হে নেপথ্যবাসিনী বনদেবী, দেখ আজ আমি পশু বধ করতে বাহির হইনি। আজ আমাকে তোমার সঙ্গীত শোনাও।

অরণ্যের অন্তরাল থেকে ভেসে এল অপূর্ব সঙ্গীত। তৃপ্ত হলেন মহারাজ। বললেন, হে বনেশ্বরী, তুমি অন্তরাল ত্যাগ করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও।

অরজা বললেন, আমাকে মার্জনা করবেন রাজেন্দ্র। আজ নয়।

তারপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহারাজ দণ্ড সেই বনবীথিকার প্রান্তে এসে বসেন, প্রতিদিনই বৃক্ষান্তরাল থেকে ভেসে আসে স্বর্গীয় সঙ্গীত। মুগ্ধ মহারাজ প্রতিদিনই অনুরোধ করেন, দেখা দাও।

শিহরিত অরজা বলে, আজ নয়, মহারাজ।

তিল তিল করে পরিবর্তন হতে থাকে মুঢ়মতি দণ্ডের। অকারণ পশুবধ বন্ধ করেছে সে, সুরাপানের মাত্রা কমিয়েছে। অদেখা বনদেবীর আকর্ষণে প্রতিসন্ধ্যায় এসে বসে থাকে সঙ্গীতমুগ্ধ রাজকুমার। অরজা সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। মনে হয় এখনও সময় হয়নি। তবু তামসতপস্বীর পরিবর্তনে আশাবিত্তি হয় সে।

কিন্তু অরজার মন্দভাগ্য। এক চৈতালী বৈকালে ঘটে গেল অঘটন। অন্যমনস্কভাবে মহারাজ পদচারণ করছিলেন আশ্রমসংলগ্ন উদ্যানে। সহসা এক সরোবর তীরে মহারাজ দেখতে পেলেন পরমাসুন্দরী এক ঋষিকন্যা অবগাহন স্নান করছেন। মুগ্ধ হয়ে গেলেন মহারাজ। বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করে সেই নিরুপম রূপবতী বরবর্ণিনী কন্যার

অবগাহন স্নান প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। স্নানশেষে পূর্ণকলস কক্ষে ঋষিকন্যা সরোবরে তীরে উঠে এলে দণ্ড বৃক্ষান্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন। পথরোধ করে দাঁড়ালেন সদ্যস্নাতার। শিউরে উঠল অরজা! তার দৃষ্টি হল নত, নিঃশ্বাস হল ঘন।

মহারাজ দণ্ড তার দিকে একপদ অগ্রসর হয়ে বললেন, শুভে সুশ্রোণি! তুমিই কি সেই বনদেবী?

সিক্তবসনে কোনক্রমে দেহ আবৃত করে অরজা বলে, আমার সঙ্গীতেই মহারাজ পরিতৃপ্ত হয়েছেন বটে কিন্তু আমি বনদেবী নই।

—তবে তুমি কার দুহিতা, এবং কোথা থেকে এ বিজন অরণ্যে আবির্ভূতা হলে? শুভাননে! আমি তোমাকে দেখেই কন্দর্পবানে নিতান্ত পীড়িত হয়েছি। তোমার পরিচয় দাও।

আশ্রমমৃগী সভয়ে এবং সলজ্জে ধীরে ধীরে বলেন, রাজেন্দ্র! আমাকে অক্লিষ্টকর্মা ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা বলে জানবেন। আমার নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস করি। রাজন! আমি পিতার অধীনা, সুতরাং আপনি আর অগ্রসর হবেন না। আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ করবেন না।

অরজা এই কথা বললে কামার্ত দণ্ড কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করে, বরাননে, সুশ্রোণি! তোমাকে লাভ করবার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আর ক্ষণকাল মাত্রও বিলম্ব করতে পারব না! সুন্দরি! তুমি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হও!

পিতার ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ হল অরজার। মোহান্বিত তামসতপস্বী মানবশিশু এসেছেন হলাহল আহরণে! কিন্তু কী তীব্র হলাহল! ভার্গবের ক্রোধবহ্নিতে চরাচর দগ্ধ হয়ে যাবে যে! সানুনয়ে অরজা বললেন, হে অনবদ্যাঙ্গ! আমার মহাত্মা তপোধন পিতা আপনার গুরুস্থানীয়। আপনি অন্যায়ভাবে আমার অঙ্গ স্পর্শ করলে তিনি কঠিন অভিশাপ দেবেন। পিতা ক্রুদ্ধ হলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করতে পারেন, এমন অন্যায় কার্য আপনি কিছুতেই করবেন না!

লালসাজর্জর দণ্ড বললেন, কিন্তু বরারোহে; আমি নিতান্ত মদমত্ত — আমি ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম! তুমি অবিলম্বে আমাকে ভজনা কর! — বলে সিক্তবসনা ঋষিকন্যার দিকে তিনি দুই বাহু প্রসারিত করে অগ্রসর হয়ে আসেন।

আর্তকণ্ঠে অরজা বলতে থাকে, নরশ্রেষ্ঠ! এতদূরও ক্ষান্ত হন। যদি আমার প্রতি আপনার নিতান্ত অভিলাষ হয়ে থাকে তবে ধর্মসঙ্গত উপায়ে মহাপ্রভাবশালী পিতার কাছে আমার পাণি প্রার্থনা করুন; — আমি নিশ্চয় বলছি, প্রিয়শিষ্যকে কন্যাদান করে তিনি নিতান্ত সুখীই হবেন!

কিন্তু মৃঢ়মতি কামার্ত দণ্ড কোন উপদেশই শুনলেন না। বললেন, সুন্দরি, তোমাকে লাভ করবার মূল্য দিতে যদি আমাকে নিদারুণ শাপগ্রস্ত হতে হয়, যদি আমার প্রাণও যায়, তবু আমি এই মুহূর্তে বিরত হতে পারছি না!

বান্দীকি বলছেন,

এবমুক্তা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং প্রাপ্য মহদ্বলী।

বিস্মুরন্তীং যথাকামং মৈথুনাযোপচক্রমে॥

এই নিদারুণ অনর্থ সম্পাদন করেই মৃত্যুমতি দণ্ড আত্মস্থ হলেন। অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিতান্ত ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠলেন। ধূসরসুতনী বিকীর্ণমূর্ধ্বজা অরজার দিকে আর দৃকপাত যাত্রা না করে তদন্তেই মধুমন্তনগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। বেপথুমানা অরজা পিছন থেকে আর্তকণ্ঠে বারংবার ডাকলেন — কিন্তু ভয়াত দণ্ডের কর্ণকুহরে সে আহ্বানধ্বনি প্রবেশমাত্র করল না। কুমারী অরজা ক্ষোভে লজ্জায় কাঁদতে কাঁদতে আশ্রমে ফিরে এল। তার হৃদয়ের অমৃতকুন্ত পড়ে রইল অনাদৃত — তামসতপস্বী সে পূর্ণকুন্তের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

কিছুক্ষণ পরেই আশ্রমাধিপতি মহর্ষি শুক্রাচার্য বনান্তর থেকে আশ্রমে ফিরে এলেন। দেখলেন উষাকালে অরুণ-কিরণ-রঞ্জিতা চন্দ্রকলার ন্যায় অরজা ভূশয্যায় শায়িতা। ধর্মিতা কন্যাকে প্রশ্নমাত্র করার প্রয়োজন হল না। ভার্গব যোগবলে উপলব্ধি করলেন মধুমন্তনগরাধিপতির হীনতম কুকার্য !

মহর্ষি বললেন, অপরাধীর দণ্ড আমি দেব। আমার অভিশাপে মধুমন্তনগর সমেত এই সমস্ত আরণ্যকভূমি দাবানলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। মা অরজা, তুমি ঐ সরোবর মধ্যে অবস্থিত দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ কর। আশ্রমবাসীগণ তোমার অনুগামী হবে। তোমার পুণ্যে এ অরণ্যে শুধু ঐ দ্বীপটিই দাবানলের দহন থেকে রক্ষা পাবে।

এই কথা বলে মহর্ষি তদন্তেই কঠিন অভিশাপবাণী উচ্চারণ করলেন। অরজা আশ্রমবাসীদের নিয়ে সরোদনে দ্বীপমধ্যে আশ্রয় নিলেন। ঐ দ্বীপ ব্যতিরেকে সমস্ত অরণ্য ভয়ঙ্কর দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেল। রাজ্যজনপদ সমেত মধুমন্তনগরী ভস্মস্তূপে পরিণত হল। মহারাজ দণ্ডের রাজধানীর চিহ্নমাত্র রইল না। যেখানে ছিল সুমঙ্গল রাজপথ, সুরম্য হর্ম্যমালা — সেখানে কালে দেখা দিল শ্বাপদসঙ্কুল ভয়াবহ অরণ্য ! তার নাম দণ্ডকারণ্য !

পণ্ডিত তারপ্রসঙ্গের মুখে দণ্ডকারণ্যের ইতিকথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল আমার। মনে হয়েছিল — ‘সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।’

সত্য থেকে ত্রোতা, ত্রোতা থেকে দ্বাপর, দ্বাপর থেকে কলি। যুগযুগান্তর ধরে এই হচ্ছে দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস ! আজও এ অরণ্যের আকাশে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায় ঋষিকন্যা অরজার মর্মভেদী আর্তনাদের প্রতিধ্বনি। হয়তো সেই অরজার আর্তকণ্ঠই শুনতে পেয়েছিলেন গুপ্তেজী মাড়িয়া যুবতী ‘মেরিয়ার’ কাহিনীতে — তাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অপমান করে বসেছিলেন মেহরা সাহেবকে। গুপ্তেজী কী শুনেছিলেন জানি না — আমি কিন্তু শুনতে পেয়েছিলাম চার যুগের ওপার থেকে ভেসে আসা ধর্মিতা নারীর ক্রন্দন। নারানপুরের হাটের অনতিদূরে দেখেছিলাম নিরাবরণা ভার্গবতনয়াকেই ! তৃপ্তকাম মহারাজ দণ্ডের রাজপরিচ্ছদের ছিন্ন অংশ মুঠিতে ধরে দেখেছিলাম তামস তপস্বীকে ! অমৃতে তার অরুচি ; আসক্তি আসবে।



॥ আঠার ॥

বাস্তারের বাজার বাড়ি জগদলপুরে। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ! তার একাংশে এখন কলেজ খোলা হয়েছে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন কলেজের চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রবল প্রতাপাধ্বিত বাস্তারের মহারাজ প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও যে বছর স্বর্গারোহণ করেন তার পরের বছর আমি দণ্ডকারণ্য গিয়েছিলাম। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। নকীবের তাঁর নাম ঘোষণা করবার আগে যেসব গালভারী বিশেষণের ফুলঝুরি কাটতো তার হয়তো কোন মূল্য দেবে না আজকালকার শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু নামের পিছনে কয়েকটি ক্ষুদ্র অক্ষরকে উপেক্ষা করা চলে না। প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও পি. এইচ. ডি. (কেমব্রিজ) প্রজাবর্গের কাছেই শুধু দেবতাস্থানীয় ছিলেন না, ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যেও তাঁর ছিল বিশিষ্ট আসন।

১৯৫৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র প্রবাসে মারা গেলেন। খাশ দিল্লিতে। পুত্রের কাছে জরুরী তারবার্তা এল ‘মহারাজের শবদেহ নিয়ে যাও।’

জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেও। সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ। সুন্দর ইংরাজি বলতে পারেন, সুন্দর চেহারা। বাৎসায়নের ওপরে পড়াশুনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন। তত্ত্বে বিশ্বাসী। শোনা যায় নিজেও নানা ধরনের তন্ত্র-সাধনা করে থাকেন গোপনে। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রয়াণে তিনিই উঠে বসেছিলেন শূন্য সিংহাসনে। গদিতে উঠে তাঁর প্রথম কীর্তি হল দিল্লিতে টেলিগ্রাফের জবাব পাঠানো — ‘মৃতদেহ বাস্তারে আনা হবে না, তোমরা যা হয় কর।’

দিল্লির যমুনাতীরে অনাড়ম্বর আয়োজনে শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও মহারাজা পি. এইচ. ডি. (কেমব্রিজ)-এর সৎকার করা হল। প্রবীরচন্দ্র সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। অভিষেকের অনেক অনুষ্ঠান যে তখনও বাকি! শুধু তাই নয়। এর কিছুদিন পরে জগদলপুরের রাজবাড়িতে প্রবীরচন্দ্রের একটি প্রিয় কুকুর মারা গেল। রাজার আদেশে বিরাট শোভাযাত্রা করে মৃত কুকুরকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে — দাহ করবার জন্য। রীতিমত নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হল তালুক তালুকে। কয়েক হাজার লোক ভরপেট খেলে নিল কুকুরের শ্রাদ্ধবাসরে। এখানেই ক্ষান্ত হলেন না প্রবীরচন্দ্র। যমুনায় তাঁর কুকুরের অস্থি বিসর্জন দেওয়া চাই। রাজ-অনুচরেরা সাড়ম্বরে যাত্রা করল প্রয়াণে — কুকুরের পুতাস্থি নিয়ে !

বাস্তারের লোক আড়ালে ছি ছি করলে। তবু প্রকাশ্যে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। রাজা হচ্ছেন ৮দন্তেশ্বরী মাতার প্রতিভূ। তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে। রাজার কোন অভিলাষে প্রতিবাদ করলে মাতা দন্তেশ্বরী অপ্রসন্না হবেন। অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যাবে মাঠ, অতিবৃষ্টিতে ভেসে যাবে দেশ, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে বাস্তার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গল্প কথা নয়। এ ঘটনা যখন ঘটতে দেখলাম তখন বিংশ-শতাব্দী প্রায় ষাট বছরের বুড়ো !

নারানপুর থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই শুনলাম এ হেন প্রবল পরাক্রান্ত

মহারাজ প্রবীরচন্দ্র ডঙ্কেওকে থেগুৱাৰ কৰেছেন ভারত সরকার। নরসিংগড় জেলে বন্দী আছেন মহারাজা। সিংহাসনে বসানো হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র বিজয়চন্দ্রকে।

চাপা উত্তেজনা দেখা দিল সারা বাস্তারে। মহালে-মহালে গোপন সভা-সমিতির আয়োজন হল। মহারাজার অনুগত মাতব্বর প্রজারা গোপনে মিলিত হল এখানে ওখানে। প্রকাশ্য সভাও হল কিছু। যেদিন সেখানে হাটবার সেদিন সেখানেই প্রচার চালান তারা। নতুন রাজাকে তারা মানে না। সরকার ওদের সাবেক রাজাকে, প্রবীরচন্দ্রকে আটক করেছেন — এ অপমান বাস্তারের, এ অবমাননা আদিবাসী-সমাজের প্রতি।

সরল-বিশ্বাসী আদিবাসীর দল তীরে শান দেয়, টাঙির ফলা মেরামত করে আর নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গোনে।

এই প্রসঙ্গে প্রবীরচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রাখা চলতে পারে। 1957 সালে প্রবীরচন্দ্র কংগ্রেসের টিকিটে আইনসভার সদস্য হন। সে সময়ে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনী সফরে অক্লান্তভাবে ঘুরেছিলেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে মহারাজা একদিন আশ্রয় নিলেন বাজাওন গ্রামে এক অনুগত প্রজার বাড়ি। বৃদ্ধ রাজভক্ত ব্রাহ্মণ প্রজা শিবলোচনের কুটিরে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রৌঢ়া স্ত্রী সুভদ্রাদেবী আত্মহারা হয়ে গেলেন এ দুর্লভ সৌভাগ্যে। দত্তেশ্বরীর মাতার প্রতিভূ স্বয়ং বাস্তার-রাজ আজ তাঁর অতিথি! অন্তরাল থেকে এমন মহান অতিথির পরিচর্যা করে কি তৃপ্তি হয়? সুভদ্রাদেবী স্বহস্তে মহারাজকে আহাৰ্য্য পরিবেশন করতে এগিয়ে এলেন গৃহান্তরাল থেকে। মহারাজ তাঁকে দেখলেন; শুধু তাঁর হাতে গড়া মিষ্টান্ন পরখ করেই তৃপ্ত হতে পারলেন না, — স্বয়ং বিধাতার হাতে গড়া সুভদ্রাদেবীকে চেখে দেখবার সাধ গেল। মুগ্ধ হয়ে গেলেন যুবক মহারাজ। প্রফুল্লচন্দ্র তখন জীবিত। তাই তিনি তখন আর অগ্রসর হলেন না।

পিতার মৃত্যুর পর গদিতে উঠে প্রবীরচন্দ্র ডেকে পাঠালেন শিবলোচনকে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বোধকরি তখনও সবটা জানতেন না, কানাঘুসা একটা কানে এসেছে, কান করেননি। মহারাজ তাঁকে জানালেন তিনি বিবাহ করতে চান।

শিবলোচন সত্যিই শিবনেত্র হয়ে যান। মহারাজ যদি বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তবে সেকথা এত লোক থাকতে তাঁকেই বা জানানো হচ্ছে কেন? তবু আভূমি নত হয়ে বলেন: এ তো অত্যন্ত আনন্দের কথা।

মহারাজ রসিকতা করে বলেন: আপনার নির্বাচনের উপরেই নির্ভর করব আমি। আপনার ব্রাহ্মণীকে দেখে বুঝেছি আপনি পাকা জহুরী। তাই বিশেষভাবে আপনার উপরেই দিতে চাই বাস্তার রাজ্যের মহারানী নির্বাচনের মহান দায়িত্ব। আপনি নেপালে চলে যান। রাহাখরচ বাবদ রাজকোষ থেকে হাজার দুই টাকাও নিয়ে যান। আমার জন্য একটি সর্বগুণাশ্রিতা কন্যার সন্ধান আপনাকে আনতে হবে।

বৃদ্ধ এবারেও বুঝতে পারেন না — এই কাজে তিনি কেন? আর এত দেশ থাকতে এজন্য তাঁকে সুদূর নেপালেই বা যেতে হবে কেন? কাছে-পিঠে কি সুলক্ষণা কন্যা নেই? আর সবচেয়ে বড় কথা এ কাজের জন্য দুই হাজার টাকার অঙ্কটা কিঞ্চিৎ

বেশী হয়ে পড়ছে না? কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে বলার সাহস তাঁর নেই। সানন্দচিত্তে শিবলোচনকে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হল। রওনা হয়ে পড়লেন সুদূর নেপাল অভিমুখে।

তার ক’দিন পরেই রাজ্যের বড় বড় অমাত্যেরা একটি নিমন্ত্রণ পত্র পেলেন — শ্রীমন্ মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবীরচন্দ্র ভণ্ডেও বাহাদুর বিবাহ করছেন। নিমন্ত্রণ পত্রের তারিখ আঠাশেফেব্রুয়ারী 1960। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং বাস্তারাধিপতি মহারাজ — স্থান জগদলপুরের রাজবাটি — কন্যার নাম শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী!

এবারও কেউ প্রতিবাদ করল না। সকলে সমবেত হলেন রাজবাড়িতে। যথারীতি বিবাহ শুরু হল। মন্তোচ্চারণ করছেন রাজপুরোহিত। পটুবস্ত্র পরিহিত মহারাজ, সালঙ্কারা কন্যা। প্রদক্ষিণ শুরু হল। নহবতে সাহানা বাজছে। পুরোহিত গুন্ছেন, এক-দুই-তিন...চার...পাঁচ...

মহারাজ বলেন: আরে থামো থামো! সাতপাক হয়ে গেল যে, আবার আট পাক কেন?

পুরোহিত সবিনয়ে নিবেদন করলে: আজ্ঞে না মহারাজ, সাতপাক নয়, মাত্র পাঁচপাক হয়েছে। বিবাহ সিদ্ধ হতে আরও দু’পাক বাকি!

রাজা রোষ-কষায়িত নেত্রে বলেন: আমি বলছি সাত পাক হয়ে গেছে। আর তুমি প্রতিবাদ করছ? তোমার সাহস তো কম নয়?

পুরোহিতের কণ্ঠনালী শুকিয়ে ওঠে। আমতা আমতা করে বলেন: আজ্ঞে না। মানে...

: আবার বলে আজ্ঞে না! — ধমক দিয়ে ওঠেন রাজেন্দ্র! পুরোহিতের আর বাক্যস্মৃতি হয় না!

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন মহারাজ: ক’পাক হয়েছে? ঠিক করে বল?

বেতসপত্রের মতো কাঁপতে কাঁপতে রাজপুরোহিত বলেন: আজ্ঞে সাত!

: ব্যস! এখানেই বিয়ে শেষ! এবার আহারাতির আয়োজন কর।

আইনজ্ঞ অমাত্যেরা মুখ লুকিয়ে হাসলেন।

অবগুণ্ঠনের আড়ালে এ প্রহসনে নায়িকার চোখদুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল কি না কেউ তা খোঁজ নিয়ে দেখেনি।

এর কিছুদিন পরে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল যখন মহারাজকে বলেন: আপনি সুভদ্রাদেবীকে বিবাহ করেছেন শুনে আমার অভিনন্দন...

বাধা দিয়ে সিনিয়ার কেন্দ্রিজ পাশ প্রবীরচন্দ্র চোস্ত ইংরাজিতে বলেছিলেন: কী আশ্চর্য! এমন অদ্ভুত উড়ো খবর কে আপনাকে জোগান দেয় বলুন তো? সুভদ্রাদেবী আমার মায়ের মতো। আমার রাজপ্রাসাদেই থাকেন — এবং মাতৃস্নেহে আমাকে দেখাশোনা করেন মাত্র।

আবার বলতে ইচ্ছে করে — “কী বিচিত্র এ দেশ! এমনটা তো হয়েই থাকে।”

আর পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে — এ রূপকথার গল্প নয়। আমাদের আমলের ঘটনা। রাজা আর রাণীকে...থুড়ি, রাজমাতাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি!

এ হেন প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ প্রবীরচন্দ্রকে মধ্যপ্রদেশ সরকার হঠাৎ আটক করলেন — স্থান হল তাঁর নরসিংগড় জেলে !

1957-এ প্রবীরচন্দ্র আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন। কংগ্রেস মনোনয়নে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার যা চায় তিনি তা চান না। কিংবা বলা যায় তিনি যা চান তাতে কংগ্রেস সরকারের অনুমোদন পান না। ফলে বিরোধ বাধল। প্রবীরচন্দ্র আশা করেছিলেন আদিবাসী কমিটিটুয়েন্টিতে তাঁর অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করতে সাহস পাবে না কংগ্রেস সরকার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলেন তা হল না। পদত্যাগ করলেন মহারাজ। আইনসভা থেকেই শুধু নয়, কংগ্রেস পার্টি থেকেও। আদিবাসীদের বোঝালেন কংগ্রেস সরকার আদিবাসীদের কল্যাণ চায় না — তাই তিনি দলত্যাগ করে চলে এসেছেন।

এর পরেই শুরু হল তাঁর সরকার-বিরোধী অভিযান। প্রবীরচন্দ্রকে ডেকে পাঠানো হল ভূপালে, পরে নয়াদিল্লিতে। আলাপ-আলোচনায় কিছু ফল হল না। হবে না আশঙ্কা করেছিল অনেকে, কারণ হলে তা আইনসভার ভিতরেই হতো। সে যাই হোক, প্রবীরচন্দ্র ফিরে এলেন বাস্তারে। নতুনভাবে আন্দোলন পরিচালনা করবেন তিনি। কিন্তু ও-পক্ষও আর নীরব দর্শক থাকতে রাজি নয়। মহারাজের উপর আদেশ জারি করা হল তিনি যেন তাঁর রাজ্যসীমার বাইরে না যান। বাস্তারের বাইরে যেতে হলে তাঁকে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। মহারাজ কর্ণপাত করলেন না সে আদেশে। একদিন রওনা হয়ে পড়লেন রাজবাড়ি থেকে। জগদলপুর থেকে চলেছেন রায়পুরের দিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে। রাজবাড়ির নম্বর গাড়িতে নয়। গোপনে। বাধা পেলেন মাঝপথে। গ্রেপ্তার করা হল মহারাজকে।

খবরটা শুনলাম জগদলপুরে গিয়ে। শহরটা থম্‌থম্‌ করছে। কখন কী হয় অবস্থা। দোকান-পাটও বন্ধ। এখানে-ওখানে জটলা — ফুসফুস, গুজ্‌গুজ্‌। রাস্তায় যেন টহলদারি জিপের প্রাবল্য। হাট বসেনি। পথঘাট ফাঁকা। ধুলোর ঝড় তুলে পুলিশের জিপ ছোট্টাছুটি করছে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে গিয়ে দেখি ঐ একই আলোচনা হচ্ছে। বিলিয়ার্ডস টেবিলে মার্কার অনুপস্থিত — ব্যাডমিন্টন কোর্টের বাল্ব জ্বলছে না; মায় তাসের টেবিলে সত্যিকারের সাহেব-বিবির দল এমন পটের সাহেব-বিবির মতো ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছেন, যে তাসের সাহেব-বিবির আর প্যাকেটের বাইরে মুখ বাড়ায়নি। আদিবাসী-বিদ্রোহ হবে না তো? সবাই এই চিন্তায় মগ্ন।

মেহরা-সাহেব স্তব্ধতা ভেঙে বলেন, যাক, এতে প্রমাণ হল, দরকার হলে আমরা শক্তও হতে পারি। বড় বেশি বাড় বেড়েছিল ও তরফের।

ত্রিবেদী-সাহেব বলেন, আরে রাখুন মশাই, সাহসের কথাটা আর তুলবেন না। ছি ছি ছি! নিজেদের পুলিশ ভ্যানটাও তো সাহস করে বার করতে পারলেন না।

ত্রিদেবী-সাহেব এ্যাডমিনিস্ট্রেশান বিভাগের অফিসার নন। কিন্তু ব্যাপারটা কী? প্রশ্ন করে জানতে পারলাম — মহারাজ যেমন নিজের নম্বর গাড়ি নিয়ে পলায়নের চেষ্টা করেননি, পুলিশ কর্তৃপক্ষও তেমনি নিজেদের কোন গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করেননি,

তাঁর পিছু। যে গাড়ি নিয়ে গিয়ে মহারাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটা দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার একটা ধার করা স্টেশান ওয়াগন। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে — কেন? মধ্যপ্রদেশ সরকারের আরক্ষা বিভাগে প্রিস্ন-ভ্যানে তে অভাব নেই? সে কথার কেউ জবাব দিল না। প্রশ্ন করে জেনে নিলাম গাড়ির নম্বরটা। আরে, এ গাড়ি তো হাসান চলায়। হাসানকে কে না চেনে? দণ্ডকারণ্য সংস্থার নামকরা ড্রাইভার। শীতগ্রীষ্ম এক মিলিটারি গরম সুট পরে, বুকে একরাশ মেডেল, মাথায় কাইজারি টুপি—আর দেখা হলেই মোঘলাই কায়দায় ইয়া লম্বা—‘সেলাম সরকার’! লোকটা কথা বলে বেশি। ভালই হল, ওর কাছ থেকে একটা ফাস্ট-হ্যান্ড-রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

পাণ্ডে বললেন, এক-নম্বর ঘুঘু তো ফাঁদে পড়লেন, দু নম্বরের কী হবে?

মেহরা বলেন, দু-নম্বর ঘুঘুর খবর শোনেননি? হি ইস্ আন্ডার অর্ডারিস অফ সাসপেন্সন!

—তাই নাকি?—ঝুঁকে পড়ে সবাই!

—হ্যাঁ, অর্ডারি বেরিয়ে গেছে।

পার্ববর্তী পাণ্ডেকে বলি, কার কথা বলছেন আপনারা?

পাণ্ডে মুখটি কানের কাছে এনে বলেন, আপনার দোস্ত, গুপ্তেজী!

—গুপ্তেজী? গুপ্তেজী! গুপ্তেজী সাসপেন্ডেড হয়েছেন? কেন?

—আসল অপরাধ রাজদ্রোহ! অবশ্য আপাতত তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে অন্য একটি অপরাধে। চার্জশিট ফ্রেম করা হলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।

আমি তো স্তম্ভিত!

মেহরা বলেন, বাছাধন অনেক খেল দেখিয়েছেন। এইবার আমিও দেখে নেব — ও কতবড় গুপ্তেশ্বর! চাকরি-নট তো হবেই, গলায়-তক্তি হাফপ্যান্ট পরে কপির চাষও করতে হবে! আপনাকে বলিনি এঞ্জিনিয়ার সাহেব — অপমানের শোধ আমি নেবই?

মিসেস মেহরা বিশুদ্ধ ইংরেজিতে আদুরে গলায় বলেন, ডার্লিং, এভাবে ভূপতিত শত্রুর উপর খাঁড়ার ঘা মারা ক্ষাত্রনীতি-সম্মত নয়!

উঠে পড়লাম। ভাল লাগছিল না। সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলাম ক্লাব থেকে। গুপ্তেজীর ডেরা জানা ছিল। একটা সাইকেল রিক্কা নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি সেদিকে। গুপ্তেজীর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ জয়পুরের গেস্ট-হাউসে। সেদিন দেখা করতে চেয়েছিলেন তিনি। কী যেন বলতে চেয়েছিলেন, প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আমিই। আজ অযাচিতই যাচ্ছি গুপ্তেজীর কাছে। ভদ্রলোক রুঢ়ভাষী, রগচটা, মেজাজী মানুষ — তবু তাঁর চরিত্রের কোন একটা দিকের প্রতি আমার মোহ ছিল। আমার ভাল লাগত ভদ্রলোককে। এ বিপদের দিনে একঘরে মানুষটির পাশে গিয়ে দাঁড়াবার একটা প্রেরণায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই চললাম তাঁর বাসায়।

গুপ্তেজী বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখে কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। যেন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমি এসেছি সৌজন্যসাক্ষাতে। তবু মনে মনে বেশ খুশী হয়ে উঠেছেন বোঝা যায়। আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে বসালেন; বললেন,

কী খাবেন বলুন, কোন্ড-ড্রিক্স না চা ?

বললুম, খেতে আমি আসিনি। কিন্তু ব্যাপারটা কী ?

বিচিত্র হেসে গুপ্তেজী বলেন, ব্যাপার কিছুই নয়। আমার এখন অখণ্ড অবসর। পেয়ালার পর পেয়লা চা খেয়ে সময় কাটাচ্ছি। শুনেছেন নিশ্চয়, আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

—শুনেছি। কিন্তু কী করেছিলেন আপনি ?

—তেমন কিছুই নয়। আদিবাসীদের কিঞ্চিৎ উপকার !

—সেটা তো সরকারও করতে চান। আপনার মাধ্যমেই করতে চান। তাহলে ?

গুপ্তেজী একটু চিন্তা করে বললেন, মুশ্কিল কী জানেন, আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটার ঠিক মিল নেই। আমি মহারাজের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ছিলাম।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, গুপ্তেসাহেব, আপনি বাড়াবাড়ি করছেন না কি ? আপনার-আমার মতো ক্ষুদ্রজনের এ ব্যাপারে স্বপক্ষে-বিপক্ষে থাকার কোন মানে হয় ? এ ব্যাপারে সরকার কোন পথে চলবেন সে পলিসি যে মহলে নির্ধারিত হচ্ছে তা আপনার-আমার নাগালের বাইরে। দিল্লিতে একেবারে উপরতলায় কয়েকজন কূটনৈতিক ধুরন্ধর যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই মেনে চলতে হবে এখানে। এর মধ্যে আপনার মতামত প্রকাশের স্কেপ কোথায় ?

—বলছি, তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

—বলুন ?

—আপনি পূর্ববাংলার মানুষ না পশ্চিমবাংলার ?

এ অদ্ভুত প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে না পারলেও বলি—পশ্চিমবাংলার।

—তাহলে আর আপনাকে সে প্রশ্ন করে লাভ নেই।

—কোন প্রশ্ন ?

—আপনার বাড়ি যদি পূর্ববাংলায় হত তাহ'লে আরও একটি প্রশ্ন করতাম আপনাকে।

—কী প্রশ্ন ?

—দিল্লিতে একেবারে উপরতলার আর কয়েকজন কূটনৈতিক ধুরন্ধর দণ্ডকারণ্যে উদ্ভাস্ত পুনর্বাসন বিষয়ে আজ যদি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন যে, এই দণ্ডকারণ্যের দরজা অতঃপর পূর্ববাংলার উদ্ভাস্তদের জন্য আর খোলা থাকবে না, এখানে আনা হবে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্ভাস্ত, তাহলে আপনি কী করতেন ? চুপচাপ হুকুম তামিল করে যেতেন ?

বললুম, কী হলে কী করতাম সে আলোচনা থাক। আপনি কী করেছেন ? রাজার গ্রেপ্তারে বাধা দিয়েছেন ?

হা হা করে হাসলেন গুপ্তেজী, আমি কি পাগল ? আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

শুনলাম ঘটনাটা। কোণ্ডাগাঁওয়ের হাটে গিয়েছেন গুপ্তেজী। দেখেন একটি বিখ্যাত চা-কোম্পানির মোবাইল-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে হাটের অদূরে। বিনা পয়সায় বিতরণ

করা হচ্ছে ভারতীয় চা। গুপ্তেজী নিজে চা-কোম্পানির প্রচার বিভাগের লোকদের বললেন, এসব চলবে না। হটাৎ গাড়ি!

সাধারণ লোক হলে বোধহয় ঝামেলা না বাড়িয়ে মানে মানে সরে পড়ত। দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তার-জোনের ম্যানেজার ছিলেন সে গাড়িতে। চা-কোম্পানির প্রচার বিভাগের ম্যানেজার। তিনি প্রতিবাদ করলেন। চলে যাও বললেই হল? কথা কাটাকাটি থেকে বচসা, এবং গুপ্তেজীর মতো গুনিজন উপস্থিত থাকতে মৌখিক বচসা হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হতে বিলম্ব হয়নি। ম্যানেজার ভদ্রলোক ক্ষীণজীবী — এতটা সে আশঙ্কা করেনি। মার খেয়েছে সেই বেশি। ম্যানেজারই থানায় ডায়েরি করালো প্রথমে। গুপ্তেজী থানায় যাননি। ফিরে এসেছিলেন নিজের ডেরায়।

অচিরে মামলা উঠলো কোর্টে। গুপ্তেজীর বিরুদ্ধে ম্যানেজারের অভিযোগ নয় — ভারতীয় চা প্রতিষ্ঠান মামলা আনলেন সরকারের বিরুদ্ধে! কেলেকারির চূড়ান্ত। বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে মামলা মূলতুবী রাখা হল। গুপ্তেজীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাই।

বললুম, চায়ের উপর হঠাৎ এ ভাবে ক্ষেপে গেলেন কেন? আপনি নিজে তো একজন পাঁড় চা-খোর?

—শুধু চা-খোর নই, চাকরও বটে!

—তাহলে?

—তাই তো জানি, চাকরির মতো চা-ও একটা বিস্ত্রী নেশা। আরও জানি, এই হচ্ছে নেশা-ব্যবসায়ীদের ট্যাকটিক্স। ভারতবর্ষে এভাবেই হয়েছে চা আর কফির প্রচার, চীনে হয়েছে আফিও-এর। আদিবাসীদের চা খাওয়া শিখিয়ে শিক্ষিত ক'রে তোলায় তাই আমার আপত্তি। বিনা পয়সায় চা-বিতরণের এই বদান্যতাকে তাই বাধা দিতে গিয়েছিলাম।

কী আর বলব এ পাগলকে। প্রসঙ্গ বদলে বলি, ডিফেন্সের কী ব্যবস্থা করছেন? কোনও উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন?

একটা আড়মোড়া ভেঙে উনি বলেন, নাঃ! আমি কোন ডিফেন্স দেব না।

—ডিফেন্স দেবেন না? বলেন কী! কী করবেন তাহলে?

—রিসাইন করব! ফাইন হলে ফাইন দেব। আর জেল হলে তো কথাই নেই। বেকার মানুষের তাহলে একটা হিল্লো হবে।

আমাকে নির্বাক দেখে নিজে থেকেই ফের বলেন, ভেবে দেখলাম, এভাবে দূর থেকে ওদের উপকার করা যাবে না। আদিবাসীদের সত্যিকার ভাল করতে হলে ওদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে হবে — ওদের জীবনের ভাগিদার হতে হবে। সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে বসে উপদেশ বর্ষণ করে কোন ফল হবে না।

—কিন্তু সে তো আর আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়!

—কেন নয়? দু পাতা ইংরেজি পড়েছি বলে কি মাড়িয়া হয়ে যেতে পারি না?

এবার আমার হেসে ওঠার পালা। হাসতে হাসতেই বলি, না গুপ্তেজী! ও অধিকার অত সহজে পাওয়া যায় না। আপনি এম্ফুনি বলেছেন আমি পশ্চিমবাংলার মানুষ,

তাই পূর্ববাংলার উদ্ভাস্তদের প্রকৃত দরদী আমি হতে পারি না—সেই এ্যানালজিতে আমি বলব, আপনিও কোনদিন আদিবাসীদের প্রকৃত শুভার্থী হতে পারবেন না। সঙ্কল্প করে ও অধিকার পাওয়া যায় না। সে অধিকার পেতে হলে তা জন্মসূত্রে পেতে হয়।

একটু সময় লাগল জবাবটা দিতে। কয়েকটা মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন দেওয়ালের একটা ছবির দিকে। সেই আলখাল্লাধারী বৃদ্ধ সাহেবটির দিকে। তারপর যেন বহুদূরের থেকে অশ্রুটে জবাব দিলেন গুপ্তেসাহেব, সম্মোহিতের মতো, আপনার ধারণা ভুল। জন্মসূত্রেই সে অধিকার পেয়েছি আমি। আমি, আমি গোণ্ড,মাড়িয়া গোণ্ড!

আমি বজ্রাহত!

সামনের দেওয়াল ঘড়িটায় ক্রমাগত টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ শব্দ!

দম্কা হাওয়ায় গত বৎসরের নিঃশেষিত-পৃষ্ঠা একটা ক্যালেন্ডার ক্রমাগত দেওয়ালে ওলটপালট খাচ্ছে।

রাত বাড়ছে। রিকসাওয়ালা মুখ বাড়িয়ে জানতে চায়—আরও দেরি হবো কি না? কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না। গুপ্তেজী নিজে থেকেই বলেন, মাপ করবেন, আজ আর আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না। তবে জানাব, যাবার আগে আপনাকেই শুধু জানিয়ে যাব। আরও একদিন জানাতে গিয়েছিলাম, আপনি শুনতে রাজি হননি। কিন্তু আজ আর নয়!

উঠে এলাম নীরবে। বুঝলাম, গুপ্তেজীর অন্তরেও কী একটা কথা ঐ নিঃশেষিত-পৃষ্ঠা দেওয়াল-পঞ্জিটার মতই ওঁর অন্তরের প্রাচীরে ক্রমাগত মাথা খুঁড়ে চলেছে। গুপ্তেজীর গুপ্তকথা! এ কাজের দুনিয়ায় যে ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন উনি তার প্রয়োজন বুঝি নিঃশেষ হয়েছে — একটি-একটি করে ক্যালেন্ডারের ঝরা পাতার মতো উড়ে চলে গেছে ওঁর কর্মচঞ্চল যৌবনের দিনগুলি, প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে এসে ওঁর মনে আজ আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে! অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাইটহুড ত্যাগ করা যায়, কিন্তু অন্যায় কি তাতে পরাভব মানে? হঠাৎ-ওঠা দম্কা হাওয়ায় তাঁর অন্তরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে সেই প্রশ্নটাই!

অনেকদিন আগে গুপ্তেজীকে বলেছিলুম, আপনিও তো হিন্দু। উনি জবাবে রুখে উঠেছিলেন — নো আয়াম নট! আর হিন্দুধর্মের আদর্শের যে কথা আপনি শোনালেন তাতে বলব — সে জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

কথাটা সেদিন ধাঁধার মতো মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, কী জানি হয়তো ভুল ধারণা আমার — গুপ্তেজী হয়তো সত্যিই হিন্দু নন, খ্রিস্টান, বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী। স্বপ্নেও ভাবিনি উনি নিজেকে মাড়িয়া গোণ্ড বলে পরিচয় দেবেন। লিঙ্গোপেন, বড়া-দেও, ভীমুল-পেন, তাল্লুর-মুটাইয়ের উপাসক বলে নিজেকে অকপটে ঘোষণা করবেন।

সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল গুপ্তেজীর দীর্ঘ পত্রে। জগদলপুরে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিন-পনের পরে পেলাম তাঁর ভারী রেজিস্ট্রি চিঠি। মনের ভার কারও

একজনের কাছে না নামিয়ে মানুষ শান্তি পায় না ! কী জানি কেন গুপ্তেজী আমাকে বেছে নিয়েছিলেন এ জন্যে। এই দুনিয়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার আগে তাঁর গুপ্তকথা অকপটে জানিয়ে গেলেন আমাকে। সে চিঠির জবাব আমি দিইনি — দেবার উপায় ছিল না। গড়-ঠিকানার মানুষটা হারিয়ে গেল আমার জানা এই দুনিয়া থেকে। এখন তিনি যে রাজ্যে সেখানে এই দুনিয়ার চিঠি বিলি হয় না !

গুপ্তেজীর সে দীর্ঘ চিঠিখানি আজও আমার কাছে আছে, তাঁর শেষ স্মৃতি। আজও কর্মহীন অবসরে মাঝে মাঝে সেখানি খুলে পড়ি, আর মনে পড়ে দণ্ডকারণ্যের পথে ঘটে-যাওয়া নানান টুকরো ঘটনা। গুপ্তেজীর ঘরে আলখাল্লাধারী সাহেবের ছবিটি দেখে কৌতূহলী হয়েছিলাম আমি। শুনেছিলাম, আদিবাসী উন্নয়নের কাজে নাকি গুপ্তেজীর পূর্বসূরী। স্নানরতা ঘুরিয়া মেয়েদের ছবি তোলায় গুপ্তেজী কেড়ে নিয়ে ছিলেন মেহরার শ্যালকের এক্সপোসড ফিল্ম ! নাগরদোলার মালিকের শার্টের কলার চেপে ধরেছিলেন রাগের মাথায়। অদ্ভুত মানুষটার চরিত্রটাকে ভেবেছিলাম জানা হয়ে গেছে — কিন্তু কেন তাঁর মনের গতি এ পথে গেল তা দেখিনি। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারই যেন শেষ কথা — কেন এ মাধ্যাকর্ষণ তা জানবার স্পৃহা জাগেনি মনে। গুপ্তেজীর সে দীর্ঘ চিঠি পড়ে বুঝতে পারি — কী মর্মান্তিক অভিমানে তিনি জীবনের পথে ভারসাম্য হারিয়ে একসেন্ট্রিক হয়ে উঠেছিলেন। নিজেকে বরাবর তিনি আদিবাসীদের সমতলে দাঁড় করিয়েছেন মনে মনে — আর তাই আমাদের দেখতে পেয়েছেন ওদের দৃষ্টি দিয়ে। পাগলা গারদে যদি দৈবক্রমে আটক পড়ে একজন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ, চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জিটার মস্তিষ্ক যদি হঠাৎ মানুষের মতো কার্যকরী হয়ে পড়ে তাহলে দর্শকের কৌতুক এক্সকারশান তারা যে চোখ দিয়ে দেখত গুপ্তেজী সেই চোখ দিয়েই বরাবর দেখে এসেছেন আমাদের,—‘হোয়াইট মেন্স’ বার্ডনের’ নবতম ধ্বজাধারী মানুষগুলিকে। গুপ্তেজী লিখছেন—

আমার এ চিঠিখানি পেয়ে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবেন আপনি। এতকথা কেন আপনাকে ইতিপূর্বে বলিনি আর এখনই বা কেন এত লোক থাকতে আপনাকেই জানিয়ে যেতে চাই সব কথা।

এতদিন এ কথা সকলের কাছ থেকেই গোপন রেখেছিলাম, লজ্জায় — সঙ্কোচে। এ আমার গৌরবের কথা নয়। আর আজ এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি তার কারণ আপনিই ঘটনাচক্রে আমাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

অনেক দিন আগে আপনি আমাকে একখানি ক্যালেন্ডার দিয়েছিলেন, মনে আছে ?

নাঃ ! ভুল বললাম। আজ আর সৌজন্যের খাতিরে মিথ্যা কথা বলব না — ছোটখাট ভদ্রতার কৃত্রিমতাকে ছাপিয়ে উঠে নগ্নসত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই এ চিঠিতে। তাই সত্য কথাই বলব। আপনার কাছ থেকে ক্যালেন্ডারখানা কেড়ে রেখেছিলাম আমি ! প্রতি মাসে তার পাতা একখানা একখানা করে খুলে নিয়েছি ; তবু পঞ্জিকাহীন ছবিখানা আজও রয়েছে আমার সামনেই টাঙানো। যতবার ঐ ছবিখানার দিকে তাকিয়েছি ততবারই আমার মনে জেগেছে এক অদ্ভুত চিন্তা। এ ছবিখানা

অন্যায়-যে-করে সেই মোহনের ঘর থেকে কেড়ে এনেছিলেন আপনি — অন্যায়-যে-সহে তার কাছে থেকেও কেড়ে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু ওটা কাছে রাখবার অধিকার কি ছাই আমারই ছিল? যে-মানুষ লোকলজ্জার সঙ্কোচে নিজের পরিচয় গোপন করে লোকসমাজে ঘুরে বেড়ায় তারও তো অধিকার নেই ঐ বলিষ্ঠ প্রতিবাদচিত্রটি রাখবার।

আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন আপনি। বলেছিলাম, আমি মাড়িয়া গোণ্ড। হয়তো ঘৃণা হয়েছিল আপনার। কিন্তু সেদিনও আমি সত্য কথা বলিনি। আজ বলছি। আমি মাড়িয়া গোণ্ডও নই — তার চেয়েও নীচুস্তরের জীব। আমার পরিচয় আমি — ‘ভুলাহুয়া’।

শব্দটির ইংরাজি প্রতিশব্দ: বাস্টার্ড, — ‘অবৈধ সন্তান’। কিন্তু অসভ্য আদিবাসী সমাজে বৈধতাটা বড় কথা নয়। ওরা বলে ‘ভুলাহুয়া’। ভুল ভুলই — অন্যায়ও নয়, পাপও নয়। আমি যদি ওদের সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে না আসতাম তাহলে এভাবে আত্মপরিচয় গোপন করে ফিরতে হত না আমাকে। সংসার সন্তান সবকিছু হয়ত পেতাম জীবনে। অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিত না আমাকে ঐ অসভ্য মানুষগুলি।

যাক সে কথা। আমার জন্মের ইতিহাসটাই আগে বলি। আমার বাবা ছিলেন পুলিশ বিভাগের উঁচুদের অফিসার। নামটা আর করব না — উপাধিটা তো জানেনই। মধ্যপ্রদেশ সরকারে জাঁদরেল অফিসার বলে একপক্ষে সুনাম অপরপক্ষে দুর্নাম কিনেছিলেন। বাস্তারের বিদ্রোহদমন করতে রাজধানী থেকে তিনি এসেছিলেন এই দণ্ডকারণ্যে। কোন সালে? সে সালে বাস্তারে বিদ্রোহ হয়। সেটা কোন সাল তা তো ওরা জানে না। না, আবার ভুল বলছি; — আর ‘ওরা’ নয়, এবার থেকে ‘আমরা’। কোন সালে বিদ্রোহ করেছিলাম তা তো আমরা জানি না। আমাদের কি লিখিত বর্ণমালা আছে যে, লিখে রাখব? আপনারাও লিখে রাখেননি। দিল্লিতে সেবার আপনারা দরবার করেছেন — কলকাতায় মোহনবাগান প্রথম শিল্ড পাওয়ায় হচ্ছে দারুণ হৈ হৈ। খবরের কাগজে আমাদের কথা ছাপবার মতো স্থান হয়নি। যেমন হয়নি ঠিক ঐ সময়েই আর একটি ঘটনা — রাসবিহারী বোস আর বসন্ত বিশ্বাস দিল্লিতে বোমা ফেলেছিলেন বড়লাটকে লক্ষ্য করে। পরাধীন মানুষের প্রতিবাদ! দণ্ডকারণ্যের গহন অরণ্যে ইংরাজের বুলেটে কতজন জংলি মানুষ লুটিয়ে পড়ল কে তার হিসাব রাখে? সে সময় বাস্তার মহারাজার দেওয়ান ছিলেন বৈজুনাথ পাণ্ডে। তিনি আদিবাসীদের সত্যিকারের দরদী লোক ছিলেন। প্রগতিমূলক কর্মসূচী ছিল তাঁর। কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, সমবায় প্রথায় আদিবাসীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সভ্য দুনিয়ায় তদানীন্তন মানুষ তাঁর সেই প্রগতিমূলক কর্মসূচীকে ভালো চোখে দেখল না। তারা আদিবাসীদের উদ্বেজিত করল — বেছে বেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর চালান হল অকথ্য অত্যাচার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল যা হয়ে এসেছে এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। নীরব তৃতীয়পক্ষ — ইংরেজ সরকার এবার আসরে নামলেন। কঠিন দমননীতির আশ্রয় নিয়ে বিপ্লবের

মূলোৎপাটন করা হল। বৈজুনাথ পাণ্ডের স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হল না। চা বাগানে দাস-ব্যবসায়ের সাপ্লাই এজেন্সির বিলাতী-মূলধনে আঁচড়টি লাগল না।

আমার বাবা বাস্তবে এসেছিলেন এই শুভকার্যের ব্রত নিয়ে। বিদ্রোহ দমন করে, লেবার রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানকে বিপদমুক্ত করে ফিরে গিয়েছিলেন এখান থেকে। কিন্তু যাবার আগে একটি স্থায়ী কীর্তি রেখে গিয়েছিলেন তিনি। সে কীর্তি এই ‘ভুলা হুয়া’ আমি !

এই কথাই সেদিন জানাতে চেয়েছিলাম আপনাকে, জয়পুরের গেস্ট হাউসে। জয়দীপ মেহরাকে অকারণে অপমান করিনি আমি।

রেভারেন্ড আর্নেস্ট স্টোনের পালিতা কন্যা ‘মেরিয়া’ আমার গর্ভধারিণী জননী।

ভারতবর্ষে ইংরাজের রক্তে জন্ম নিয়েছেন ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, দীনবন্ধু এ্যাড্জের মতো মানুষ। আমিও শৈশবে এসেছিলাম এমন একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে। তাঁর গল্প শুনেছেন জয়পুরে — আমি আর্নেস্ট স্টোনের কথা বলছি।

ফাঁসির মঞ্চ থেকে আমার মা ফিরে এলেন তাঁর আশ্রয়ে; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার মায়ের। সেদিনও নিষ্কৃতি পেলেন না তিনি। তাঁর দেহের অভ্যন্তরে সূচনা হয়েছে তখন প্রাণের স্পন্দন। যদি পুরোপুরি মাড়িয়া হতেন, তাহলে তিনি এ দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে পারতেন; কিন্তু কাল হয়েছিল তাঁর ইংরাজি শিক্ষা। ‘ভুল’ আর তাঁর কাছে ভুলমাত্র নয়, লেজিটিমিসির সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছিল তাঁর। ঈশ্বর করুণাময় — অবাঞ্ছিত সন্তানকে শুধু গর্ভেই ধারণ করেছিলেন তিনি — ক্রোড়ে ধারণ করতে হয়নি। সন্তান হতে গিয়ে তিনি মারা যান। বুড়ো আর্নেস্ট স্টোন তখন ষাটের কাছাকাছি। সদ্যোজাত শিশুর জন্যে ওয়েট-নার্স খুঁজতে বের হলেন আবার! — জীবনে তৃতীয় বার।

বাধ সাধলেন এবার তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা। মিসেস্ বারওয়েল এ অনাচার মেনে নিতে রাজি হলেন না কিছুতেই। তাঁর ভাইপোর ছেলে একটি মাড়িয়া গভর্নেসের অবৈধ সন্তানের সাথে এক সঙ্গে মানুষ হতে পারে না, কিছুতেই না।

আর্নেস্ট স্টোন কয়েকটা দিন গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলেন। তারপর নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। সমস্ত সম্পত্তিটা দান করে গেলেন দৌহিত্রকে। নাবালক দৌহিত্রের অছি নিযুক্ত করলেন এক ট্রাস্টিকে — মিসেস্ বারওয়েল তার এক্সিকিউটার। নিজে যোগ দিলেন ক্রিশ্চিয়ান মিশনে। বিশাল সম্পত্তি থেকে সামান্য মাসোহারার ব্যবস্থাও রাখলেন না ষাট বছরের বৃদ্ধ! ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর তীব্র বীতরাগ জন্মেছে তখন।

কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিরাও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন না। না করাই স্বাভাবিক। লক্ষপতি আর্নেস্ট স্টোনকে পেলে তাঁরা হয়তে ধন্য হয়ে যেতেন — কিন্তু এ যে নিঃস্ব স্টোন!

আমার মায়ের গ্রামেই একা হাতে কাজ শুরু করলেন উনি। খড়ো চাল ঘরে আবার একটি মাড়িয়া মেয়েকে কন্যাত্বে বরণ করে নতুন জীবনযাত্রার সূচনা করলেন।

রেভারেন্ড স্টোন আমাকে ব্যাপটাইস্ট কুরেছিলেন। ধর্মমতে আমি খ্রিস্টান। মানুষ হয়ে উঠেছিলাম সেই ইংরাজ ধর্মযাজকের কৃপায়। তিনিই ছিলেন শৈশবে আমার অবলম্বন, — বাল্যে আমার সহচর, কৈশোরে আমার ধ্রুবতারা।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কী জানেন ? এই মহাপুরুষকে আমি চিনতে পারিনি। আমি, হ্যাঁ আমিই তাঁকে হত্যা করেছি। এ খেদ আমার যাবে না জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আজও প্রতিদিন শয্যাগ্রহণের আগে আলখাল্লাধারী বৃদ্ধের ফটোর সামনে দাঁড়াই, নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি ! তবু সান্ত্বনা পাই না।

আমার বয়স তখন পনের। সেই পনের বছর বয়সে কী ঘটেছিল বলার আগে বলে নিতে চাই — জীবনের এই প্রথম কয়টা বছরই আমার সবচেয়ে সুখে, সবচেয়ে আনন্দে কেটেছে। অদ্ভুত দু-নৌকায় পা দিয়ে চলেছিলাম এই পনের বছর। গাঁয়ের ঘাটুলে আমি ছিলাম কাজাঞ্চি। অথচ রবিবারে সাহেবের সঙ্গে উপাসনা করতাম। গাঁয়ের সকলের দেখাদেখি আমিও তাঁকে সাহেব বলতাম। ইংরাজি বলতে শিখেছিলাম তাঁর সান্নিধ্যে, পড়তেও। মাড়িয়া ভাষা তো জানতামই।

সেবারে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে সাহেব অসুখে পড়লেন। গ্রামে কারও অসুখ হলে সাহেবই ওষুধ দেন। এবার সাহেব নিজেই অসুস্থ। গাইতার সঙ্গে আমি ছুটলাম শহরে। জীবনে প্রথম। আমি মাড়িয়াদের মতো কাপড় পড়তাম — শার্ট-প্যান্ট নয়। তাই আমার মুখে ইংরাজি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন শহরের ডাক্তারবাবু। তিনি এলেন আমাদের সঙ্গে সাহেবকে দেখতে।

কিন্তু ঐ শহরে ডাক্তার ডাকতে যাওয়াই আমার কাল হল। বাইরের দুনিয়াকে দেখে মাথা ঘুরে গেল আমার। আমি যে মাড়িয়া নই — এ কথাটা হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যেন। ঘন ঘন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে যেতে হত। সাহেব ওষুধ খেয়ে সামলে উঠলেন বটে, কিন্তু আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

সাহেবকে ধরে বসলাম — আমি শহরের স্কুলে ভর্তি হব। সাহেবের প্রবল আপত্তি ছিল — কিন্তু আমার আগ্রহে, আর সেই ডাক্তারবাবুটির পরামর্শে আমাকে শেষ পর্যন্ত শহরের স্কুলেই ভর্তি করা হল। বছর পাঁচেক পড়েছিলাম সে স্কুলে। থাকতাম ডাক্তারবাবুর বাড়িতেই। তাঁর ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম করে দিতে হত আমাকে। মায় ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা। ডাক্তারবাবু স্থানীয় লোক — ওড়িয়া। তাঁর একটি ছেলে আর একটি মেয়েও পড়ত আমাদের স্কুলে। ছেলেটি আমার সঙ্গে এবং মেয়েটি দু বছর নিচে। ছেলেটি আমাকে বিষ নজরে দেখতে শুরু করল। আমার প্রথম অপরাধ, ক্লাসে তার চেয়ে আমি বরাবর বেশি নম্বর পেতাম। দ্বিতীয় অপরাধ, তার বোন আমাকে ঐ বয়সেই একটু সুনজরে দেখতে শুরু করে। ছেলেটি বাপের কাছে আমার নামে মিথ্যা করে লাগালো। সবটা অবশ্য মিথ্যে নয় — তার ত্রয়োদশী ভগ্নীটি ইতিমধ্যে আমার মনে কিছুটা মোহ বিস্তার করেছিল বটে।

তাড়িয়ে দেওয়া হল আমাকে। ফিরে এলাম গ্রামে। কিন্তু এখন আমি অন্য মানুষ। জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করে এসেছি। গাঁয়ে ঐ অসভ্যদের মধ্যে আর মন বসে না। ঘাটুলে যাবার কল্পনাতেই মনটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সাহেব ডেকে পাঠালেন আমাকে। চুপটি করে গিয়ে বসলাম তাঁর পাশে। বললেন, তুমি নাকি ঘাটুলে যাওয়া বন্ধ করেছ ?

বললাম, হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন ?

উনি প্রশ্ন করেছিলেন গোপ্তিতে। আমি জবাব দিলুম ইংরাজিতে। বললুম, ঘটনের ব্যবস্থাকে আমি ঘৃণা করি, সেটাকে নৈতিক অপরাধ বলে মনে করি।

সাহেবের ভ্রু কঁচকে উঠল, বললেন, কিন্তু আমাদের বাপ-পিতামহের আমল থেকে কেউই তো এটাকে নৈতিক অপরাধ বলে মনে করেননি।

আমিও চটে উঠে বললুম, আপনার বাপ-পিতামহের কথা জানি না — কিন্তু আমার বাপ-পিতামহ ঘটলে মানুষ হননি। আপনিই তো বলেছেন, আমার বাবা হিন্দু ছিলেন।

—কিন্তু তোমার মা, মামারা — দাদামশাই ?

—তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না। আমি হিন্দু — মাড়িয়া নই।

বৃদ্ধ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, তাহলে তুমি কী করতে চাও ?

—আমি আবার স্কুলেই ফিরে যেতে চাই। আপনি অন্য একটা ব্যবস্থা করে দিন।

—তা না হয় দিলুম। ধর তুমি পাশও করলে সেখান থেকে। তারপর কী করবে ?

—কী করব তা জানি না। তবে যাই করি এ গাঁয়ে আর ফিরে আসব না।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ জবাব দেননি। তারপর ইংরাজিতেই বললেন, বেশ তাই করে দেব — কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। একথা জানবার বয়স হয়েছে তোমার।

ধীরে ধীরে আমার জন্ম ইতিহাস বলে গেলেন তিনি। সব কথাই খুলে বলেছিলেন। সে কাহিনী আপনি শুনেছেন জয়দীপ মেহরার মুখে — জয়পুরের গেস্ট হাউসে। মনে আছে, অনেক বড় বড় লোকের নাম করেছিলেন তিনি সে কাহিনীর মাঝে মাঝে — আলেকজান্ডার, টলেমি, লেঅনার্দো, কন্ফুশিয়াস্ মায় স্বয়ং যীশুখ্রিস্টের নামও করেছিলেন। আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন জন্মটা কিছু নয় — সেটা মানুষের হাতের বাইরে, কর্মেই মানুষের পরিচয়। সন্মুখে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে যা বলেছিলেন তার নিগলিতার্থ হচ্ছে যে, হিন্দু-সমাজে আমার ঠাঁই হবে না। মাড়িয়া সমাজে ‘ভুলা-হুয়ার’ কিন্তু পূর্ণ মর্যাদা আছে। তিনি চেয়েছিলেন, আমি যেন মাড়িয়া পরিচয়টাই বহন করি।

সে রাত্রের গৃহত্যাগ করেছিলাম। প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল ঐ বৃদ্ধের ওপর। কেন শৈশবেই তিনি আমাকে হত্যা করেননি ? কেন এতদিন এসব কথা গোপন করেছিলেন আমার কাছ থেকে ? আমার বাবার সঙ্গে আমার মায়ের বিবাহ হয়নি একথা কেন জানাননি ? বিবাহ তো দূরের কথা — তাঁদের মধ্যে প্রণয়ও হয়নি। একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে মিথ্যা রিপোর্ট লেখবার প্রয়োজনে আমার মাকে বলি দেওয়া হয়েছিল একজন লালসা-জর্জর পুরুষের কামনার যুপকাঠে। সেই অকথ্য অত্যাচারের, সেই ক্ষমাহীন ব্যভিচারের স্থায়ী কলঙ্কচিহ্নটার নাম আমার ব্যক্তিসত্তা।

মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। মনে হল কয়েকটা মানুষকে পরপর খুন করতে পারলে বোধহয় এ যন্ত্রণার উপশম হবে। পেন্সিল কাটা ছুরিটা হাতে সারারাত পায়চারি

করেছিলাম আর্নেস্ট স্টোনের খড়ো-ঘরের সামনের বারান্দায়। পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ভোর রাতে গৃহত্যাগ করেছিলাম।

এরপর সাহেবের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। নানান বন্দরে ঘুরেছি উদ্ভ্রান্তের মতো। ভারতবর্ষের বাইরেও চলে গিয়েছিলাম জাহাজের খালাসী হয়ে। কোথাও শান্তি পাইনি। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে চাকরি নিয়েছিলাম মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগে। জন্মভূমির টান কি মানুষে সহজে কাটাতে পারে।

নিজের গ্রামেও গিয়েছি। কেউ চিনতে পারেনি আমাকে। রেভারেন্ড স্টোন সাহেবের কুটিরের চিহ্নমাত্র নেই। ঘটুল-ঘরটা কিন্তু আজও আছে। গাঁয়ের গাইতা সেখানেই আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছিল। শুনলাম 1940 সালে চুরাশি বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন বৃদ্ধ স্টোন। যে পেন্সিলকাটা ছুরিটা আমি সাহস করে ঝঁর বুকে বসাতে পারিনি — সেটাই আমার অলক্ষ্য হাত বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন ঝঁর বুকে। জীবনের শেষ আট দশটা বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ওখানেই। কোরাপুট থেকে আহান এসেছিল, মিশনারিরা নিয়ে যেতে চেয়েছিল — উনি যাননি। গাঁয়ের মানুষই শেষদিন পর্যন্ত শুশ্রূষা করেছে তাঁর। সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল — না সেই গ্রামে নয়, কোরাপুটে।

আপনি তো কোরাপুটে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন-সংস্থার চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িটা তৈরি করেছেন। ঐ টিলার নিচে একটা ছোট কবরখানা আছে লক্ষ্য করেছেন? এখন যেটা চিফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেবের বাংলো ওটা ছিল টি.ডি.এল.এ.-এস্টেটের অর্থাৎ লেবার রিক্রুটিং অফিসের ম্যানেজারের বাড়ি — সেই বাংলোবাড়ির উল্টো দিকে এই সিমেটারি।

ঐ কবরখানার উত্তর-পশ্চিম ধারে দেওয়াল ঘেঁষে দেখবেন দুটি কবর আছে। বাপ আর মেয়ের। পাশাপাশি। শ্বেত করবী গাছটা এখন আর নেই; কিন্তু গাছের অস্তিত্বটা টের পাবেন — পাঁচিলের ফাটলটা দেখে। সেটা আর মেরামত করেনি কেউ। কবরটা জীর্ণ, তবু রেভারেন্ড আর্নেস্ট স্টোনের এপিটাফটা আজও পড়া যায়। মিসেস বারওয়েল নাকি ওটা লিখিয়েছিলেন। এর চেয়ে ভাল এপিটাফ অন্তত আমি লিখতে পারতুম না। কাত হয়ে পরা এপিটাফ পাথরের একদিকে তাঁর জন্ম তারিখ, অন্যদিকে মৃত্যুদিন। মাঝখানে লেখা

‘আন্ডার দিস্ স্টোন লাইজ
রেভারেন্ড আর্নেস্ট স্টোন
উইথ অল হিস্ আর্নেস্টনেস।’

এ চিঠির জবাব পাওয়ার উপায় নেই। আমার পরবর্তী ঠিকানা আমি নিজেই জানি না। এটুকু জানি যে, সে ঠিকানায় ডাক বিলি হয় না। চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছি। সেটা বড় কথা নয়, না দিলে আমাকে ঝঁরাই বরখাস্ত করতেন। স্থির করেছি, জন্মসূত্রে যারা আমার আত্মীয় তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করব। রেভারেন্ড স্টোনের মতো আর্নেস্টনেস্ নাই থাকল, আমার যেটুকু সাধ্য তাই করব। কিছু জমি বন্দোবস্ত নেব

খাশ আবুজমাড়ে। খেত-খামার করব। মাড়িয়া হয়ে যাব। কে বলতে পারে হয়তো সংসারও পাতব সেখানে। ওখানে তো আর আমি জারজ নই, আমি 'ভুলা-হুয়া' মাত্র! সত্তর বছর বয়সে যদি আর্নেস্ট স্টোন নতুন জীবন শুরু করতে পারেন তাহলে ॥ এমসে আমিই বা পারব না কেন?

একটা কথা। নারানপুরে গিয়েছিলাম মোহনকে খুঁজে বার করতে। তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বাকি ছিল। এ অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি না। তেমন মায়ের সম্মান নই আমি। কিন্তু আমাকে কিছুই করতে হল না। দেব আঙ্গোপেনের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে মোহনের উপর। মোহন নারানপুরে নেই। তার নাকি কুষ্ঠ হয়েছে। স্থানীয় চিকিৎসকের নির্দেশে সে গেছে বোম্বাই অথবা কলকাতায়।

শীঘ্রই চলে যাচ্ছি আবুজমাড়ে। সভ্য জগত থেকে বেশি কিছু সাথে নেব না। ঘড়ি-কলম-জামা-কাপড় ছাড়াই যদি আমার মাতৃকুলের যুগ-যুগান্তর স্বচ্ছন্দে কেটে গিয়ে থাকে তাহলে আমারও তা কাটা উচিত। যে কয়টি জিনিস সাথে নিয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে রইল রেভারেন্ড স্টোনের ফটোগ্রাফ, আর আপনার দেওয়া একটি স্মৃতিচিহ্ন — সেই নিঃশেষিত-পৃষ্ঠা ক্যালেন্ডারের ছবিখানি। হোয়াইট মেন্স বার্ডেনের ব্যতিচার দেখে শিউরে ওঠা কবিগুরুর ছবিখানি।

গুপ্তেজীর চিঠিখানির অনুলিপি পাঠিয়েছিলাম নারানপুরে ডাক্তার পিল্লাইকে। জয়পুরে গুপ্তেজীর অদ্ভুত আচরণের এ কৈফিয়ৎ ডাক্তার সাহেবেরও জানা উচিত। শেষদিকে মোহনের উল্লেখ ছিল। সেটার কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই মোহন ও রঙিলার উপাখ্যানটাও লিখেছিলাম চিঠিতে সবিস্তারে। যে অন্যায় করেছিলাম সেদিন অন্যায় সহ্য করে তার জন্য অনুতাপও জানিয়েছিলাম অকপটে।

জবাব এল কিছুদিনের মধ্যেই। গুপ্তেজীর চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার মাত্র আছে সে জবাবে — আর কিছুই নেই। লিখেছেন, আমিও আপনার গুপ্তেজীর সঙ্গে একমত। আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছিলেন ঘটনাস্থলেই গুপ্তেজীকে মোহনের অপরাধের কথা না বলে। তার চেয়েও বড় অপরাধ করেছিলেন আমার কাছে সে কথা গোপন করে। আপনাকে আমি বারে বারে বলেছিলাম — পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কথা বলে যেতে। রঙিলার সম্বন্ধে এতবড় সংবাদটা তা সত্ত্বেও কেন যে আপনি গোপন রেখেছিলেন, তা আজও আমার বুদ্ধির অগোচর। প্রথম রাত্রেই যদি অকপটে সব কথা বলতেন আপনি — তাহলে চয়নের কেসটা নিয়ে এত বেগ পেতে হত না আমাকে। তখনই নির্ভুল ডায়াগনসিস্ করতে পারতাম।

আপনার চিঠি পড়েই বুঝতে পারলাম চয়নের কী হয়েছে। কেন সে পাগল হয়ে গেছে। কী আশ্চর্য, এমন সহজ সমাধানটা আপনার মাথায় আসেনি মোহন-রঙিলা উপাখ্যান জেনেও?

মোহন আমার চিকিৎসাধীনেই ছিল। আপনার চিঠি পেয়েই ডায়েরি খুলে দেখলাম মোহন কবে প্রথম আমার কাছে এসেছিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান। অন্তত আপনার গুপ্তেজীর চেয়ে বুদ্ধিমান। সে বুঝতে পেরেছিল তার কুষ্ঠ হয়নি, হয়েছে অন্য একটি সুপরিচিত রতিজ রোগ। কেস হিস্ট্রি লেখার সময় সে প্রথম রোগাক্রান্ত হবার একটা সম্ভাব্য

তারিখ বলেছিল অকপটে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম ঐ তারিখেই গত বৎসর নারানপুরে মাড়াই হয়। লাফিয়ে উঠলাম নিজের আবিষ্কারে। ডাক্তারী বইটা হাতে নিয়ে তখনই চলে গেলাম চয়নের ছাপরায়। রোগাক্রান্ত একটি পুরুষের ফটো ওর সামনে মেলে ধরে বললাম, রঙিলার ধুরবানে তোমার কি এই রকম হয়েছে?

যেন ইলেকট্রিক চাবুক মেরেছি ওকে। চয়ন লাফ দিয়ে উঠে বলে, তুই কেমন করে জানলি?

বললুম, আমাদের ডাক্তারি পাংনাহারাও (ঝাড়ফুকওয়ালারা) এই ধুরবানের (মারগ মস্তের) কাটান জানে। এই দেখ, ধুরবানের ছবি তুলে রেখেছি — আর এই দেখ ভাল হয়ে যাবার পরে ফটো।

ফটো জিনিসটাকে চয়ন ভাল রকমই চিনত — এই বাঁচোয়া। ব্যস, চয়ন সম্পূর্ণভাবে শরণ নিল আমার। অকপটে স্বীকার করল সব কথা। যে রাতে অন্ধকারে সে রঙিলাকে মাল্কো বলে ভুল করেছিল তারপর দিন সকালেই রঙিলা ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করে সরাসরি দাবি জানায় চয়নকে বিবাহ করতে হবে রঙিলাকে। চয়ন জ্বলে উঠেছিল ওর নির্লজ্জতায়। যে গালাগালে সবচেয়ে বেশি আহত হয় রঙিলা সেই গালই দিয়েছিল তাকে। বলেছিল, পাংনাহিন্! তুই ডাইনি!

রাগ করেনি রঙিলা। খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলেছিল, তাহলে তো তুই জানিস্ই। ঠিক বলেছিস, পাংনাহিন্! কাল রাতে যে কাণ্ডটা তুই করেছিস তারপর যদি আমাকে ফেলে মাল্কোকে বিয়ে করতে ছুটিস তাহলে আঙুল মটকে ধুরবান ছুঁড়ব তোর দিকে।

চয়ন রুখে উঠে বলেছিল, তাই ছোঁড়। আমি ভয় পাই না তোকে! মার আমাকে! খুন করে ফেল। দেখি তুই কতবড় ডাইনি!

অদ্ভুত হেসে রঙিলা বলেছিল, না রে, প্রাণে তোকে মারব না! একটি ধুরবানে তোকে মেয়েমানুষ বানিয়ে দেব! আর মাল্কোকে বিয়ে করতে পারবি না — তারপর খিলখিল করে হেসে বলেছিল, আমাদের শিরদারকে বলব, তোর জন্যে লামহাদা খাটতে যাবে কাবোঙ্গায়।

দূরন্ত ভয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছিল চয়ন! রঙিলা একটা জলজ্যান্ত পুরুষমানুষকে পৌরুষ থেকে চিরবঞ্চিত করতে পারে!

তার সে আতঙ্ক-তাড়িত মুখখানা দেখে আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল রঙিলা। বলেছিল, সেই ঠিক হবে! পুরুষমানুষ হয়ে যেমন লোভে লোভে আসুকালোন ঘরে ঢুকেছিলি তেমনি ওখানেই ঢুকতে হবে তোকে এরপর। মাসে-মাসে!

দূরন্ত ক্রোধে পাশে পড়ে থাকা ধনুকটা তুলে নিয়েছিল চয়ন। অব্যর্থ লক্ষ্যে মারলে একটা বিষাক্ত তীর। একচুল বিচলিত হয় না রঙিলা। চোখ দুটো শুধু ধ্বক করে জ্বলে উঠল তার। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে! আঙুলগুলো মটমট করে মটকে রঙিলা বিড়বিড় করে কী যেন বললে। তারপর ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় দেওয়ালে গঁথে যাওয়া তীরটা সবলে উৎপাটন করে আবার ছুঁড়ে দিয়ে গেল চয়নের দিকেই।

অসাড় হয়ে রইল চয়ন, কাবোঙ্গা গাঁয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী তীরন্দাজ। মাত্র পাঁচ হাত

দূরের লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি সে। জ্ঞান হবার পর এত কাছের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা মনে পড়ে না তার। চয়ন শিরদার তার পৌরুষকে হারাতে শুরু করেছে!

দুদিন কি তিনদিন! চয়ন লক্ষ্য করল ধুরবানের ফল ফলতে শুরু করেছে। সে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে — তিল তিল করে তার পৌরুষ ক্ষয়িত হতে শুরু করেছে! ক্রমে সে নারীতে পরিণত হয়ে যাবে! দুঃসহ এ চিন্তা। এ কথা কাউকে বলা যাবে না। কিন্তু আজীবন একথা লুকিয়েই বা রাখবে কেমন করে? মাল্কোকে কী বলবে?

তারপরের ইতিহাস আর ওর ভাল মনে নেই।

আয়েতু আন্দাজ করেছিল কিছুটা। রঙিলাকে চেপে ধরেছিল সে, চয়ন পাগল হয়ে যাচ্ছে কেন?

অকুতোভয়ে রঙিলা বলেছিল, আমার জন্যে। আমি ওকে ধুরবান মেরেছি।

—ধুরবান! তুই ধুরবান ছাড়লি কেমন করে? তুই কি তাহলে সত্যিই পাংনাহিন?

চিৎকার করে উঠেছিল রঙিলা, হ্যাঁ, আমি পাংনাহিন! কিন্তু কথাটা তো তুই জানিস। না হলে যে আমার জন্যে লামহাদা খাটতে এল কেন তুই তাকে মাল্কোর হাতে তুলে দিলি?

আয়েতু তুলে নিয়েছিল মাক্সুটা। কিন্তু কোপ বসানোর আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল রঙিলা। আয়েতুও ছাড়বার পাত্র নয়; তাড়া করল রঙিলাকে। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল সেই অরণ্যচারী ডাইনিটা। আয়েতু বাধ্য হয়ে ফিরে এল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এর শোধ সে নেবেই। যাবে আর কোথায়? ফিরতে ওকে হবেই। আর তখন আয়েতু দেখে নেবে রঙিলা কতবড় পাংনাহিন! গাঁয়ের গাইতা সে — অত সহজে তার হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া যায় না।

কিন্তু সে সুযোগ আর আয়েতু পায়নি কোনদিন।

রঙিলা ফিরে আসেনি। একদিন, দুদিন — শেষে ভয়ই পেল আয়েতু। গেল কোথায় মেয়েটা? কোথায় তা কেউ জানে না। জঙ্গলের পথেই মিলিয়ে গিয়েছিল আয়েতুর সেই কুড়িয়ে পাওয়া প্রকৃতির সন্তান। তারপর তাকে আর কেউ দেখেনি কারাংমেটায়।

চিঠি শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ল রঙিলাকে। তাকে প্রথম দেখেছিলাম কাবোঙ্গা ঘট্টলে। প্রশ্ন করেছিলাম গুপ্তেজীকে — এমন মেয়ে কেমন করে এল মুরিয়া গাঁয়ে। শুনে ক্ষেপে গিয়েছিলেন উনি; বলেছিলেন, সভ্য জগতের মানুষের অসাধ্য কাজ আছে? জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা মেয়ের সর্বনাশ করে যাওয়া আর শক্ত কী? সেদিন তাঁর উম্মা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আজ বুঝতে পারি কারণটা। মায়ের কথা মনে পড়েছিল গুপ্তেজীর।

কিন্তু গুপ্তেজীর নয়, রঙিলার স্মৃতিকে ঘিরে আজ চিন্তা জাগছে আমার। মনে পড়ছে কাবোঙ্গা ঘট্টলে একরাতের অতিথির সেই প্রগল্ভ নাচ, ‘ও হো ম্যয়না হো লালসাই’; মনে পড়ছে চয়ন শিরদারের প্রতি নিষ্কিপ্ত সেই বিদ্রূপ বাণ — ‘বারাং সারপার্তে উদিতন সায়দার।’ মনে পড়ছে যৌবনউচ্ছল নৃত্যরতা সেই লাস্যময়ী তরুণীকে। তারপর অন্ধকার নির্জন অরণ্যে দেখেছি তার আর এক রূপ! সেদিন

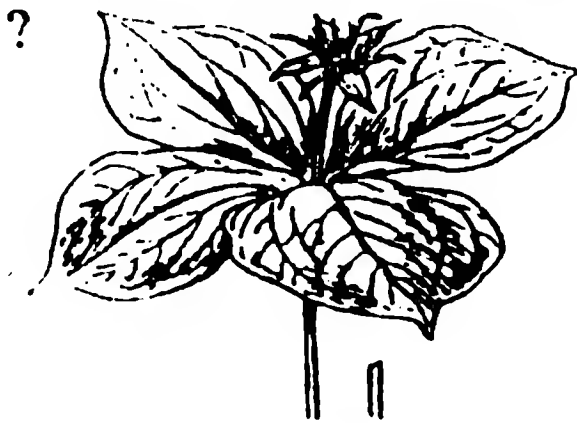
সে ছিল নিরাবরণা ধর্ষিতা ভার্গব নন্দিনী! কে জানে উশনা-কবির আত্মজা অরজার মতো এই অরণ্যচারিণী মেয়েটির অন্তরেও হয়তো লুকানো ছিল অমৃতকুণ্ড। স্বামী-সন্তান-সংসার চেয়েছিল সেও, আর পাঁচটা মুরিয়া মেয়ের মতো, অরজার মতো। পায়নি! হয়তো সে সত্যিই ভালবেসেছিল একটি অনিন্দ্যকান্তি মুরিয়া যুবককে — যার কাছে তার নারীত্ব প্রথম পেয়েছিল স্বীকৃতি। ভাগ্যের খেলায় শুধু বঞ্চনাই জুটল তার কপালে। প্রমাণিত হল সে পাংনাহীন। গুপ্তেজী যেমন মাড়িয়া মায়ের ছেলের পরিচয় বহন করে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের সমাজে, — হয়তো রঙিলাও তেমনি বনজঙ্গল ভেদ করে ফিরে এসেছিল তার মাতৃকুলের সমাজে। কে জানে? অথবা হয়তো বন্যজন্তু নখরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তার অতৃপ্ত দেহমন!

পিল্লাই-সাহেবের চিঠির জবাব লিখে উঠতে পারিনি। বছরের প্রথম তিনটে মাস আমাদের কাজের চাপ বেশি। মাসখানেক পরে আবার চিঠি এল নারানপুর থেকে। এবার ডাক্তারবাবু নয়, লিখছেন মিসেস্ পিল্লাই — একটি সুখবর আছে। একটা নয়, দুটো। প্রথমত চয়নের নাকি অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে চিকিৎসায়। প্রায় রোগমুক্ত সে। আপনার বন্ধুর মতে আরোগ্য নাকি দ্রুততায় ওঁর প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। বোধহয় প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে। এই সপ্তাহেই ইন্জেকশনের কোর্স শেষ হচ্ছে। সে এখন ধরতে গেলে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। সে যাই হোক, আগামী পঁচিশে মার্চ চয়নের বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। এখনও প্রায় মাসখানেক সময়। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করছি, ক্রটি মার্জনা করে এ বিবাহে যোগদান করলে শুধু আমরা যে বাধিত হব তা নয়, স্বয়ং চয়নও খুশী হবে। তারই অনুরোধে আপনাকে আসতে লিখছি। এই মওকায় একটা মুরিয়া বিয়ে দেখে নিতে পারবেন, এটাও কম লাভ নয় আপনার তরফে।

দ্বিতীয় সুখবরটা হচ্ছে, উনি রিসাইন দিচ্ছেন। রিসার্চের কাজে যোগদান করবার মন হয়েছে এতদিনে। বিয়ে মিটে গেলেই আমরা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে যাব।

এই সঙ্গে একটা দুঃসংবাদও দিচ্ছি গোপনে। এ অঞ্চলে আদিবাসী মহলে একটা গোপন ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হচ্ছে মনে হয়। মহারাজ প্রবীরচন্দ্রের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চয়ন মনে হয় সেই দলে পাণ্ডাগিরি শুরু করেছে। উনি তাই তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দিতে চান। যেন সংসার থাকলেই পাগল মানুষ পাগলামি ছাড়তে পারে! আমি তা মোটেই বিশ্বাস করি না। ভুক্তভোগী কিনা। আপনি কী বলেন?

এ বিষয়ে আমি কী বলি তা অবশ্য জানাইনি। তবে চয়নের বিয়েতে যেমন করে পারি যাবার চেষ্টা করব — একথাটা জানালাম উত্তরে। মুরিয়া বিয়ে দেখার এমন দুর্লভ সুযোগটা ছাড়ব কেন?



॥ উনিশ ॥

সরকারী এঞ্জিনিয়ারিং অফিস সম্বন্ধে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তাঁরাই জানেন মার্চের শেষ সপ্তাহে ক্যাজুয়াল লিভ চাওয়ার সঙ্গে আকাশের চাঁদ চাওয়ার কোনও প্রভেদ নেই। ডিভিশনাল এ্যাকাউন্টেন্টের টেবিলে মার্চ-ফাইনাল বিল জমেছে যেন বাইলা-ডিলা পর্বত! আমার স্বল্প-পরিসর ড্রয়ারে মেজারমেন্ট-বই যেন কলকাতার রাস্তায় অফিসগামী ট্রামবাসের ভিড়! একটা বিল নামে তো পাঁচটা বিল ঢুকতে চায় ড্রয়ারে! তবু দিন-তিনেকের ছুটি মিলল বিশেষ চেষ্টায়। একদিন যাওয়া একদিন আসা বাদ দিলে একদিন বিয়ে দেখতে পাব।

মুরিয়া বিয়ে রাতারাতি সারা হয় না। পাক্কা সাত-আটদিন ধরে চলে বিবাহ উৎসব। মুরিয়া বিয়ে, ভেরিয়ার সাহেব বলেছেন, নানান জাতের। আগেকার দিনে আমাদের রাক্ষস-বিবাহ, শৈব-বিবাহ, গান্ধর্ব-বিবাহ প্রভৃতি নানান জাতের বিয়ের বিধান ছিল। এখনও হিন্দু-বিবাহ, ব্রাহ্ম-বিবাহ, রেজিস্ট্রি বিয়ের প্রকারভেদ আছে। মুরিয়া বিয়েরও তেমনি ছয়টি শ্রেণী বিভাগ আছে—

সাধারণ বিয়ে হচ্ছে ‘ওস্তাসানা মার্মি।’ বাপমায়ের ব্যবস্থাপনায় এ বিয়েতে কনেকে হলুদের টিকা পরিয়ে বরের ঘরে পাঠানো হয় ‘লাগির’ অর্থাৎ বিবাহের মূল অনুষ্ঠানে। এরই প্রকারভেদ হচ্ছে ‘তাক দিয়ানা’। এ ক্ষেত্রে সম্প্রদান বা ‘লাগির’ অনুষ্ঠিত হয় কনের বাড়ির সামনে একটা নতুন তোলা ছাপরায়। কনেকে নিয়ে ইলোপ করে বন্ধুর বাড়িতে উঠে রাতারাতি রোমান্টিক বিয়ের ব্যবস্থাও আছে — এর নাম ‘আরউইটানা।’ এটি গান্ধর্বমতে। খরচ যা হয় তা বর দেয়।

সবচেয়ে মজা হচ্ছে ‘হাইওয়ার্ক ওয়াং’ বা ‘পাইতু’। এটির কোন বিকল্প আমাদের সভ্যজগতে প্রচলিত নেই। তাই এটির ব্যাখ্যা করতে ভয় হচ্ছে। আমাদের সমাজে এটি প্রচলিত হলে ফুলে-ফুলে মধু-খেতে অভ্যস্ত তরুণদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হতে পারে! এটিকে প্রাচীন স্বয়ম্বর প্রথার রাক্ষসরূপ বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি, মুরিয়া ছেলেমেয়ের সমান অধিকার। ছেলে যদি কনেকে ইলোপ করে বন্ধুর বাড়িতে উঠে গান্ধর্ব মতে ‘আরউইটানা’ করতে পারে তাহলে মেয়েরাই বা সে-জাতীয় অধিকার পাবে না কেন? ‘পাইতু’-তে কনে একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করে এবং মনে মনে যাকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছে, — কিংবা যে তরুণ তাকে গোপনে ভালবাসা জানিয়েছে, তার বাড়িতে গিয়ে চড়াও হয়। লজ্জার মাথা খেয়ে ধর্না দেয় সেখানে! যতক্ষণ না ছেলেটি বিবাহে মত দেয় ততক্ষণ সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকে। ছেলেটির পক্ষে অভিসারিকাকে প্রত্যাখ্যান করা অপৌরুষের পরিচায়ক। সমাজ এক্ষেত্রে মেয়েটির পক্ষ নেয়। মেয়েদের হাতে এই ব্রহ্মাস্ত্রটি থাকায় ঘটলঘরের অবাধ সুযোগ গ্রহণ করবার পূর্বে মুরিয়া যুবককে ভেবেচিন্তে অগ্রসর হতে হয়। ইংরাজ কবির সেই সাবধান বাক্যটি না জেনেও ওরা তাই মানে — ‘বেটার ডাই, দ্যান কিস্ উইদাউট ল্য’ভ!’

বিধবা বা বিপত্নীক যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তখন বিবাহ অনুষ্ঠানকে সংক্ষেপ করা হয়। যাতে খরচটা কমে। অনাড়ম্বর এ বিয়ের নাম — ‘তিকাতাসানা।’

ছয় নম্বর বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হয় যদি হঠাৎ কোন মোটিয়ারী কুমারী অবস্থাতেই জননী হয়ে পড়ার উপক্রম করে। এ ক্ষেত্রেও অনুষ্ঠান সংক্ষেপিত করা হয়। সামাজিক অনুমোদন লাভ করতে যেটুকু না করলে নয় সেটুকুই অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়ের গোষ্ঠি নাম ‘ইয়ের দোসানা মার্মি।’ ‘মার্মি’ হচ্ছে বিয়ে—আর ‘ইয়ের দোসানা’ হচ্ছে জল ঢালা। এর একটি হালবি প্রতিশব্দ আছে ‘ভুল-বিহাও’। অবশ্য ভুল-বিহাও আর ইয়ের-দোসানা ঠিক সমার্থক নয়। অনাগত সন্তানের পিতা আনুষ্ঠানিকভাবে মোটিয়ারীকে বিবাহ করে শিশুকে ‘ভুলা-হুয়া’ থেকে নিষ্কৃতি দিতে রাজি হয় তাহলে সেটাকে বলব — ইয়ের দোসানা। অপরপক্ষে মোটিয়ারীকে ভালবেসে অথবা তার প্রতি করুণাবশত যদি অপরের অপরাধের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কোন চেলিক বিয়ে করতে এগিয়ে আসে তখন তাকে বলে — ‘ভুল-বিহাও’!

চয়নের বিয়ে হচ্ছে স্বাভাবিক পদ্ধতি — অর্থাৎ ‘তাক-দিয়ানা’ বিয়ে। তিন দিনের মতো ছুটি পেয়ে তাই ছুটলুম নারানপুরে।

বরকর্তা ডাক্তার পিল্লাইয়ের ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি নেই। গোটাতিনেক তাঁবুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম কারাংমেটায় তার আগেই কম্পাউন্ডারবাবু তিনটি তাঁবু খাটিয়ে ফেলেছেন। একটাতে থাকব আমরা তিনজন। পাশের তাঁবুতে মিসেস পিল্লাই আর কম্পাউন্ডারবাবুর স্ত্রী — তৃতীয়টি রান্নাঘর। লতা-পাতা দিয়ে অস্থায়ী স্নানাগারও একটি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

স্থানটা মনোরম। কারাংমেটা গ্রামও নারান্দী নদীর ধারে। একদিকে দিগন্ত-অনুসারী ধানের ক্ষেত — এখন নাড়ামুড়ো ভরা ফাঁকা মাঠ। অন্যদিকে নারান্দীর বালি-চিক্-চিক্ টলটলে জল। আকাশের পশ্চাৎপটে নীলচে সবুজ ঢেউয়ের পর ঢেউ-তোলা আবুজমাড় পাহাড়। হরিতকী-বয়ড়ার গোটা কতক গাছের ছায়াঘন একটা জায়গায় শিবির সংস্থানের স্থান-নির্বাচনটা ভালই হয়েছিল বলতে হবে। শবরী তো নেমেই ছুটলো নদীর পাড়ে, নুড়িপাথর সংগ্রহে। বর্ষাগমে নারান্দী হয়তো উপড়ে ফেলবে ব্রিজের এ্যাভার্টমেন্ট — এখন শবরীও অনায়াসে পারাপার করতে পারছে!

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম পড়ন্তবেলায়। মহিলারা এলেন আমারই সঙ্গে। ডাক্তারবাবু এসেছেন গতকাল। ধুলায় লাল জামা-কাপড় ছেড়ে, নারান্দীর জলে মুখ-হাত ধুয়ে এসে বসলাম সবাই গোল হয়ে। মিসেস পিল্লাই টিফিন ক্যারিয়ার খুলে সবাইকে খাবার পরিবেশন করতে থাকেন। আমার সঙ্গে আদালী নন্দু থাপাও এসেছিল। ডাক্তারসাহেবের ড্রাইভার আর ক্লিনারের সঙ্গে সে লেগে গেল রান্না-তাঁবুতে কাঠের উনানে চায়ের আয়োজনে।

দুটি মাত্র খাটিয়া জোগাড় করা গেছে। দৈর্ঘ্যে সে দুটি এত ছোট যে তাতে আমার পক্ষে শোবার চেষ্টাই হবে হাস্যকর; সুতরাং এই মওকায় শিভ্যালরি দেখিয়ে সে দুটি মহিলাদের তাঁবুতে চালান করে দেওয়া গেল। মাটিতেই পুরু করে খড় বিছিয়ে বিছানা পেতে নিলাম। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে জুত করে শোবার উপক্রম করছি, পিল্লাই সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেন, ও কি মশাই, শুচ্ছেন যে? বিয়ে দেখতে যাবেন না?

—বিয়ে? সে তো কাল। আজ আবার কী?

—মুরিয়া বিয়ে আপনাদের মতো এক সন্ধ্যার ছেলেখেলা নয়। রীতিমতো সাত দিন ধরে চলে বিবাহ-উৎসব।

আমি বললুম, সে তো আমাদের বিয়েতেও চলে। পাকাদেখা, গায়ে হলুদ, বিয়ে, বাসি-বিয়ে, ফুলশয্যা, বৌভাত — সেও তো পাঁচ-সাত দিনের মচ্ছোব।

ডাক্তারবাবু বলেন, আপনি যে ফর্দ দিলেন তার মধ্যে ‘বিয়ে’ অনুষ্ঠানটাই প্রধান — আইনের চোখে অবশ্য কুশঙিকা। মুরিয়া বিয়ের পাঁচদিনের অনুষ্ঠানে সবটাই আসল। তফাৎটা কেমন জানেন? আমাদের আনন্দ অনুষ্ঠানটা যেন দুর্গাপূজা। মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স। আর মুরিয়া বিয়ে যেন পাঁচদিনের টেস্ট খেলা। কখন কে সেঞ্চুরি করবে, হ্যাটট্রিক করবে কেউ তা জানে না। সব অনুষ্ঠানেরই তাই সমান গুরুত্ব।

আমি বলি, চয়নের ম্যারেজ-টেস্টের এটা কোন ইনিংস?

—বিশেষ কারণে পাঁচদিনের টেস্ট এবার তিনদিনে খতম হচ্ছে, আজ দ্বিতীয় দিন।

—বিশেষ কারণটা কী?

শুনলাম ব্যাপারটা। আদিবাসীদের মধ্যে একটা চাপা বিস্ফোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে মিটিং হচ্ছে এ-বেলা ও-বেলা। মহারাজের ত্রেপ্তারে ওরা ক্ষেপে গেছে। এমন পরিবেশে দীর্ঘদিন আনন্দ উৎসব চলে না। বস্তুত গাইতার মেয়ের বিয়ে না হলে এ-অনুষ্ঠান স্থগিতই রাখতে হত হয়তো। মুরিয়া সমাজের মাতব্বরেরা বাধাও দিতে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে সংক্ষেপে সারা হবে বিয়ে।

পরশু এসেছে কাবোঙ্গার বরযাত্রী দল। বিকেল নাগাদ। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে গত কালের অনুষ্ঠান-সূচির একটা রিপোর্ট পাওয়া গেল। কাবোঙ্গা ঘটুলের সব কয়জন চেলিক-মোটয়ারী এসেছে সহযাত্রী হয়ে। এসেছে ওর বাপ কোণ্ডা, গাঁয়ের গাইতা গাদরু, চয়নের মা, কাকা, কাকিমা ইত্যাদি।

খানকয়েক ছাপরা তুলে রেখেছে কারাংমেটার লোকেরা। অতিথিদের আশ্রয়। ছাপরাগুলি কিন্তু কারাংমেটা গ্রাম-সীমার বাইরে। কারণটা নিগূঢ়। গাঁয়ের ভিতর ঢুকেই তারা হবে গাঁয়ের অতিথি। তাহলে তখন তাদের থাকতে হবে ঘটুল-ঘরে। সেই আইন বাঁচাবার জন্যে ওরা গ্রাম-সীমার বাইরে ঘাঁটি গেড়েছে। ওরা আহাৰ্য সঙ্গ করেই নিয়ে এসেছে, — ঝুলিতে বেঁধে অথবা পায়ে হাঁটিয়ে। জল আর জ্বালানি যোগান দেওয়ার দায় এ গাঁয়ের।

সন্ধ্যাবেলায় আগুন ছেলে কাবোঙ্গার দল ক্যাম্প-ফায়ার করেছিল। এই নাচ নাকি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ — কারণ অবিবাহিত চেলিক হিসাবে এই তার শেষ নাচ। নাচের নামও — মুরিয়া প্রতিশব্দটা টুকে রাখতে ভুলেছি; অর্থ: ‘শেষ-নাচ’।

নাচ শেষ হল রাত ন’টা নাগাদ। তখন শোনা গেল আয়েতুর বাড়ি থেকে মান্দ্রি ঢোলের ডুগুডুগু ভেসে আসছে। সবাই ছুটলো সেদিক পানে। ডাক্তারবাবুও গিয়েছিলেন ওদের পিছু পিছু। কনের বাড়ির সামনে গিয়ে জমায়েত হয়েছে ছেলে-বুড়োর দল। বুড়োর দল অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না, দু-এক পাত্র লাঙা খেয়ে সরে পড়ল।

এদিক-সেদিক। কারাংমেটার চেলিক-মোটিয়ারীর দল তখন বের করে আনল ঘর থেকে কনেকে। দুলোসা আর জানকি দুজনে ওর দুহাত ধরে নিয়ে এসে বসাল সভার মাঝখানে। এরপর শুরু হল গান। নাচ নয় কিন্তু।

এখানেই তফাৎ। কাবোঙ্গার ওদের ছিল আনন্দ-উৎসব। তার গানের সুরও তাই দ্রুতলয়ে — তার সঙ্গে নাচ না হলে জমে না। কারাংমেটার এই সান্ধ্য আয়োজন কিন্তু বেদনাবিধুর বিদায় অনুষ্ঠান। এখানে গানের সুর তাই বিলম্বিত লয়ে। নাচবার উৎসাহই নেই কারও। মাল্‌কোই গাইল প্রথম গান। তার তিনটি স্তবক ; প্রথম স্তবকটা আয়েতুর উদ্দেশে —

বাবা গো বাবা, তুমি আমার কাছে (এস)
 অজানা ঘরের ঘরগী করে
 (আজ তুমি আমাকে) বিদায় দিচ্ছ।
 হয় বড়াদেও, কেন তুমি (আমাকে বাবার)
 পুত্রসন্তান করনি ?
 (তাহলে আজ) আমাকে এভাবে
 চলে যেতে হত না...
 আমি (বাবার) সংসারকে
 বড় করতে পারতাম...
 (বাবার) ক্ষেতে কাজ করতাম...
 আজ আমি পরের ঘরে (চলে যাচ্ছি) ॥

অন্তরাটা আখালীকে উৎসর্গ করা :

মা গো মা, তুমি আমার কাছে (এস)।
 গতকালকেও আমি (তোমার হাতে হাতে)
 কাজ করেছি,...
 ধান ভেনেছি, ঝাঁট দিয়েছি,
 জল ভরেছি ঘড়ায়...
 তুমি (এতটুকু বেলা থেকে)
 আমাকে খাইয়েছ, পরিয়েছ...
 আজ আমি পরের ঘরে (চলে যাচ্ছি) ॥

শেষ স্তবকে সম্বোধন করা হয়েছে ঘটুল-বান্ধবীদের :

ও দুলোসা, ও তিলোকা,
 ও আলোসা, ও জানকি !
 তোমরা সবাই আমার কাছে (এস)।
 আমি (তোমাদের সঙ্গে) নেচেছি,
 গেয়েছি, হেসেছি, কেঁদেছি...
 এতদিন আমি তোমাদেরই

একজন (ছিলাম)...
তোমাদের ভালবেসেছি
আর গালমন্দ দিয়েছি...
তোমরা ভালবেসেছ
আর গালমন্দ দিয়েছ...
সেই আমি আজ পরের ঘরে
(চলে যাচ্ছি) ॥

এ গান মাল্কো রচনা করেনি। কে রচনা করেছে কেউ জানে না। ছড়ার পদকত্রীকে কেই বা চেনে? কিন্তু আমার কেমন মনে হল, বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় যে মেয়েটি এ-গান প্রথম বেঁধেছিল, সে যেন আমার পরিচিত। এই মেয়েটিই না লিখেছিল সেই বাংলা ছড়াটা?

বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন
খাটের খুরো ধরে,
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন
ভাতারখাকি বলে।

গানের আসর ভেঙেছিল রাতের দ্বিতীয় প্রহরে।

আজ সকালে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তার নাম ‘সামধি ভেট্।’ সামধি অর্থ বেয়াই, ভেট তো সাক্ষাৎ। এ-অনুষ্ঠান দুই বেয়াই — দুই বেয়ানের। এখানে বর-কনে তো নয়ই — তাদের বন্ধু-বান্ধবেরাও আসতে পায় না। বস্তুত এ-অনুষ্ঠানে বুড়ো-বুড়িদের রঙ্গ-রসিকতার একটা সুযোগ দেওয়া হয়। হয় টাকের পাসপোর্ট অথবা পাকা চুলের ভিসা — এর একটা না দেখাতে পারলে সামধি ভেটের আসরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

দুর্ভাগ্য আমার — এ অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি। এককন্যার জনক ডাক্তার পিল্লাইও এখানে ছাড়পত্র পাননি।

এরপর দুপুরবেলা হয়েছে ‘মাণ্ডা-মিছানা’। মাণ্ডা সম্ভবত মণ্ডপের অপভ্রংশ — মিছানা হচ্ছে আহরণ বা সংগ্রহ। বিবাহমণ্ডপ যে কাঠ দিয়ে তৈরি হবে, তার কাঠ সংগ্রহ করাও নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে করতে হবে। অনেকটা আমাদের ‘জল-সইতে’ খাওয়ার মত অহেতুক শুল্লোড়। দু পক্ষের চেলিক দল এক হয়ে যাবে কাঠ কাটতে। যে গাঁয়ে বিয়ে হচ্ছে, সেই গাঁয়ের গাই-তা প্রথমে এক কোপে কাটবে একটা মছ্যা গাছের চারা। তারপর অন্যান্য সকলে চালাবে ঝপাঝপ মাকসু। দু পক্ষের মোটিয়ারীর দল কোন সাহায্য তো করবেই না, উপরন্তু নানাতাবে বাধা দেবে, টিটকারী দেবে, কাপড় ধরে টানবে, পিছন থেকে চেপে ধরবে উদ্যত কুঠার। চেলিকদের চটলে চলবে না। শত বাধা অগ্রাহ্য করে ডালগুলো কেটে নামাবে তারা। এখানেই তাদের কর্তব্য শেষ।

এবার দু পক্ষের মোটিয়ারীর কাজ। সেই কাটা গাছের ডাল তাদের বয়ে আনতে হবে বিবাহ-মণ্ডপে। ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হবে প্রয়োজন মত। আর এবার দু

দলের চেলিকেরা নেবে প্রতিশোধ! তারা সাহায্য তো করবেই না, বরং বাধা দেবে নানানভাবে। কাপড় খুলে দেবার চেষ্টা করবে, ডাল চেপে ধরবে, অথবা টিটকারিভরা গানে ত্রিবত করে তুলবে ওদের। মাতব্বরেরা মাঝে মাঝে শুধু ধমক দিতে থাকবেন, নাও-নাও রঙ্গ-রসিকতা বন্ধ রেখে কাজটা করে ফেল এবার।

বর্ণহিন্দুর বিয়েতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষকে দিতে হয় কন্যাপণ। বরপক্ষকে বড় একটা উবুড়-হস্ত হতে হয় না, উপরন্তু বরযাত্রীর অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায় বোঝার উপর শাকের আঁটি। তাই বিয়ের লৌকিক আচারে দেখি কন্যাপক্ষকে দেওয়া হয়েছে দু'একটি সুযোগ; — 'হাত-বাঁধানি', 'শয্যা-তুলুনি' কিংবা 'বাসরজাগানি'! ভারসাম্য রক্ষার ক্ষীণতম একটা প্রয়াস বলা যেতে পারে সেটাকে। মুরিয়ারা সাম্যের ধ্বজাধারী। চেলিক-মোটিয়ারীর সেখানে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার। চেলিক রা যখন গাছ কাটবে তখন মোটিয়ারীরা যদি তাদের পিছনে লাগবার অধিকার পায়, তবে মোটিয়ারীরা যখন সেগুলি কুড়িয়ে আনবে তখন এরাই বা সে সুযোগ পাবে না কেন? শুধু তাই নয়, ছেলেমেয়েরা যখন রঙ্গরসে নাচবে তখন যদি বুড়োদের সরে থাকতে হয় তাহলে বুড়োবুড়ির সাম্ধি-ভেটেও ছেলে-ছোকরাদের সরে দাঁড়াতে হবে।

অবশ্য কম্পাউন্ডারবাবু বলেছিলেন, এসব আইন মুরিয়া সমাজে সর্বজনীন নয়। তিনি ইতিপূর্বে যে দুটি মুরিয়া বিয়ে দেখেছিলেন সেখানে 'সাম্ধি ভেটে' এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছিল না। 'মাণ্ডা-মিছানাতে'ও কেউ কাউকে বাধা দেয়নি। হতে পারে হয়ত এটা স্থানীয় লোকাচার।

দুর্ভাগ্য আমার। এসব কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি গিয়ে পৌঁছবার আগেই এসব অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেছে। আজ রাত্রে শুনলাম বরের মাথায় মুকুট পরানোর উৎসব হবে। তাই দেখতে গেলুম সবাই মিলে দল বেঁধে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন বিবাহ-মণ্ডপে বেশ লোক জমেছে। চেয়ার কোথায় পাবে? কাটুল পেতে দেওয়া হল আমাদের জন্য। বড় বড় গোটা পাঁচেক মশাল জ্বলছে। মণ্ডপের মাঝখানে একটা মাটির বেদি। তার উপর একটা জ্যামিতিক নক্সা আঁকা। এর নাম 'ঘাড়ি'। গাইতা স্বয়ং এটি আঁকেছে, আর পূজারী মন্ত্রপাঠ করেছে। এটা নাকি মঙ্গলচিহ্ন। মনে হল, এ জাতীয় মাস্তুলিক চিহ্ন হিন্দু পূজাতেও দেখেছি। মাটির দেবীর সামনে মোটা মোটা নয়টা খুঁটির উপর শালকাঠের একটা মাচাও।

বেদীর সামনে একটা মাদুর পাতা। তার উপর বসেছে চয়নের স্বশুর আয়েতু। আর তার কোলে বসে আছে ধেড়ে ছেলে চয়ন। আমাদের দেখে মিটিমিটি হাসছে। ওর গলায় তিন-চার প্রস্থ কড়ির মালা, উপর হাতে বাজুবন্ধ, মণিবন্ধে বালা, কপালে পুঁতির টায়রা। বরপক্ষের তরফ থেকে গাদরু একটা তাঁতের কাপড় আর একছড়া পুঁতির মালা এনে দিল আয়েতুকে। আয়েতু কিন্তু সেটা হাত পেতে নিল না। কী যেন বাক্য বিনিময় হল। হেসে উঠল সবাই।

ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হতে হল। শুনলাম, ওগুলি বরপক্ষের তরফ থেকে কনের

মায়ের মর্যাদা দেওয়া হল। সোজাকথায় শাশুড়ীর ‘নমস্কারী-বেনারসী’! আয়েতু তাই প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, যার ধন তাকেই দাও হে — আমাকে কেন? আমি কি শাড়ি পরি?

অগত্যা ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে হল আখালীকে। হাত পেতে নিল পাত্রীর মায়ের মর্যাদা।

গাদরু এবার একটি কুশের আংটি, কয়েকটি কড়ি আর শিয়ারি পাতায় করে এক ঠোঙা মধুক উৎসর্গ করল আয়েতু গোঙার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে। এটা পূর্বপুরুষদের প্রাপ্য। না হলে খুশি মনে নিজ গোত্রের একটি মেয়েকে ভিন্ন গোত্রে যেতে দেবেন কেন তাঁরা? শুনলাম বিবাহের এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কী যেন একটা গোঙা শব্দ বলল ওরা, যার অর্থ ‘গোত্রান্তর-অনুষ্ঠান’।

এবার আয়েতুর ছুটি হল। আর স্বশুরের কোলে নয়, এবার বরকে বসতে হবে কোন বৌঠানের কোলে। সম্পর্কে বৌদিদি হন এমন একজন প্রৌঢ়া মহিলা এসে বসলেন সেই মাদুরে। পিসি, খুড়ি, মাসীর দল এবার এসে ঘিরে ফেলল বরকে। আমাদের যেমনভাবে শুভদৃষ্টি হয়, অনেকটা তেমনি ভাবে একটা কাপড় দিয়ে আড়াল করা হল, যাতে সভাশুদ্ধ কারও দেখতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়। এবার হবে ‘নয়ী-মৌর’ উৎসব। ডুগু-ডুগু করে বাজল মান্দ্রি ঢোল। কাবোঙ্গার গাইতা গাদরু এবার নিয়ে এল মুকুটটা। ‘নয়ী-মৌর’। বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় ‘তেল-টোপর’ বা তেলমুকুট। হাতে নিয়ে দেখলাম। তালপাতায় বোনা অদ্ভুত জিনিসটা। গোটা তিনেক নয়ী-মৌর আনা হয়েছিল — তার মধ্যে একটা পছন্দ করা হল। যে তৈরি করেছে, তার শিল্পবোধকে তারিফ করতে হয়। প্রায় ফুটখানেক ব্যসবিশিষ্ট এই মুকুটগুলিতে বিজোড়-সংখ্যক পাঁপড়ি থাকা চাই। যেটা পছন্দ করা হল, সেটাতে সাঁইত্রিশটা পাঁপড়ি।

ওদের আইনে বিবাহের সব কিছুই বিজোড় সংখ্যা হতে হবে। নয়ী মৌর-এর পাঁপড়ির সংখ্যা সাঁইত্রিশ, বিবাহ মণ্ডপের খুঁটির সংখ্যা নয়, মুকুটটা চয়নের মাথার উপর দোলানো হল সাতবার। আমাদের ‘পাঁচ-এয়ার’ মতো ওরাও পাঁচজন বিবাহিত মুরিয়া রমণী বরের মাথায় চাঁদোয়া ধরে রইল। বিয়োড় সংখ্যা ‘এক’ যেখানে জোড়-সংখ্যা ‘দুই’ হতে চলেছে সেখানে সবকিছু বিয়োড় করার এ প্রচেষ্টা কেন? হয়তো ওদের আসল লক্ষ্য যোড়-সংখ্যা ‘দুই’-কে অচিরে ‘তিন’ করতে!

তাই হবে। দেখলাম, কন্যাকে সবাই আশীর্বাদ করছে যে বাক্যে তার নিগলিতার্থ — ‘অচিরে সম্ভানবতী হও’!

নয়ী-মৌরটা সাতবার চয়নের মাথার উপর দুলিয়ে গাদরু হঠাৎ বীরবিক্রমে একটা হুঙ্কার দিয়ে চয়নের মাথায় সেটা বসিয়ে দিল। যেন অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছে গাদরু — সমবেত সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। ফিরিঙ্গি পাড়ায় সিনেমা দেখতে গিয়ে কিছু না বুঝেও আমরা যেমন মাঝে মাঝে জনতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে হেসে উঠি ইয়াক্কি রসিকতায় — এক্ষেত্রেও তেমনি আমরা করতালিযোগে অভিনন্দন জানালুম গাদরুকে। তার অভূতপূর্ব সাফল্যে গাদরু এবার চয়নের মাথায় একটা শুকনো লাউয়ের হাতায় করে তেল ঢেলে দিল আর কচি আম পাতায় হলুদ নিয়ে ওর সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিল। এই সুযোগে মোটিয়ারীর দল ‘নয়ী-মৌর’ উৎসবের একটা গান গেয়ে নিল

সমবেত কণ্ঠ—

বারি কাটা ছিন্দ বুটা রতি রতি কান্দে
ওহো.....রতি রতি কান্দে ॥
না কান্দরে ছিন্দ বুটা বাবু মৌর পিন্দে,
ওহো.....বাবু মৌর পিন্দে ॥
বান্ধো তো বান্ধো পুজারি,
ছুটুক মৌর বান্ধে ॥
ওহো.....ছুটুক মৌর বান্ধে ॥

অর্থাৎ, —

বাগান-ভরা তালপাতা কি
কাঁদেছে তামাম্ রাতি ?
ওহো (কেন) কাঁদিস, তামাম্ রাতি ?
কাঁদিস নারে তালের পাতা,
তোকেই আমার নাতি
ওহো (জানি) করবে বিয়ের ছাতি ॥
বাধ্ পুজারী বাঁধরে এবার
ছোট মুকুট বাঁধ,
ওহো (এল) নাতির ঘরে সাথী ॥

নয়ী-মৌর গভাক্কের এখানেই পড়ল যবনিকা ।

এবার দু-তিনজনে ধরাধরি করে নিয়ে এল পাত্ৰীকে । একবস্ত্র কন্যার সাজ যেটুকু, সেটুকু শুধু অলঙ্কারের আতিশয্যে । কানে, গলায়, হাতে, পায়ে । তবে চুলটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে খুব যত্ন করে । আর আশ্চর্য, ওর মাথায় একটাও কাঁকুই নেই ! এত সাজগোজ সত্ত্বেও বস্ত্রের স্বল্পতা হেতু আমাদের চোখে ওকে ঠিক বিয়ের কনে বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু ।

এবার আবার আয়েতুর কোলে বসল চয়ন । আর কোণ্ডার কোলে মাল্‌কো । দুই সাম্‌ধি বসল মুখোমুখি । কারাংমেটার দুলোসা, তিলোকা এসে মাল্‌কোর হাতে আচ্ছা করে তেল মাখালে কনুই পর্যন্ত । তারপর গাদরু একটা কুশের আংটি এনে পরিয়ে দিল চয়নের বাঁ হাতের কনিষ্ঠায় । কী যেন বললে সুর করে । মন্তোচ্চারণ করল বোধ হয় । এবার বরের কর্তব্য হচ্ছে নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে কন্যার বাঁ হাতের অনামিকার সেটা পরিয়ে দেওয়া । আর কন্যার কর্তব্য, কিছুতেই সেটা আঙুলে না পরা । ফলে রীতিমত হাত কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল । বুঝলাম, এই জন্যেই মাল্‌কোকে সখীরা তার হাতে তেল মাখিয়ে দিয়েছে — যাতে হাত ধরলে সেটা পিছলে যায় ! এই হাত কাড়াকাড়ির খেলা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ বরকনে কেউই নিজের স্বশ্রুরের কোল ছেড়ে উঠতে পারবে না কিন্তু ! মোটিয়ারীর দল হাততালি দিয়ে ওদের ঘিরে নাচতে থাকে—

মুদা মুদা ইন্টোনি রে দাদা ।

সোনা পেকো আয়ে রোঁ দাদা ॥

শেষ পর্যন্ত কিন্তু চয়নই জিতল । মাল্‌কোর বাহুমূল ধরে টেনে আনল কোলের কাছে । জোর করে পরিয়ে দিল আংটিটা ওর অনামিকায় । প্রথামতো মোটিয়ারীরা

ধিকার দিল মাল্কোকে — সে নাকি লোক-দেখানি বাধা দিয়েছে — আন্তরিকভাবে বাধা দেয়নি!

কে যেন কী একটা বললে, আর হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই।

—আমি কৌতূহলী হয়ে বলি — কী, কী বললে ও?

পিল্লাই সাহেবের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে, প্রায় কানে কানে বলেন, ও আর আপনাদের শুনে কাজ নেই!

বুঝলাম কিছু একটা রসিকতা করা হয়েছে, যা আমাদের ধারণায় শ্রীলতা-বহির্ভূত।

হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালালো মাল্কো। আর যাওয়ার পথে তার তৈলাক্ত মুঠিতে চয়নের পিঠে কষিয়ে দিলে একটা বিরানী-সিক্কা কিল — দুম করে! চয়নও উঠে পড়ে ছুটল তার পিছনে — কিন্তু নাগাল পেল না বধুর। কারাংমেটার চেলিকরা তাদের প্রিয় মাল্কোকে আড়াল করে ঘিরে দাঁড়াল, তাকে পালাবার রাস্তা করে দিল। এই নাকি নিয়ম। পরদেশী পুরুষের আক্রমণ থেকে ঘটুলের প্রতিটি মোটিয়ারীকে রক্ষা করার কঠিন দায়িত্ব চেলিকদলের! এই শেষবারের মত সে অধিকার প্রয়োগ করল তারা। ওদের সমবেত বাধাদানে হার মানতে হল চয়নকে! কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হল অগত্যা।

এর পর মধ্যাহ্ন-বিরতি।

তাঁবুর দিকে ফেরার পথে বললুম, যাই বলুন মিসেস পিল্লাই ওদের এই আংটি পরানোর খেলা আমাদের কড়ি খেলার চেয়ে ঢের বেশি ইন্টারেস্টিং।

শর্মিলা দেবী সায় দিয়ে বলেন, বটেই তো, আহা এমন কিল মারবার স্যোগ আমরা পাই না!

ডাক্তার পিল্লাই বলেন, প্রকাশ্যে কিল মারতে পার না বলেই বুঝি জনান্তিকে বাকি জীবনটা ধরে সে খেদ মিটিয়ে নাও?

কম্পাউন্ডারবাবুর স্ত্রী শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গি করে হাসি গোপন করেন।

শর্মিলা দেবী ধমক দিয়ে ওঠেন, চুপ কর দিকি!

কিন্তু চুপ করতে দিলে না শবরী। আমার কোল থেকে সে প্রশ্ন করে মাকে, তুমিও বাবাকে কিল মেরেছিলে মা?

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো নাচে-গান হৈ-হল্লার আওয়াজে। কী ব্যাপার? না স্নান করানো হচ্ছে বর-বধূকে। এই সাত সকালে? শুনলুম, — হ্যাঁ, তাই নিয়ম। জুত করে চা-টাও খেতে দিল না দেখছি। গুটি গুটি গিয়ে হাজির হওয়া গেল বিয়ের মণ্ডপে। মোটিয়ারীরা আট-দশ কলসী জল এনে রেখেছে সূর্য ওঠার আগেই। এবার কন্যাপক্ষের মোটিয়ারীরা ধরে নিয়ে এল বরকে — তারপর বরপক্ষের মোটিয়ারীরা ধরে আনবে কনেকে। প্রথমে স্নান করবে বর, পরে কনে। তাতেও মুক্তি নেই — ও বেলা বরকনে নাকি একসঙ্গে আবার স্নান করবে। আর সেই যুক্ত-স্নানই হচ্ছে, যাকে বলে “লাগির” — বা বিবাহের মূল অনুষ্ঠান।

স্নান করাবি তো জল ঢাল — তা নয় বরকে ধরে নিয়ে এসে দল বেঁধে গান ধরল সবাই। আর শুধু কি গান? সেই সাথে নাচ।

বরকেও নাচতে হল ওদের সঙ্গে, মণ্ডপটা ঘুরে ঘুরে! তারপর সবাই মিলে বরকে নিয়ে গিয়ে বসাল একটা জলচৌকিতে। পাঁচজন-মোটিয়ারী কলসী করে ক্রমাগত জল ঢালতে থাকে ওর মাথায়। সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। চয়ন কোন উচ্চবাচ্য করল

না। আর এক হাঙ্গামা। স্নানের পর গা মোছাবার আইন নেই। তাই শূন্য কলসীগুলো সরিয়ে রেখে মোটিয়ারীরা এবার নিয়ে এল ঝুড়ি আর কুলো। সেগুলি দিয়ে ক্রমাগত বাতাস করতে লাগল চয়নকে। ক্রমে যখন গায়ের জল শুকিয়ে গেল তখন চয়ন চট করে উঠে বসল একটা ঝুড়িতে। আট-দশজন মোটিয়ারী ধরাধরি করে চুপড়ি শুদ্ধ বরকে নিয়ে চলল তার ছাপরার দিকে।

ওদিক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল বরপক্ষের মেয়েরা কনেকে নিয়ে। যেন রঙ্গমঞ্চে একদলের প্রস্থান আর অপরদলের প্রবেশ। মাল্কোকে নিয়ে গিয়ে বসান হল সেই জলচৌকিতে। আর কাবোঙ্গার মেয়েরা এবার কলসী করে জল ঢালল ওর মাথায় আশ্ মিটিয়ে। তার সঙ্গে চলল গান :

দুলহি না আঙ ধোইলা চেলিক-সুন্দর পানি ॥

“পানিয়া পানিয়া” বোলিস্ রে নোনা...

আবে পানিয়া পাওয়ালিস্ রে নোনা...

দুলহি না আঙ ধোইলা চেলিক-সুন্দর পানি ॥

অর্থাৎ :

কনেকে আজ স্নান করাব চেলিক-সুন্দর জলে।

“কাঁকুই কাঁকুই” মরতেছিলি খুঁজি ;

কাঁকুই খোঁজা শেষ হল আজ বুঝি !

(তাই) কনেকে আজ স্নান করাব চেলিক-সুন্দর জলে ॥

অনুবাদ শুনে আমি বললুম, তা না হয় বুঝলুম — কিন্তু পানির বিশেষণ ‘চেলিক-সুন্দর’ হল কেমন করে ?

পিল্লাই বলেন, আপনি সাহিত্যিক মানুষ হয়ে এমন বেরসিকের মতো কথাটা বললেন ? Way যদি weary হতে পারে, pillow হতে পারে sleepless তা হলে পানির পক্ষেই বা ‘চেলিক-সুন্দর’ হওয়া অসম্ভব কিসে ?

আমি বললুম, তা বটে। ‘ট্রান্সফার্ড এপিথেট’ !

স্নানের পর ‘তীর-তেল’ উৎসব।

বরকনেকে বসানো হল মণ্ডপে। মাথার উপর যুক্ত-কর রেখে ওরা বসল পাশাপাশি। হাতের ফাঁকে গুঁজে দেওয়া হল একটা তীর। ফলাটা উর্ধ্ব আকাশের দিকে।

মোটিয়ারীরা প্রথমত গান ধরল :

দুলহা কাঁহা গেল রে বেলোসা ?

ওঁহাহি হুহার গেল সে বেলোসা ॥

চয়ন চট করে উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন বললে। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল ওর মাসি-পিসির দল। কী একটা কাণ্ড হয়ে গেল যেন। তারপর চয়ন একটু থতমত খেয়ে চুপচাপ বসে পড়ল। মোটিয়ারীরা অন্য একটা গান ধরল ! মিসেস পিল্লাই কৌতূহলী হয়ে বলেন, ব্যাপারটা কী ?

বুঝিয়ে দিলেন রমানাথন। বিয়ের আসনে বর যখন বসবে তখন তাকে কথা

বলতে নেই। যাবতীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা-তামাসা তাকে নিশ্চুপ সহ্য করতে হবে। কোন উদ্বেজনাতেই তাকে বিচলিত হতে নেই। তাতে নাকি অমঙ্গল হয়।

আমি বলি, কিন্তু ঘড়া ঘড়া ঠাণ্ডা জল সহ্য করে হঠাৎ এখনই বা চয়ন এমন ক্ষেপে গেল কেন?

পিল্লাই হেসে বলেন, মোটিয়ারীরা যে গান গেয়েছে সেটা প্রথামতোই গেয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ‘বেলোসা’ নামে ও ঠাট্টাটা চয়ন হজম করতে পারেনি। গানের অর্থ হচ্ছে “বর কোথায় পালালো রে বেলোসা সে কি তোর বোনকে নিয়ে ভেগে পড়তে চায়?”

যাই হোক, এর পর এগিয়ে এল পূজারী। হলুদ-গোলা জল আর তেল ঢেলে দিল বরকনের মাথার-উপর ধরা তীরের উপর। মাথা বেয়ে গা বেয়ে পড়তে লাগল হলুদ-গোলা তেল।

শর্মিলা দেবী বললেন, রাম রাম রাম। স্নানের পর এই কাণ্ড!

পিল্লাই বললেন, না হলে আর এদের লক্ষ্মীছাড়া বলেছে কেন? তোমার লক্ষ্মীর পাঁচালীতেই তো লেখা আছে লক্ষ্মীছাড়ার সংজ্ঞা — “স্নানের পরেতে করে তৈলের মর্দন!”

আমি বললুম, আপনি কি বাংলাভাষার কোন বই পড়তে বাকি রাখেননি? কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ থেকে মায় লক্ষ্মীর পাঁচালী?

পিল্লাই হেসে বলেন, সবই এই লক্ষ্মীর কৃপায়। শাস্ত্রের অর্থভেদ না করতে পারলেও সহপাঠিনীর মর্মভেদ করতে যেটুকু দরকার—

মিসেস্ পিল্লাই ধমক দিয়ে ওঠেন, আহ! চুপ করুন তো দেখি আপনারা!

দুপুরবেলা আহালাদির পর হবে আসল অনুষ্ঠান। লাগির। যদিও পিল্লাইসাহেব বলেছেন সবকয়টি অনুষ্ঠান সমান গুরুত্বপূর্ণ, তবু এদের ভাবগতিক দেখে মনে হল আসল উৎসব হচ্ছে — ‘লাগির’। অনেকটা আমাদের সিঁদুর-দান উৎসবের মতো।

অর্থাৎ বরকনে বিবাহমণ্ডপে গিয়ে দাঁড়াবে — সামনে-পিছনে। আমাদের বরকনে যেমন দাঁড়ায় কনকাঞ্জলির সময়। গাঁটছড়াও বেঁধে দেওয়া হবে দুজনের বস্ত্রখণ্ডে। এর পর একজন উঠবে মণ্ডপের চালে, আর মন্তোচ্চারণের সাথে সাথে জল ঢালবে চালের উপর থেকে।

দুপুরবেলা আহালাদি সেরে আরাম করছি। ওরা বলেছে লাগির বসবে ‘বাহাৎ-এতায়’, অর্থাৎ পড়ন্ত বেলায়, অপরাহ্নে। ঘটা দুই-তিন গড়িয়ে নেওয়া চলতে পারে। শর্মিলা পাশের তাঁবুতে শবরীকে ঘুম পাড়াচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি। ডাক্তারসাহেব খড়ের গাদার উপর চাদর বিছিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছেন। আমি গাদরুর কাছ থেকে একটা নয়ী-মৌর চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম, বিকালে সেটা তাকে ফেরৎ দিতে হবে। স্কেচ-বইতে সেটার একটা নক্সা আঁকবার ব্যর্থ চেষ্টায় আমি গলদঘর্ম।

ডাক্তারসাহেব বলেন, কী করছেন বলুন তো তখন থেকে ? পাতার পর পাতা কাটাকুটি করে চলেছেন দেখছি।

বললুম, জিওমেট্রিক্যাল ড্রইংএর একটা কঠিন অঙ্ক করছি।

—জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং ? কারাংমেটা গাঁয়ে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চোখের আন্দাজে চৌদ্দ ডিগ্রি চব্বিশ মিনিটের একটা কোণ কেমন করে আঁকা যায় তাই ভাবছি। কিছুই হচ্ছে না, পাতার শ্রাদ্ধ ছাড়া !

—সে আবার কী ? অমন বিদ্যুটে একটা কোণই বা আঁকবার জন্যে মরণপণ করে বসেছেন কেন ?

বললুম, কী করি বলুন। এ বেটা নিরক্ষর নয়ী-মৌর-বানানে-ওয়ালা কোথায় ড্রইং শিখেছিল জানি না — কিন্তু লোকটা তার নক্সায় পঁচিশটা নিখুঁত পাঁপড়ি তুলেছে। 360 ডিগ্রিকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে এক-একটা কোণ হয় চৌদ্দ ডিগ্রি চব্বিশ মিনিট। বিনা প্রোট্রাক্টারে ও হতভাগা তালপাতার প্যাটানটা যদি বানিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে চোখ আন্দাজে আমি তার একটা নক্সা আঁকতে পারব না ? না পারলে এরপর শিবপুর কলেজ রি-ইউনিয়নে ঢুকতে দেবে না যে আমাকে।

হা-হা করে হেসে ওঠেন ডাক্তার-সাহেব। ঠিক সেই সময়েই কারা যেন এল তাঁবুর সামনে।

—কে ? ভিতরে এস — বললেন পিল্লাই মাড়িয়া ভাষায়।

ঘরে এল তিন-চারটি মেয়ে। কারাংমেটার মেয়ের দল। সঙ্গে এসেছে মালকো। তার হাতে একটা মাদুর। নতনেত্রে কী যেন বললে মালকো।

ডাক্তারসাহেব হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ডেকে আনলেন মিসেস পিল্লাইকে। বলেন, তোমার জন্য মালকো এই উপহারটি নিজে হাতে তৈরি করে এনেছে।

শীতলপাটির মত কী একটা বনজ উদ্ভিদ দিয়ে বোনা হাত-চারেক লম্বা দেড়-হাত চওড়া নক্সা-কাটা একটা মাদুর। ওরা বললে মাস্‌নি। শর্মিলা দেবী হাত ধরে মালকোকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। যাবার আগে মালকো আমাদের জোহার করে গেল।

বুঝলাম, এটুকু না করে তৃপ্তি পাচ্ছিল না মালকো। চয়নের আশা ত্যাগ করেছিল বেচারি। ডাক্তারবাবু সেই চয়নকে সুস্থ-সবল করে ফিরিয়ে এনেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে। চয়ন ভাল হয়ে গেছে, আবার কাছে টেনে নিয়েছে মালকোকে, আদর করেছে তাকে। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে মালকোর। আজ সে চয়নের ঘরণী হতে চলেছে। তাই ডাক্তারবাবুকে স্বহস্তে-বোনা এই মাস্‌নিটি দিয়ে সে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

ঘণ্টাখানেক পরে শর্মিলা দেবী ফিরে এলেন ওদের নিয়ে।

—আরে, আরে, এ কে ? মালকোকে যে আর চেনাই যায় না। এতক্ষণে বাঙালি কায়দায় তিনি পাশের তাঁবুতে বসে কনেকে সাজিয়েছেন। মালকোর পরনে একটা সিল্কের ছাপা শাড়ি, গায়ে বুটিদার ব্লাউজ। মুখে শ্বেতচন্দনের অভাবে মো-র ফোঁটা, কপালে কুমকুমের টিপ। আর সবচেয়ে মজা, লজ্জাজড়িত চরণে মালকো এসে

ডাক্তারবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। নিঃসন্দেহে এটা শর্মিলা দেবীর ট্রেনিং। কিন্তু তিনি তো ওদের ভাষা জানেন না। তালিম দিলেন কেমন করে? ডাক্তার পিল্লাই বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছেন মনে হল। আজ এই যে ফুলটি ফুটতে চলেছে এর পিছনে দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রম আছে তাঁর। মুখটা তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে উঠে আশীর্বচন উচ্চারণ করেন উনি। কী বললেন, তা না বুঝলাম আমি, না মাল্কো। উনি আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন মাতৃভাষায়।

আমি বললুম, বরকনের জন্য আমিও একটা উপহার এনেছি, সেটা কখন দেওয়া আইনসম্মত?

—এখনই দিতে পারেন — বলেন ডাক্তারবাবু।

সুটকেস খুলে বার করে দিলাম পাঁচসেলের একটা বড় টর্চ। খুব খুশী হল ওরা। বারে বারে জ্বালিয়ে-নিবিয়ে দেখে নিল।

বিকালে লাগির দেখতে গেলাম যখন তখনও দেখি মাল্কো সেই ছাপা শাড়িখানাই পরে আছে। বাঙালী কায়দায়, অর্থাৎ যাকে মেয়েরা বলে ‘ড্রেস করে’। পোশাকটা পছন্দ হয়েছে সকলের এটা বোঝা যায়। এরা বোঙো-শবর বা মাড়িয়াদের মতো নয়। ব্লাউজ না পরলেও মেয়েরা বুকে শাড়ির আঁচলটা দেয়। যদিও বেশ বোঝা যায় সেটা বেশিদিনের অভ্যাস নয়! কাপড় সরে গেলে বা পড়ে গেলেও সান পায় না সহজে।

আমরা নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলুম। অনুষ্ঠান শুরু হবে এমন সময় জঙ্গলের দিক থেকে ভেসে এল ঢোলের আওয়াজ। সবাই যেন শিউরে উঠল সে শব্দ শুনে। গাদরু দুপা এগিয়ে গেল মণ্ডপ ছেড়ে। তারপর কান পেতে শুনতে থাকে। সমস্ত বিবাহমণ্ডপ স্তব্ধ, উৎকর্ণ। কারা ঢোল বাজাচ্ছে তা ওরা জানে না, তবে সঙ্কেতটা বিপদের।

একটু পরেই জঙ্গল থেকে বার হয়ে এল ওরা। জনা তিন-চার মাতব্বর শ্রেণীর লোক। পা টলছে সকলের। মদ্যপান করেছে মাত্রাতিরিক্ত। গাদরু-আয়েতুর দল বেরিয়ে এল সভামণ্ডপ ছেড়ে।

ওদের মধ্যে একজন লোকের হাতে ত্রিশূল জাতীয় একটা বশা। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সেই দলপতি। ডাক্তারবাবু কানে কানে বলেন, এই লোকটাই হচ্ছে কাবোঙ্গার গুণিয়া, যে বলেছিল চয়ন আর কোনদিন ভাল হবে না।

লোকটা মাজায় হাত দিয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াল এবার। সকলের উপর ঘোলাটে-লাল চোখ দুটো বুলিয়ে নিল — মাল্কোর বেশবাস দেখে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। তারপর বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে কী যেন বলতে থাকে অনর্গল!

ভাষা না বুঝলেও তার বক্তব্যের মধ্যে ব্যঙ্গ, শ্লেষ আর উত্তেজনামূলক শব্দ যে যথেষ্ট ছিল সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না। বারে বারে আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলছে সে। কিছুই বুঝতে পারছি না। তবু ভাবগতিক যে সুবিধার নয় এটুকু বোঝা যায়।

শর্মিলা দেবী উঠে দাঁড়ালেন আখালীর দাওয়ায়। গুণিয়া উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে

এল আমাদের দিকে। ডাক্তার পিল্লাইও উঠে দাঁড়ালেন। গাদরু বোধহয় বাধা দেবার জন্যই এগিয়ে আসছিল, তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আসরের মাঝখানে মহড়া নিয়ে দাঁড়াল চয়ন। দুহাত বাড়িয়ে আমাদের আড়াল করে দাঁড়াল বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে আসা বর।

চয়ন নিরস্ত্র। গুণিয়ার হাতে দীর্ঘাকৃতি ত্রিশূল। চয়নের পাঁজরা ঘেঁষে অবশ্য তৎক্ষণাৎ এসে দাঁড়াল সশস্ত্র চেলিকদল — দলপতির নির্দেশের অপেক্ষায়।

চয়নকে উঠে আসতে দেখে গুণিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে মাটিতে থুথু ফেলল। মুখটা বাঁহাতের উল্টো পিঠে মুছে নিয়ে কয়েকটা কথা বলল চিবিয়ে চিবিয়ে। আর তারপরেই খল্খল করে হেসে উঠল আচমকা।

মুহূর্ত মধ্যে ক্ষেপে গেল চয়ন। গর্জন করে কী যেন বলল মাতালটাকে। গুণিয়াও প্রত্যুত্তরে গর্জন করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত করল হাতের ত্রিশূল। শিউরে উঠলুম আমরা সবাই; কিন্তু ক্ষিপ্ত শাদুলের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চয়ন গুণিয়ার উপর। একটা ধস্তাধস্তি। খণ্ড-মুহূর্তের বিহুলতা। জনতা সম্বিত ফিরে পেয়ে বাধা দিতে আসার আগেই চয়ন কেড়ে নিয়েছে গুণিয়ার ত্রিশূলটা। আর বাঁ হাতে টিপে ধরেছে ওর গলা। ডাক্তারবাবু মাড়িয়া ভাষায় চিৎকার করে কী যেন আদেশ করলেন। মন্ত্রের মতো কাজ হল তাতে। চয়ন ওকে ছেড়ে দিল। ফিরে এল, মাথা নিচু করে গিয়ে বসল ফের বিবাহমণ্ডপে।

মাতালগুলো আর কিছু করতে সাহস করল না। গাদরু, আয়েতু আর কোণ্ডা অনেক অনুরোধ করল ওদের ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। কিন্তু না, গুণিয়া ওদের মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করে ফিরে গেল জঙ্গলের দিকে। যাবার আগে শাসিয়ে গেল যেন।

এবার বসল পরামর্শ সভা। সবাই গালমন্দ করল চয়নকে। সে কিন্তু আর একটা কথাও বলল না। দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল চুপচাপ। বুড়ি কিরিংগো কী যেন একটা ফোড়ন কাটল, আর গাদরু ঘাড় নেড়ে বলল, হয়!

ডাক্তারবাবু বললেন, চলুন, তাঁবুতে ফেরা যাক এবার। আজ আর ‘লাগির’ হবে না। অমঙ্গলের সূচনা হয়েছে। চয়ন নিয়ম ভেঙেছে। আজকের রাতটা তাকে উপবাসী থাকতে হবে। কাল সকালে প্রায়শ্চিত্ত হবে — বিকালে লাগির।

চোখের উপর ঘটল ঘটনাটা। অথচ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যেন ‘ডাব’ করা হয়নি — এমন একটা কন্টিনেন্টাল ছবির ‘রাশ-প্রিন্ট’ দেখছিলুম এতক্ষণ। তাঁবুতে ফিরে এসে সবিস্তারে তার ব্যাখ্যা শুনলুম।

গুণিয়া আসছে দন্তেওয়ারা থেকে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এনেছে সে। প্রবীরচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে সরকার তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা বিজয়চন্দ্র ভণ্ডদেওকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তারের মহারাজা বলে ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেস সরকারের সে নির্দেশ মেনে নিতে রাজি হল না আদিবাসী প্রধানেরা। প্রাক্তন মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবীরচন্দ্র যতদিন জীবিত আছেন ততদিন মাতা দন্তেশ্বরীর নির্দেশে তিনিই বাস্তারের রাজা। ‘ডিভাইন রাইট অফ কিংস’ নাকি তুচ্ছ কংগ্রেসি সরকারের ফতোয়ায় নাকচ করা যায় না।

বিজয়চন্দ্র সিংহাসনে বসলেন, কিন্তু প্রজাসাধারণের সমর্থন পেলেন না। গত

সপ্তাহে জেলা কর্তৃপক্ষ নতুন রাজাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দন্তেশ্বরী মাতার মন্দিরে। সাড়ম্বরে নতুন রাজা মায়ের পূজা দেবেন। অভিষেকের পরে এটাই চিরাচরিত প্রথা। দন্তেশ্বরী মায়ের পুরোহিতেরা সে পূজা প্রত্যাখ্যান করে বসল। বিজয়চন্দ্রকে তারা নতুন মহারাজ বলে মেনে নিতে রাজী নয়।

দেখা দিল সেই শাস্ত্রত সংগ্রাম, সেই দ্বৈরথ দ্বন্দ্ব ! গোবিন্দমাণিক্য বনাম রঘুপতি, ইংলভেশ্বর বনাম টমাস বেকেট !

কিন্তু যুগ পালটেছে। রাজায় রাজায় লড়াই হলে আজকাল উলুখাগড়াই শুধু মরে ; মা আর রাজরক্ত চান না ! বেকেটরাও মরে না। মরে সাধারণ মানুষ। তাই রক্তারক্তিটা মূলতুবি থাকল।

এ পক্ষ নানাভাবে বোঝালেন। রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দাখিল করলেন। ভারত সরকারের সঙ্গে রাজন্যবর্গের সম্পর্কটা বোঝাতে চাইলেন। ওরা বললে, একটি মাত্র শর্তে নতুন রাজাকে মেনে নিতে রাজি আছি। তোমরা আমাদের সাবেক রাজা প্রবীরচন্দ্রকে ছেড়ে দাও। তিনি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলুন — তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, তাঁর ভাইকে শাসনদণ্ড দিয়েছেন, তবেই রাজার ছোটভাইকে রাজা বলে মেনে নেব আমরা।

সে শর্ত এ পক্ষের থেকে পালন করা সম্ভব হয়নি। উত্তেজনা বাড়ছে। আদিবাসী দলনেতাদের কাছে গোপন নির্দেশ আসতে শুরু করেছে — গোপনে প্রস্তুত হও সবাই ! বিদ্রোহ অনিবার্য। জোর করে মহারাজকে বন্দীশালা থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে !

গুণিয়া বলতে এসেছিল — এ সময়ে দেশের আহ্বান উপেক্ষা করে আদিবাসী সমাজের সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে যারা বিয়ের আসরে নাচগান নিয়ে মাতে, তাদের দিক, শত দিক। আমরা কংগ্রেসি সরকারের লোক বলে সে আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়ে দেবার শুভকামনা নিয়ে এগিয়ে আসছিল। চয়ন ছুটে এসে বাধা দেওয়ায় শ্লেষের সঙ্গে বলে, পুরুষমানুষের ঝগড়ায় তুই মেয়েমানুষ কেন আসছিস্ আগ্ বাড়িয়ে ?

চয়ন বিস্মিত হয়ে বলেছিল, মেয়েমানুষ মানে ?

নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, মুখটা মুছে নিয়ে গুণিয়া বলেছিল, তোর ঐ মিথ্যাবাদী ডাক্তারসাহেব যতই মিথ্যা স্তোক দিক, আর মাল্কো যতই গোপন করুক, এ চাক্লার সবাই জানে রঙিলা তাকে এক ধুরবানে মেয়েমানুষ করে রেখে গেছে। — বলেই তার খল্খল হাসি !

সে হাসি সহ্য করতে পারেনি চয়ন। অসহ্য অপমানে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল গুণিয়ার উপর।

আনন্দ উৎসবের মাঝখানে হঠাৎ এ ঘটনায় সকলেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত বুড়ি কিরিংগোর বিধানই বহাল রইল। আজ রাত্রে উপবাস করতে হবে চয়নকে। কাল সকালে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

চয়ন নাকি প্রথমটায় আপত্তি জানিয়েছিল প্রায়শ্চিত্তের এ ব্যবস্থায়। কিন্তু সকলের মিলিত শক্তির কাছে তাকে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। রাজি হয়েছে প্রায়শ্চিত্তের

অবমাননা মেনে নিতে। কিন্তু বেশ বোঝা যায় সেটা খুশী মনে মেনে নেয়নি। গুণিয়ার কথাগুলোতে সে রীতিমতো বিচলিত হয়েছে। দেশের রাজাকে যখন গায়ের জোরে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল তখন যারা উৎসবের আয়োজন করে, তাদের দিক, শত দিক! চয়ন একটা ঘটনের শিরদার হয়ে এ উপেক্ষা, এ অবমাননা যেন মেনে নিতে পারছিল না। গুম মেরে বসে রইল সে নিজের ছাপরায় — যেমন ভাবে এতদিন সে বসে থাকত তার ঘরে। চিন্তিত হল কোণ্ডা, শিউরে উঠল মাল্কো বান্ধবীদের মুখে এ খবর শুনে।

মুখ শুকিয়ে ওঠার আরও একটা কারণ ছিল। খবর পাওয়া গেছে গুণিয়া তার দলবল নিয়ে ফিরে যায়নি। ঝোপের ওপাশে তারা ঘাঁটি গেড়েছে। কোণ্ডা আয়েতুর দল গিয়ে আবার তাদের কাছে ক্ষমা চাইল — বিয়েতে যোগদানের জন্য অনুরোধ করল, কিন্তু ওরা অপমান করে তাড়িয়ে দিল এদের।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। এমন একটা কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউই আশঙ্কা করেনি। সন্ধ্যার পর আজ আর নাচগান কিছুই হল না। রণক্লান্ত শিবিরের শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতা নেমে এসেছে উৎসবমুখর কারাংমেটা গাঁয়ের বুকে। রাত্রে শোবার সময় বললুম, লাগির দেখা আমার বরাতে নেই। কাল সকালেই ফিরতে হবে আমাকে।

—আর একটা দিন থেকে যেতে পারেন না? —বলেন শর্মিলা দেবী।

—উপায় নেই। মার্চের আজ পঁচিশ তারিখ।

পরদিন সকালেই ফিরতে হল বটে, কিন্তু যতটা বিষণ্ণমনে ফিরতে হবে আশঙ্কা করেছিলুম তার চেয়ে সহস্রগুণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে হল।

ভোরবেলাতেই খবর পাওয়া গেছে — চয়ন গোপনে গৃহত্যাগ করেছে কাল গভীর রাত্রে। গুণিয়ার দল যেখানে থানা গেড়েছিল সেখানেও জনমানব নেই। আদিবাসীদের সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে চয়নের যোগাযোগ ছিলই। কালরাত্রে সেখান থেকে কী এক গোপন নির্দেশ এসেছে। এনেছিল গুণিয়াই, মধ্যরাত্রে সে এসেছিল নাকি চয়নের ছাপরায়। আজ সকালে এই কাণ্ড!

ফিরে চললাম মার্চ-ফাইনাল বিল পাশ করতে। মাল্কোর বুকফাটা কান্নাটা কানে বাজছে! মাড়িয়া ভাষায় কী যেন বলছে আতঁকঠে! ভাষাটা বোঝা যায় না — কিন্তু কান্নার কি কোন ভাষা আছে? প্রিয়জন-বিরহের যে আর্তি তার বহিঃপ্রকাশেরও দেশ-কাল-নিরপেক্ষ একটা ব্যঞ্জনা আছে। ‘বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী’র এ আতঁরোদন তো দণ্ডকারণ্যের ট্র্যাডিশন! সত্যযুগে মধুমন্ত নগরাধিপতির অতর্কিত অন্তর্ধানে ভার্গবতনয়াও একদিন এ অরণ্যে অমনি বুকফাটা কান্না কেঁদেছিলেন — কেঁদেছিল চক্রবাক এই তমসাতীরেই শরাহত সঙ্গিনীর বিরহে! আজ মাল্কোও কাঁদছে! নয়ী-মৌর লুটাচ্ছে পথে, সিন্ধের ছাপা শাড়িতে লেগেছে ধুলো, মাটিতে উপুড় হয়ে কাঁদছে মাল্কো।

॥ কুড়ি ॥

অরণ্যবাসের মেয়াদ শেষ হয়ে এল। স্বেচ্ছায় এসেছিলাম ডেপুটেশনে—অরণ্যকে দেখব বলে। শহুরে মানুষের চোখে অরণ্য যে অপার বিস্ময়! যাবার দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই মনে হচ্ছে, হল না, দেখা হল না! হে অরণ্যদণ্ডক, দোষ তোমার নয়, অপরাধ আমার। আমিই চোখ তুলে তাকাতে ভুলেছি! তোমার গম্ভীর উদাত্তরূপ স্তরে স্তরে মেলে ধরেছ আমার চোখের সম্মুখে—আমি খেয়াল করিনি! অরণ্যকে দেখতে গিয়ে আমি শুধু দেখে এলুম অরণ্যচারীদের!

মনে পড়ছে বিভূতিবাবুর রচনা — ‘আজ এখান থেকে...বিদায় নিলুম, হে সুপ্রাচীন অরণ্য, তোমায় প্রণাম করি। শতবিস্ময়ের সৌন্দর্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার বছর ধরে লুকানো ছিল, কেউ আসেনি দেখতে—এতদিন দেখে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। আজ ষোলো দিন ধরে বনপুষ্প সুবাস উপভোগ করেছি তোমার বনে বনে, তোমার বনবিহঙ্গের কলগীতি শুনে কান জুড়িয়েছি...তোমাকে প্রণাম করি।’

ষোল দিন নয়, দীর্ঘ দু’বছরের মধ্যেও তো এমন দৃষ্টি নিয়ে অরণ্যদণ্ডককে দেখিনি? প্রণাম জানাইনি অরণ্যের অধিদেবতাকে! রঙিন প্রজাপতি, শিমুলের রাঙা ফুল, ধনেশপাখির ডাক, জলপ্রপাতের জলপতনধ্বনি আর লেজ-ঝোলা হলদে পাখির উপহার পাঠিয়ে এ অরণ্য তো আমারও হৃদয় জয় করতে চেয়েছিল বারে বারে। উদাসীন আমি ক্রম্বেপ করিনি। স্তব্ধ গম্ভীর উদাসীন অরণ্যের স্বরূপে বিরাটত্বের যে ব্যঞ্জনা, ভূমার যে প্রকাশ — তা আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করিনি। অন্যমনস্ক ক্ষ্যাপার মতো পরশ-পাথর মুঠির মধ্যে পেয়েও ছুঁড়ে ফেলেছি দূরে! একসার অর্ধউলঙ্গ নরনারী আমার দৃষ্টির সামনে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল এতদিন। তাদের দেখেছি — অরণ্যদেবীকে নয়!

কালরাত্রে পড়ছিলুম বিভূতিবাবুর ডায়েরি। লিখছেন— ‘রাঙা ফুলে ভর্তি বড় শিমুলগাছটা চোখে পড়ল। আমি সৌন্দর্যে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লুম। আর নড়তে পারিনে। অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারিনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হল — সে অনুভূতি এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, তার কথা আমি কাল সারাদিন ভুলিনি। এবং সে কথা এখানে লিখেও রাখলুম এ জন্য যে, এই সব দুর্লভ অনুভূতিরাজি যখন অস্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন এই কটি লাইন পড়লে কালকার অনুভূতির বাণী আমার মনে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।’

তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে খুলে বসলুম দণ্ডক-শবরীর ডায়েরি। পাতার পর পাতা লিখে গেছি — কিন্তু কই, এমন একটিও অনুভূতির কথা তো আমি রাখিনি ভবিষ্যতের পুঁজি করে? কেশকল ঘাটের ধ্যানস্তিমিত পাহাড়ের পাদমূলে বসে থাকা সেই আশ্চর্য গোধূলি, চিত্রকোট জলপ্রপাতের পদপ্রান্তে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত জলকণার প্রতिसরণে সপ্তবর্ণা অবাক-আকাশ, কোংরি নদীতে হঠাৎ আসা বানে আটক পড়া পারলকোটের পর্ণকুটিরে সেই বর্ষণমুখর বিনিদ্ধ রাত্রি — কই সেসব কথা তো লেখা হয়নি! তবে কি যাবার দিনে বিভূতিবাবুর সুরে সুর মিলিয়ে আমার বলার অধিকার

থাকবে না — ‘প্রণাম, হে খেয়ালী অরণ্য দেবতা, প্রণাম!’

তবু খেদ নেই। সে অধিকার না অর্জন করে থাকি নাই করলেম। আমি দেখে গেলেম অবাক আরণ্যক জীবনকে। মানবসভ্যতার গন্ধোত্তীকে!—পাহাড়ের কোলে কোলে অখ্যাত অজ্ঞাত গাঁয়ের সরল বাসিন্দাদের। এ ‘ইয়ারো’ই কি কম সুন্দর? এও তো হাজার বছর ধরে অনাদৃত পড়েছিল, আমার চোখ তুলে দেখবার অপেক্ষায়! যাবার দিনে না হয় আমি বলে যাব:

প্রণাম হে অরণ্যজীবন, প্রণাম!

তারিখটা আজও মনে আছে, 1961 একত্রিশে মার্চ। শুক্রবার।

মার্চ-ফাইনালের হিড়িকেকোরাপুটথেকে ছুটে এসেছি জগদলপুরে। চীফ এ্যাকাউন্টস অফিসারের দপ্তরে শেষরাত্রে ওস্তাদের মার মারতে। সমস্ত দিন উবুড় হয়ে পড়েছিলাম বিল-এম.বি-সুপে। ফিনানশিয়াল ইয়ারের শেষ দিন। কাজ-কর্ম মিটতে রাত আটটা! শ্রান্ত দেহে অফিস থেকে বেরিয়ে জীপে গিয়ে বসলাম। ড্রাইভার পাঁড়েজিকে বলি, ধরমপুরা কলোনীতে চল। সার্কিট-হাউসে আজ রাতে থাকব।

অফিস থেকে ধরমপুরা যেতে পথে পড়ে গুপ্তেজীর বাসা। একটা কালো বোর্ডে লেখা ‘টু লেট’। আমার মনে হল ‘টু-লেইট’। কয়েকটা দিন আগে এলে দেখা পেতুম সেই আদিবাসীদের অকৃত্রিম বন্ধুটির।

স্বল্পভাষী পাঁড়েজী সিনেমা-হাউসের কাছে মোড়-ঘুরবার সময় বললে, লেकिन হ্যা ক্যা?

তাইতো। ব্যাপার কী? এতক্ষণ নিজের চিন্তায় ডুবেছিলাম বলে খেয়াল করিনি। শহরটা যেন থম্ থম্ করছে। সিনেমার শো বন্ধ। দোকানপাট খোলা নেই একটাও। পথে লোক চলাচলও অতি ক্ষীণ; শুধু এখানে-ওখানে গলির মোড়ে-মোড়ে জটলা। অত্যন্ত জোরে একটা ওয়েপন-কেরিয়ার ওভার-টেক করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। ব্যাপার কী? খবরের কাগজও দেখিনি দিনতিনেক। রেডিও শোনাও হয়নি। পথে পথে কেটেছে কদিন। ডুবে ছিলাম বিলের সমুদ্রে। জেলখানার উপর, হ্যাঁ স্পষ্ট মনে পড়ছে, জাতীয় পতাকাটাকে উড়তে দেখেছি পতাকাদণ্ডের শীর্ষদেশেই। তাহলে শহর এমন শোকাচ্ছন্ন, স্তব্ধ কেন?

সার্কিট-হাউসে পৌঁছে পেলাম খবরটা।

লোহাঙিগুডায় গুলি চলেছে। হতাহত নাকি অসংখ্য!

অসংখ্য? মানে?

কেউ বলে পঞ্চাশ, কেউ বলে শ’য়ের উপর! সার্কিট-হাউসের পাশেই একজন উচু মহলের অফিসারের ডেরা। হানা দিলাম সেই রাত দশটায়। বোসসাহেব জেগেই ছিলেন। বসালেন আপ্যায়ন করে। হ্যাঁ, খবর ঠিকই। গুলি চলেছে। হতাহতের নির্ভুল সংখ্যা জানা যায়নি। তবে হ্যাঁ, কিছু লোক মারা গেছে বটে।

বললাম, আমি তো কিছু জানি না। কী হল এর মধ্যে?

শুনলাম বিস্তারিত সব ঘটনা। উড়িষ্যার কোরাপুটবাসী আমার এত কথা জানা ছিল না।

বিজয়চন্দ্রকে দত্তেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিতে না দেওয়ার পর থেকেই বাস্তারের গাঞ্জনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। উত্তেজনা বাড়তে থাকে। আদিবাসী দলপতিদের কাছে গোপন নির্দেশ আসে — জোর করে ছিনিয়ে আনতে হবে কারাকান্দ মহারাজ পবীরচন্দ্রকে। এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওরা প্রস্তুত হচ্ছিল কদিন ধরে। গতকাল হাট ছিল করঞ্জিবাজারে। ওরা দলে দলে সমবেত হয়েছিল সেই হাটে। তাঁর ধনুক, বশা, মাকসু হাতে নিয়ে মাদ্রি ঢোলে যুদ্ধের দামামা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এসেছিল সশস্ত্র জনতা। সামনের কয়েকজনের হাতে দেবনাগরি হরফে হাল্‌বিতে লেখা ফেস্টুন : ‘রাজাকে ফিরিয়ে দাও।’

সে ফেস্টুন দেখে বুঝতে পারা যায় এ আন্দোলনের পরিচালনা আদিবাসী দলপতির কাছে না, করছে আর কেউ। দেবনাগরি হরফ তো দূরের কথা, ফেস্টুন কাকে বলে তাই ওরা জানে না। সরকারী মহলে খবর পৌঁছেছিল ঠিক সময়েই। পুলিশ ফাঁড়িতে প্রস্তুতির অভাব ছিল না। পুলিশের বড়কর্তাও হাজির হলেন অকুস্থলে। নতুন মহারাজা বিজয়চন্দ্রকেও নিয়ে যাওয়া হল। বিরাট জনতা এগিয়ে আসতে থাকে পুলিশ ফাঁড়ি লক্ষ্য করে। তাদের কণ্ঠে একটিমাত্র ধ্বনি — ‘আমাদের রাজাকে মুক্তি দাও!’

অনেক কষ্টে গতকাল সে আন্দোলনকে রোখা গেছে। পরদিন, অর্থাৎ আজ, হাটবার গেছে লোহাঙিগুডায়। নগণ্য গ্রাম। এখানেই এককালে ছিল সমৃদ্ধশালী চক্ৰকোট তালুক আর কুরুশপাল। স্থানীয় লোকেরা কিছু খবর জানত না। অথচ রাত শেষ হবার আগেই দেখা গেল সেখানে দলে দলে জমায়েত হচ্ছে নানান জাতের আদিবাসী জনতা। রাতে কারা যেন এসে জনতাকে কানে কানে বলে গেছে, দূর বোকা! কাল করঞ্জিবাজারে তোরা অমন ভেড়ুয়ার মতো হটে এলি কেন?

এরা বলেছিল, সাহেব যে বললে, নাহলে গুলি ছুঁড়বে?

আগন্তুক শুভার্থী বলেছিল, দূর হাঁদারাম! ওরা গুলি ছুঁড়বে না। ছুঁড়লেও ফাঁকা আওয়াজ করবে, ভয় নেই।

এদের সরল প্রশ্ন, ফাঁকা আওয়াজ মানে?

আদিবাসী-দরদী মর্মান্বিত হয়ে বলেন, কী গাধা তোরা! ফাঁকা আওয়াজ মানে বুঝিস্ না? মানে, ধোঁয়া বের হবে, শব্দ হবে, গুলি বার হবে না। কারও গায়ে তা লাগে না। ও শুধু ভয় দেখাবার জন্যে ছোঁড়া হয়। বোকারা ধোঁয়া দেখেই ধোঁকা খায়। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে শুনিসনি? এখন সত্যিকারের গুলি ছোঁড়া যে আইনে মানা!

একজন বলেছিল, দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে মানে? এতদিনই তো দেশ স্বাধীন ছিল। এখন পরদেশীরা এসে আমাদের রাজাকে বন্দী করে রেখেছে — এই কথাই তো সেদিন বললি!

আগন্তুক হতাশ হয়ে বলে, তোদের নিয়ে আন্দোলন করা ঝকঝকি কাজ বাবা।

আদিবাসীদের বৃদ্ধ দলপতি বলেছিল, ওসব বাজে কথা বাদ দে। সোজা কথাটা হচ্ছে ওরা গুলি করবে না। এই তো? গুলি করলেও তাতে মানুষ মরবে না। ফাঁকা আওয়াজের ধোঁয়ায় আর শব্দে এক-আধটু চোট লাগতে পারে, কিন্তু তাতে মানুষ

মরে না — এই কথাই তো বলতে চাইছিঁস ?

একজন আদিবাসী তরুণ এগিয়ে এসে বলেছিল, মরুক ! আমাদের হাতেও তীর আছে ! এক এক তীর, এক এক মানুষ ! বল, কী করতে হবে ।

— এইতো ! মরদের মত কথা বলেছিঁস ! — ঘনিয়ে আসে আদিবাসী-দরদী ! তোদের ভয়টা কী ! তোদের তীর তো আর ফাঁকা আওয়াজ করবে না । একটি একটি তীর খসবে, একটি একটি পুলিশ খসবে । নয় কি ?

সদারেরা হি-হি করে হেসে উঠেছিল শুনে, তা আর নয় ? একটি-একটি তীর, এক-একটি মানুষ ! হুঁ হুঁ বাবা, আমরা ফাঁকা আওয়াজ করি না !

পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, কিন্তু রক্তাক্ত !

পরদিন ভোরেই ওরা জমায়েত হল তীর-ধনুক হাতে ! শেষরাত্রে সেই যে ভদ্রলোক হাঁড়ি হাঁড়ি শূলপি সরবরাহ করেছিল, সে বললে—নরসিংগড়ে নয়, ঐ পুলিশ ফাঁড়ির ভিতরেই আটক আছে তোদের রাজা । যা, এগিয়ে যা, কিছুতেই পিছন ফিরবি না । তাহলে দন্তেশ্বরী মায়ের অভিশাপ পড়বে তোদের উপর । যেমন করে হ'ক ছিনিয়ে আনতে হবে তোদের রাজাকে ।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে এরা বলে : হয়, হয় !

সশস্ত্র জনতা এগিয়ে আসছে !

সাবধানবাণী উচ্চারিত হল—হালবিতে, গোণ্ডিতে, মাড়িয়াভাষায় ।

—আর এগিও না ! ফিরে যাও !

ওরা চীৎকার করে ওঠে, রাজাকে ফিরিয়ে দে ।

—আর এক পা এগিয়ে এলেই আমরা গুলি ছুঁড়ব !

এদের সদার হা-হা করে হেসে ওঠে, ছোঁড় না কত ফাঁকা আওয়াজ ছুঁড়বি । আমরাও তীর ছুঁড়ব । এক একটি তীর এক একটি মানুষ ! — বাবা, আমরা ফাঁকা আওয়াজ ছুঁড়ি না ।

এগিয়ে আসে ধনুক-হাতে সহস্র জোয়ান ।

হঠাৎ গর্জে উঠল 'পুস-গুডাম', বজ্র ! গুম্-গুম্-গুম্ !

কিন্তু এ কী ! এমন তো হওয়ার কথা নয় ! একসার আদিবাসী ভাইরা মাটিতে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে কেন ? এ তো ফাঁকা আওয়াজ নয় ! সেই বাবুটি কোথায় গেল—যে হাঁড়ি-হাঁড়ি মদ জুগিয়েছিল কাল রাতে ?

ও কী?...পথের ধূলায় এত লাল রঙ কেন?...একি রক্ত ? ফাঁকা আওয়াজেই এত রক্ত ? ভানপুরীর সেয়াই, বেণুরের লাখমুভাই, লোহাণ্ডিগুডার গাইতা অমন নিথর হয়ে পড়ে রইল কেন পথের ধূলায় মুখ গুঁজরে ? না, না ! এমন তো হবার কথা ছিল না ! কোথায় কী যেন ভুল হয়েছে ।

আদিবাসী নেতারা ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকায় ! কী করবে বুঝে উঠতে পারে না ।

ঐ তো কাবোঙ্গার গুণিয়া ! বাঁ হাতে তলপেট চেপে ধরে বসে পড়েছে পথের ধূলায় । গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে মুঠি বেয়ে ! সদার ঝুঁকে পড়ে বললে,

কী হয়েছে গুনিয়া ভাই ?

যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে কাবোদ্ধার গুনিয়া শুধু বললে, ফাঁকা আওয়াজ নয়। সদর ! ওরা সত্যিকারের গুলি ছুঁড়ছে ! পালাও !

উর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটতে শুরু করেছে পঞ্চাশ গাঁয়ের আদিবাসী জনতা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেশা ছুটে গেছে ওদের। প্রাণধর্মের তাগিদে কাজ। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল তারা বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে।

শুধু রক্তাপ্লুত কতকগুলো হতভাগ্যের মৃতদেহ পড়ে রইল পথের ধুলোয়।

ফিরে এলাম, সার্কিট-হাউসে। রাত তখন এগারোটা।

দেখি সার্কিট-হাউসের সামনে একটা মেডিক্যাল ভ্যান। এখনি এসেছে। ভিতরে ঢুকেই দেখলাম সামনে হল-কামরাটায় বসে আছেন ডাক্তার আর মিসেস পিল্লাই। ডাক্তারসাহেবের চোখে বাসা-ভাঙা ঝড়ের পাখির অবোধ দৃষ্টি।

—কী হয়েছে ?—ছুটে গেলাম ওঁর কাছে।

—বারোজন মারা গেছে। —বললেন উনি গাড়িস্বরে।

—বারোজন ? কিন্তু আপনি এখানে এতরাত্রে ?

—খবর পেয়ে এইমাত্র এসে পৌঁছলাম।

—থাকছেন তো এখানেই আজ রাত্রে ?

—ঠিক বলতে পারি না। কম্পাউন্ডারবাবুকে পাঠিয়েছি হাসপাতালে। সে ফিরে এলে বুঝতে পারব, বাকি রাতটুকু এখানেই থাকব, না লোহাণ্ডিগুডায় যেতে হবে।

—লোহাণ্ডিগুডায় ! — এতরাত্রে ?

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন না। বাইরে কিসের শব্দ হওয়ায় উঠে দেখতে গেলেন কম্পাউন্ডারবাবু ফিরে এসেছেন কি না।

শর্মিলাদেবীকে বলি, কী হয়েছে বলুন তো ঠিক করে ?

—চয়ন গিয়েছিল লোহাণ্ডিগুডায় রাজাকে ছিনিয়ে আনতে !

—সে কী ! তার কোন খবর পাননি ?

—না !

—যারা মারা গেছে...

—হ্যাঁ, কম্পাউন্ডারবাবু সেই খোঁজই আনতে গেছেন। যে বারোজন মারা গেছে তাদের নাম-ঠিকানার সন্ধানে।

নির্বাক বসে থাকি দুজন।

একটু পরে শর্মিলা দেবী বলেন, মাল্‌কোর দিকে আর তাকানো যায় না। সেও এসেছে। কম্পাউন্ডারবাবুর সঙ্গে গেছে হাসপাতালে।

বললুম, আপনারা ভুল করেছেন। যদি চয়ন মারা গিয়ে থাকে, মানে ... তাহলে ... মাল্‌কোকে নিয়ে মুশ্কিলে পড়বেন আপনারা !

—কিন্তু, কী মনে হয় আপনার ! চয়ন...চয়ন...?

হেসে বলি, পাগলরাই দীর্ঘদিন বাঁচে শর্মিলা দেবী, সুস্থ সবল মানুষ বড় তাড়াতাড়ি পট করে মরে যায় !

বলেই বুঝতে পারি, অন্যায় করেছি। ঔর দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে বসেছি অজান্তে। একদিন উনি বলেছিলেন—চয়নের মৃত্যুকামনা করেন তিনি। সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতেই এ বক্রোক্তি করেছিলুম—কিন্তু এ পরিবেশে সেটা ঠিক হয়নি।

অসমাপ্ত বিবাহ-বাসর থেকে চয়ন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর ঔরা কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন আন্দাজ করা যায়। এই মধ্যরাত্রে দুজনে ছুটে এসেছেন নারানপুর থেকে সেই ছেলেটির সন্ধানে। ঠিক এ সময় ও আঘাত করা আমার পক্ষে সৌজন্যের পরিচায়ক নয়। মাথাটা নিচু হয়ে যায় শর্মিলা দেবীর — বুকের ওপর নেমে পড়ে মুখটা। কার উপর রাগ করে এ আমি কাকে আঘাত করে বসেছি !

অপ্রস্তুতের একশেষ। আমি অনুতপ্ত কণ্ঠে বলি, মাপ করবেন শর্মিলা দেবী, আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইনি।

ধীরে ধীরে উনি মুখটা তোলেন। দু'চোখে নেমেছে জলের দুটি ধারা। ধরা গলায় মিসেস পিল্লাই বলেন, বিশ্বাস করুন এঞ্জিনিয়ার-সাহেব, সেদিন আমি যা বলেছিলুম সেটাই আমার অন্তরের শেষ কথা নয় ! আজ আমি সর্বান্তঃকরণে চাইছি চয়ন সুস্থ সবল হয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক ! ...না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয় ! আজকের দুর্ঘটনায় চয়ন যদি আবার পাগল হয়ে গিয়ে থাকে, আর তার চিকিৎসার জন্য আবার যদি উনি ফ্লেপে ওঠেন, তবু আমি চাই সে বেঁচে থাকুক ! সেই প্রার্থনাই নিরন্তর করেছি, এ দুঃসংবাদ পাওয়ার পর থেকে !

ঠিক কথা। আমারই ভুল হয়েছিল সেদিন। মানুষ শুধু স্বার্থপর নয়। মানুষের সম্বন্ধে এইটেই শেষ কথা হতে পারে না। না হলে কোন বিশ্বাসের পাথেয় নিয়ে আজকের দুনিয়ায় মানুষ চড়াই ভাঙছে ? পরের দুঃখে চোখের জল ফেলবার শুভলগ্ন যদি নাই এল জীবনে তাহলে এই দুনিয়াদারী প্রহসনের অর্থ কী ? কে জানে হয়তো শুয়োরাছানার আর্তনাদে চয়নের মা-ও স্থির থাকতে পারত না।

শর্মিলা দেবীর চোখের জল আর বাধা মানছে না। হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন উনি। উঠে যাব কিনা ভাবছি, সেই মুহূর্তেই নিবে গেল ইলেকট্রিক বাতি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। রাত বারোটায় সার্কিট হাউসে বাতি নিবে যায়। কর্তৃপক্ষের মিতব্যয়িতার এ বন্দোবস্তই আমাকে অব্যাহতি দিল বোরুদ্যমানা একটি মহিলার মুখোমুখি বসে থাকার বিড়ম্বনা থেকে।

টর্চের আলো পড়ল প্রবেশদ্বারে। ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন, তাঁর পিছন পিছন কম্পাউন্ডারবাবু। প্রবেশদ্বারের সামনে তারাভরা আকাশের পশ্চাৎপটে আর একটি হতভাগিনী তরুণীর সিলুয়েট ! মাল্‌কো !

প্রশ্ন করি, কী হল ? হাসপাতালে কোন খবর পাওয়া গেল ?

কম্পাউন্ডারবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ স্যার। বারোজনই মারা গেছে। আর আহত হয়েছে অনেক। আহতদের মধ্যে খুঁজে দেখেছি, চয়ন নেই।

আর প্রশ্ন করতে সাহস হয় না।

শর্মিলা দেবীই পরের প্রশ্নটা করেন, আর যারা মারা গেছে ?

—তারা হাসপাতালে নেই। মৃতদেহগুলি রাখা আছে থানায়। বারোজনের মধ্যে

আটজনকে সনাক্ত করা গেছে — তার মধ্যে নেই। বাকি চারজন এখনও বেওয়ারিশ!

আবার প্রশ্ন করি, তাদের দেখেননি?

—না স্যার। আমাকে সেখানে ঢুকতে দিল না। সমস্ত এলাকাটা পুলিশ কর্ডন করে আছে। তাই তো স্যারকে বলছি — আপনি চলুন, মাল্‌কো এখানে ওঁর কাছে থাক বরং। — অন্ধকারের মধ্যে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারি মিসেস্‌ পিল্লাইয়ের দিকে নির্দেশ করছে সে।

শর্মিলা দেবী ডাক্তার-সাহেবকে বলেন, সেই ঠিক হবে। মাল্‌কো আমার কাছে থাক। তুমি বরং ভ্যানটা নিয়ে মর্গে যাও!

ডাক্তারবাবু এসে পর্যন্ত কোনও কথা বলেননি। এখনও কিছু বললেন না। সামনের একখানা চেয়ারে বসে পড়েছেন। অন্ধকারে তাঁর মুখখানাও দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো ঝুঁকে পড়েন আমার দিকে। অন্ধকারের মধ্যে আমার হাতদুটি ধরে বলেন, আপনি যাবেন? অবশ্য রাত এখন অনেক, আপনিও পরিশ্রান্ত —

আমি বললাম, সেজন্য কিছু নয়, কিন্তু আমাকে আপনার সঙ্গে নিতে চাইছেন কেন?

—না, ঠিক সঙ্গে নয়। আমি তাহলে এখানেই অপেক্ষা করতুম। — একটু ইতস্তত করে ফের বলেন, কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ আমি কেমন যেন স্ট্যান্ড করতে পারি না।

বক্তা ডক্টর রমানাথ পিল্লাই! পাঁচবছর কাটা-ছেঁড়া-মড়া ঘেঁটে রেকর্ডমার্ক নিয়ে ডাক্তারী পাশ করেছেন। বুঝতে পারি ওঁর অবচেতন মন বলছে, চ্যন ঐ বেওয়ারিশ চারজনের একজন! চ্যনকে উনি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছেন। তাই এ দ্বিধা! ডাক্তার নিজের নিকট-আত্মীয়ের চিকিৎসা করে না — প্রিয়জনের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করে না।

কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার পক্ষে এখন কিছুতেই সম্ভবপর নয়, মড়া-কাটা ঘরে যাওয়া। বলতে হল সে কথা, ডাক্তার পিল্লাই, আমি নিতান্ত দুঃখিত। আমি যেতে পারছি না। একটা ভারি জরুরী কাজ বাকি আছে আমার। সেটা আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে।

আমার হাতটা ছেড়ে দিলেন ডাক্তার-সাহেব।

—ও। আয়াম সরি! — সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান এবার। মুহূর্তে মন স্থির করে ফেলেন। আদেশের ভঙ্গিতে কম্পাউন্ডারকে বলেন, ইয়েস, আয়াম রেডি। চল আমরা দুজনেই যাই তাহলে — ওঁর কি একটি জরুরী কাজ আছে বলছেন!

বাধা দেন শর্মিলা দেবী, দাঁড়াও! আমার তো কোন জরুরী কাজ নেই। আমি যাব তোমার সঙ্গে। মাল্‌কো বরং অপেক্ষা করুক চৌকিদারের বউয়ের কাছে।

—তুমি? কিন্তু সে কাটা-ছেঁড়ার মধ্যে —

—হোক! আমি তোমাকে একলা যেতে দেব না, চল —

ওঁরা তিনজনে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে মেডিক্যাল ভ্যানটি আর্তনাদ করে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে একাই পড়ে রইলাম আমি।

ওঁরা বেরিয়ে যেতেই আমাকে উঠতে হল। সত্যি অত্যন্ত জরুরী একটা কাজ

বাকি ছিল আমার। সে কাজটা আমাকে যেমন করেই হক শেষ করতে হবে আজ রাতে — এই একত্রিশে মার্চ রাতেই।

সুটকেস হাতড়ে বার করলাম একটা মোমবাতি। ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা। আমি বার করলাম আমার পাণ্ডুলিপি। আজ রাতেই ‘দগু ক-শবরী’র শেষপৃষ্ঠা শেষ করতে হবে! ডাক্তারবাবুরা ফিরে এলে আমার ইচ্ছামতো এ কাহিনী আর শেষ করতে পারব না।

হাড়ে হাড়ে চিনি সেই উদাসীন নাট্যকারটিকে! লোকটার কোন ‘সেন্স অফ প্রপোশান’ নেই। যার নিশ্চিত মরার কথা তাকে বে-মক্কা বাঁচিয়ে তোলে; যার মৃত্যুর সম্ভাবনামাত্র নেই তাকে ফেলে বেঘোরে মেরে! লক্ষকোটি নায়ক নায়িকা নিয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে ঐ নেপথ্য নাট্যকার লিখে চলেছে এ বিশ্বনাটক! ও না কেয়ার করে বক্স-অফিসকে, না কোন নাট্য-সমালোচককে! ঐ খেয়ালী পাগলটা একবারও ভেবে দেখবে না, নাটকের এই অঙ্কে রোগমুক্ত সুস্থ সবল পুনর্জন্ম পাওয়া চয়নের এভাবে মরার কথা নয়। মরতে হলে অনেক আগেই সে মরতে পারত! লোহাঙিগুডার ধুলোয় তাকে বে-মক্কা মেরে ফেলাটা হবে অতি চীপ স্টান্ট! চূড়ান্ত মেলোড্রামা! কিন্তু ও পাগল নাট্যকারকে কিছু বিশ্বাস নেই — ও সব পারে!

আমি থেকে গেলাম সেই নেপথ্য-নাট্যকারের উপর টেকা দিতে! ডাক্তারবাবু ফিরে আসার আগে আমার কাহিনী শেষ করতে হবে। এ চয়ন মহাকালের হাতের পুতুল নয় — একে সৃষ্টি করেছি লেখক আমি, একে পুনর্জীবন দিয়েছেন ডাক্তার পিল্লাই! আমার নায়ককে আমি মরতে দেব না, কিছুতেই না —

আমি লিখব, প্রায়াক্ষকার লাসঘরে ডাক্তার পিল্লাই টর্চের আলোয় একটি একটি করে বারোটি মৃতদেহকে পরীক্ষা করে চলেন। দুর্জয় সাহসে তাঁর হাত ধরে পাশে পাশে চলেছেন সেই দুঃসাহসী বাঙালী মহিলাটি। ভয়ে, আতঙ্কে উত্তেজনায় নীল হয়ে গেলেও স্বামীর হাতটা ধরে আছেন বজ্রমুষ্টিতে। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করেছেন এখনই একটি চেনামুখ দেখে শিশুর মতো আর্তনাদ করে উঠবেন তাঁর পাগল স্বামী! ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার হয়ে চলেছেন সার দেওয়া মৃতদেহ! তারপর? তারপর শেষ মৃতদেহটি পরীক্ষা করে ডাক্তার পিল্লাই ছোটছেলের মতো বলে উঠলেন, থ্যাংক গড! হি ইস নট দেয়ার!

—না, এখানেই শেষ করব না। এর পরেও একটা ছোট অনুচ্ছেদ লিখব। চয়ন আর মাল্‌কোর মধুমিলনের দৃশ্য। কেমন করে? ও লিখতে বসলে মনগড়া একটি সিচুয়েশান ঠিক দাঁড় করাতে পারব। এখন কাজ হচ্ছে শুধু তাড়াতাড়ি করা। বাস্তবের চয়ন মরুক বাঁচুক, আমার দগু ক-শবরীর চয়নকে আমি বাঁচিয়ে তুলব, ডাক্তারবাবুরা ফিরে আসার আগেই।

তাড়াতাড়ি কলমটা খুলে লিখতে বসি —

এক ফোঁটা কালি নেই কলমে...

উপায় নেই ! অন্ধকারের মধ্যে ডুত্তের মতো বসেই থাকি ডাক্তারবাবুর ফিরে আসার অপেক্ষায়। আমি নিঃশব্দ ! চোখামতো চয়নকে আর বাঁচাতে পারব না। যা ঘটেছে তাই আমাকে শিখতে হবে এরপর। আমাকে মেনে নিতে হবে সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন নাট্যকারের চরম নির্দেশ।

